লুব্ধক

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর

সুবর্ণ জয়ন্তী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৩ বৈশাখ ১৪২৪
২৬ এপ্রিল ২০১৭

বাণী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি ঐতিহ্যবাহী এক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিজ্ঞান কূপমণ্ডুকতার বিপরীতে সত্য অনুসন্ধান করে, অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যায় এবং বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী সমাজ গঠনের পথ দেখায়। জাদুঘর মহাকালের জ্ঞানভাণ্ডারকে আপন বক্ষে ধারণ করে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তা তুলে ধরে। জাদুঘর থেকে শিক্ষা নিয়ে তরুণ প্রজন্ম অতীত সম্পর্কে জেনে নিজেদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে তা প্রয়োগ করতে পারে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনী, ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান বিষয়ক সভা, সেমিনার, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালনসহ নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতির মাঝে বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুত গতিতে ধাবমান। দেশের এ অভিযাত্রাকে আরও বেগবান এবং টেকসই করার জন্য বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার অত্যাবশ্যক। বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, দুর্নীতি ও অসচেতনতা দূর করে স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত সুফল মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার প্রয়াস ত্বরান্বিত করা যায়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের অবদান রাখবে, দেশবাসী তা প্রত্যাশা করে।

আমাদের তরুণ প্রজন্ম বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানাবো তারা যেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর পরিদর্শন করে নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে এবং বিজ্ঞানমনস্ক জাতি হিসেবে গড়ে ওঠে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানমনস্ক দেশ হিসেবে গড়ে উঠুক, পরিণত হোক জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায়, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ প্রত্যাশা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ ১৪২৪
২৬ এপ্রিল ২০১৭

বাণী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে তিনি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ শক্তিশালী করে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু করেন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি প্রদান করেন।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে মাথা উঁচু করে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সে লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমরা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কক্সবাজারে জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, চট্টগ্রাম পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র ও একটি Sterile Insect Unit স্থাপনের পাশাপাশি জয়পুরহাটে ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারোলজি এন্ড মেটালার্জি শক্তিশালী করা হয়েছে। বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ার লক্ষ্যে ২০১০ সালে 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর' আইন পাশ করি। এরফলে 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর' বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ তৈরি ও ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনী, ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান বিষয়ক ফোর-ডি মুভি প্রদর্শনী, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ফিচার প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করছে। এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চা ও উদ্ভাবন চর্চার বিকাশ ঘটবে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করি, সীমিত সম্পদ ও বিপুল জনগোষ্ঠির এই দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে নতুন প্রজন্ম বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করবেন।

আমি 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর'-এর সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

স্থপতি ইয়াফেস ওসমান
মন্ত্রী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের জনগণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সৃষ্টি। স্বাধীনতা পূর্বকালে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সদ্য স্বাধীন দেশে বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের দায়িত্ব নেয়ার পরই প্রতিষ্ঠানটি আলোর মুখ দেখা শুরু করে।

স্বাধীন দেশের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের জনগণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠানটি তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে যথাযথভাবে সমর্থ হতে না পারায় এর সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভূত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহান জাতীয় সংসদে "জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০" পাশের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করে এবং নতুন আঙ্গিকে ও নতুন উদ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে নিয়োজিত হয়। বর্তমানে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর জাতির মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টি, বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিতকরণ, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ আয়োজন ও নানাবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প-২০২১ তথা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের মূল বিষয় হল বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ার মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা বা বিজ্ঞানমনস্ক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। তাই বলতে পারি-

'পিতা দিয়ে গেল স্বাধীনতা, কন্যা দেখাল পথ
জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার মাঝে দেশের ভবিষ্যৎ'

প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তিতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর সুবর্ণ জয়ন্ত্রী উৎসব পালন করছে। এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম জনগণের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া। এ লক্ষ্যে বিগত ১৬ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে চট্টগ্রাম থেকে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন উৎসবের কার্যক্রম সূচনা হয়। দেশের ৬৪টি জেলায় এ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায় সম্পন্ন করে আগামী ২৬ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে ঢাকায় এর মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার কার্যক্রমকে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে আরো গতিশীল করবে বলে আশা রাখি। প্রতিষ্ঠানটির এ আয়োজনকে সামনে রেখে বলতে পারি-

'প্রযুক্তি প্রগতির পথ বলে গণ্য
ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে সব মানুষের জন্য'

জাদুঘরের ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(স্থপতি ইয়াফেস ওসমান)

অধ্যাপক ডাঃ আ.ফ.ম. রুহুল হক, এম.পি
সভাপতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
সদস্য, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
সদস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

বাণী

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ২১ শতকের টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জগুলোর অন্যতম হলোঃ জ্বালানি নিরাপত্তা, পরিবেশ রক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, নতুন নতুন রোগ মোকাবেলা, সমুদ্র সম্পদ আহরণ, মহাকাশে বসতি স্থাপন ইত্যাদি। আর এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তিতে দক্ষ জাতি গঠনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কাজ করতে পারে।

আধুনিক তথা ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তিতে দক্ষ জাতি গঠনের যে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন তারই অংশীদার হিসেবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রচুর কাজ করতে পারে। বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার, শিক্ষা, কৃষি, শিল্পসহ আমাদের দৈনন্দিন কাজে বিজ্ঞানের ব্যবহার ও উপকারিতা, বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহারে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সময় ও ব্যয় হ্রাস করে, এসব বিষয় মানুষের মাঝে তুলে ধরে জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক করা যায়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর মানুষের মাঝে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে উপস্থাপন করে তরুণ শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী করে তুলতে পারে। আমরা জানি এসব কাজে সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে।

সম্পদ ও প্রচারের সীমাবদ্ধতাকে সঙ্গী করে বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত শক্তির গণমুখী ব্যবহার ও প্রচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন ও প্রযুক্তির সাথে নব প্রজন্মের যোগসূত্র রচনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর তার সৃষ্টি লগ্ন থেকে অব্যাহতভাবে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ মহান জাতীয় সংসদে পাশ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলী সুসংহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ২৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে। এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি তার কর্মকাণ্ডকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারবে বলে আমি মনে করি।

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবন চর্চার মাধ্যমে তাদের জ্ঞানকে বিকশিত করে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপক ডা. আ.ফ.ম. রুহুল হক, এমপি

ভূত পূর্ব সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সচিব
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ২৬ এপ্রিল ১৯৬৫ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ০৭ নভেম্বর, ১৯৬৬ সালে কার্যক্রম শুরু করে। স্বাধীনতার পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করলেও ২০০৯ সালের আগ পর্যন্ত সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে উল্লেখযোগ্য কোন অবদান রাখতে সক্ষম হয় নাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন ২০১০' পাশের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অগ্রযাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি আকর্ষণীয় প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দেশের শিশু কিশোরদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর তার ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণজয়ন্তীর অংশ হিসেবে দেশব্যাপি বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান বিষয়ক ৪ডি মুভি প্রদর্শনের আয়োজন করেছে। বিগত ১৬ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে উদ্বোধনীর মাধ্যমে শুরু হওয়া এই আয়োজন আগামী ২৬ এপ্রিল, ২০১৭ ঢাকায় সমাপ্ত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী পরিকল্পনা অনুসরণ করে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি হিসেবে আমাদের গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠানটি যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করবে - এই প্রত্যাশা করছি।

আমি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। যারা সাফল্যের জন্য মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

৮.৫.২০১৭
মোঃ সিরাজুল হক খান

স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বাণী

স্বাধীনতা পূর্বকালে ১৯৬৫ সালে ২৬ এপ্রিল তারিখের এক সরকারি আদেশ বলে ১৯৬৬ সালের ৭ নভেম্বর থেকে ঢাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর পথ চলা শুরু করে। তারপর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পূর্বপর্যন্ত জাদুঘরটির জনবল সৃজন, নিয়োগ এবং জাদুঘর নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যন্ত কার্যক্রমের মধ্যে তার কার্য সীমাবদ্ধ থাকে। ঐ সময়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ এবং ছোট খাটো প্রদর্শনী বস্তু ক্রয় ছাড়া এ জাদুঘরের আর কোন উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর তথ্য পাওয়া যায়নি।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের সময়ে এ প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় এ প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য মোট ৩.৭১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় এবং প্রথম বারের মত ৫০ লক্ষ টাকা উন্নয়ন বরাদ্দ দেয়া হয়। তার পর থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভাড়া বাসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করে ১৯৮৭ সালে আগারগাঁওয়ে নিজস্ব ভবনে উহা কার্যক্রম শুরু করে।

"একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ" স্লোগান বুকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। তবে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়ভাবে ব্যাপক পরিচিতি পায়নি।

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সনে সরকার পরিচালনা দায়িত্ব গ্রহণের পর এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে আশার আলো দেখা দেয়। তাঁর নির্দেশে ২০১০ সনে মহান জাতীয় সংসদে "জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন" পাশ হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নতুন কলেবরে যাত্রা শুরু করে। তাঁর নির্দেশেই প্রতিষ্ঠানটি একটি বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর হতে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সার্বক্ষণিক দিকনির্দেশনা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের যাত্রাপথকে সুগম করেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ পরামর্শে সারাদেশে মিউজুবাসের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, মুভি বাসের মাধ্যমে সারাদেশে ভ্রাম্যমাণ ৪-ডি মুভি প্রদর্শনের কার্যক্রমসহ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে অনেক বিশ্বমানের প্রদর্শনীবস্তু সংযোজিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তিতে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে গিয়ে সংকলন প্রকাশ, নবীন বিজ্ঞানী ত্রৈমাসিক সাময়িকীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশসহ দেশব্যাপী জেলা পর্যায়ে সেমিনার, বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়েছে। এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হল জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কার্যক্রমকে দেশের মানুষের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে আশা করা যায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচয় সংকট ঘুচবে।

সুবর্ণ জয়ন্তী পালনে আয়োজিত উৎসব বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের বাইরের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব আন্তরিকভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করায় এবং প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অক্লান্ত প্রচেষ্টা করায় এ আয়োজন সার্থকতার আলো দেখেছে। এ উৎসব পালনে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কৃতজ্ঞ থাকবে।

সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের মধ্য দিয়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কার্যক্রম আরো জনবান্ধব হবে এ প্রত্যাশা রইল।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্বপন কুমার রায়

অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস ছাত্তার
বিভাগীয় প্রধান, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আহবায়ক, স্মরণিকা প্রকাশ উপ কমিটি ও সদস্য
গভর্নিং বডি, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বাণী

১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে লক্ষ্য স্থির করার এক অনন্য সুযোগ। ৫০ বছরের বাধা বিপত্তির যাত্রাপথ অতিক্রম করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আজ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের যথাযথ মর্যাদা লাভ করেছে। সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বিজ্ঞানের বার্তা পৌঁছে দেয়ার একটি সুযোগ পাচ্ছে। এমন একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হতে পারে। এই দলিলটির সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। পক্ষান্তরে এই দায়িত্বটি পালন করতে গিয়ে সব সময়ই মনে হয়েছে- সঠিকভাবে হচ্ছে তো! তাই আমার অসাবধানতাবশতঃ এই স্মরণিকায় কোন ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকলে তার জন্য আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে এটুকু বলতে পারি যে, স্মরণিকাটিকে সর্বাঙ্গীনভাবে সুন্দর করার জন্য আমার ও সম্পাদকীয় বোর্ডের আন্তরিকতায় বিন্দুমাত্র ঘাটতি ছিল না।

এ স্মরণিকায় বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের লেখা প্রবন্ধ প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও সবার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এই প্রবন্ধগুলোর মধ্যে দিয়ে লেখকগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলো আমাদের সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কতখানি শ্রম, চিন্তা এবং জ্ঞান দ্বারা এই মানের প্রবন্ধ লেখা সম্ভব তা স্মরণিকাটি পাঠের মাধ্যমেই সবাই বুঝতে পারবেন আশা করছি। এই অবদানের জন্যে সম্পাদকীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বর্তমান সরকার বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা ল্যাব গঠন, বিভিন্ন গবেষণা প্রজেক্টে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান, ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা কাজে ফেলোশিপ প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সরকারের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যারা এই সব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তারা এর যথাযথ ব্যবহারে অঙ্গীকারাবদ্ধ, বিষয়টি এই সম্পাদকীয় লেখার মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করতে চাই।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকার জন্যে বাণী প্রদান করে স্মরণিকাটিকে অলংকৃত করেছেন, এবং স্মরণিকার সম্পাদকীয় বোর্ডকে করেছেন বাধিত।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সংসদীয় কমিটির মাননীয় সভাপতি ও সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁদের বাণী প্রদানের জন্যে।

আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে, সুবর্ণ জয়ন্তী পালন কমিটিকে ও স্মরণিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যবৃন্দকে, স্মরণিকার বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সভায় পরামর্শ প্রদানের জন্যে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালকের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই স্মরণিকা প্রকাশে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতার জন্য।

সবশেষে এই সুবর্ণ জয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস ছাত্তার

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি

জনাব স্বপন কুমার রায়

মহাপরিচালক

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

সম্পাদকমন্ডলী

আহ্বায়ক : অধ্যাপক ড. মো: আব্দুস ছাত্তার
বিভাগীয় প্রধান, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও
সদস্য, গভর্নিং বডি, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর।

সদস্যবৃন্দ : অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক মইন সৈয়দ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ড. নওরীন আহসান, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব সুকল্যাণ বাছাড়, কিউরেটর (একাডেমিক), জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
ড. শিখা নূর মুন্সী, কীপার, প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
জনাব রুছেলী খান, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বৈজ্ঞানিক তথ্য বিভাগ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
জনাব মো: শাহ আলম, ষ্টোর অফিসার, বিসিএসআইআর
জনাব মো: সহিদুল ইসলাম, সহকারী কিউরেটর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার
জনাব মো: মনিরুজ্জামান, এস.আর. ও, ব্যান্সডক
জনাব মো: আব্দুল আজিজ, সহকারী কিউরেটর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
জনাব মুমিনুর রশীদ, সহকারী কিউরেটর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
জনাব সৌমিত্র কুমার বিশ্বাস, সিনিয়র আর্টিস্ট কাম অডিও ভিস্যুয়াল অফিসার, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
জনাব এম.এম. রুবায়েত হোসেন, গ্যালারী সহকারী, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

প্রচ্ছদ

জনাব সৌমিত্র কুমার বিশ্বাস
সিনিয়র আর্টিস্ট কাম অডিও ভিস্যুয়াল অফিসার, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০১৭

প্রকাশনায়

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

যোগাযোগের ঠিকানা

মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭। ফোন: ০২-৯১১২০৮৪
E-mail : infonmst@gmail.com

স্মরণিকা প্রকাশ উপ-কমিটি

আহ্বায়ক :

অধ্যাপক ড. মো: আব্দুস ছাত্তার
বিভাগীয় প্রধান,পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য গভর্নিং বডি
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

সদস্যবৃন্দ :

অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক মইন সৈয়দ
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. নওরীন আহসান
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুকল্যাণ বাছাড়
কিউরেটর (একাডেমিক)
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

রুছেলী খান
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বৈজ্ঞানিক তথ্য বিভাগ
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

ড. শিখা নূর মুনসী
কীপার
প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগ
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

মো: সহিদুল ইসলাম
সহকারী কিউরেটর
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

মো: মনিরুজ্জামান
এস.আর.ও
ব্যান্সডক

মো: আব্দুল আজিজ
সহকারী কিউরেটর
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

মো: শাহ আলম
ষ্টোর অফিসার
বিসিএসআইআর

সৌমিত্র কুমার বিশ্বাস
সিনিয়র আর্টিস্ট কাম অডিও ভিস্যুয়াল অফিসার,
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

মুমিনুর রশীদ
সহকারী কিউরেটর
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

এম.এম. রুবায়েত হোসেন
গ্যালারী সহকারী
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

সূচিপত্র

লেখা	লেখক	পৃষ্ঠা
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরঃ একটি সমীক্ষা	স্বপন কুমার রায়	১
নক্ষত্রের জীবন	ড. সালেহ্ হাসান নকীব	৯
মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে রসায়নের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা	ড. মোঃ মুহিবুর রহমান	১৬
নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর নিয়ে কিছু কথা	প্রকৌশলী মো: আলী জুলকারনাইন	২৬
পাট নিয়ে কিছু কথা	ড. হাসিনা খান	৩৩
কণার নামটি বোজন	ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল অধ্যাপক	৩৬
সাম্প্রতিক চিকিৎসা ব্যবস্থা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ	ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ	৪০
মানুষের জন্য বিজ্ঞান	ডঃ খোন্দকার সিদ্দিক-ই রব্বানী	৪৪
গণিতের শাখায় শাখায় আত্মীয়তা	ড. সুব্রত মজুমদার	৫৪
আমাদের চ্যালেঞ্জ প্রিয় তরুণসম্প্রদায়	ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ	৫৮
আমাদের কৃষি: প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া	৬১
গাছ নিয়ে জানা অজানা নানা কথা	ডঃ মিহির লাল সাহা	৬৬
সংখ্যার জগতে উকিঝুঁকি	ড. মুনিবুর রহমান চৌধুরী	৭৬
বাংলাদেশী বিজ্ঞানী এবং তাঁদের আবিষ্কার	অধ্যাপক ডঃ ইসতিয়াক মইন সৈয়দ	৭৯
প্রতিদিনের প্রসাধনী (Daily Cosmetics)	অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হাশেম	৯০
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কার্যপরিধি	প্রকৌশলী সুকল্যাণ বাছাড়	৯৮

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরঃ একটি সমীক্ষা

স্বপন কুমার রায়
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

জনসাধারণের মাঝে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার এবং বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯৬৫ সনের ২৬ এপ্রিল তারিখের এক সরকারি আদেশ বলে ঢাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ আদেশেই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার নির্দেশনা ছিল এবং এ জন্য একটি বোর্ড অব গভর্ণরস্ গঠন করার সিদ্ধান্ত ছিল। যদিও এ আদেশ জারির এক বছরের বেশি সময় পরে ১৯৬৬ সনের ৩১ মে তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সময়কার উপাচার্যকে চেয়ারম্যান করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্ণরস্ গঠন করা হয়। বোর্ড অব গভর্ণরস্ের প্রথম চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডক্টর এম.ও.গনি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অফিস কক্ষে ৭ নভেম্বর ১৯৬৬ তারিখে প্রথম বোর্ড অব গভর্ণরস্ের সভা করেন। ঐ সভায় ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর জনাব মোঃ এনামুল হককে খন্ডকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হয়।

অফিসের অবস্থান: প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কক্ষে এবং ঢাকা মিউজিয়ামে শুরু হলেও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের বদান্যতায় তার নিয়ন্ত্রণাধীন পাবলিক লাইব্রেরি ভবনের তৃতীয় তলায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১০ এপ্রিল ১৯৭০ তারিখে ২৫, শ্যামলীবাগ ঢাকাতে একটি ভাড়া বাসায় এর কার্যক্রম স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর ১৬ মে ১৯৭১ তারিখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর সড়ক নম্বর ১, বাড়ী নম্বর ১১৯, ধানমন্ডিতে আরেকটি ভাড়া বাসায় এর কার্যক্রম স্থানান্তর করে। প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের জন্য ০৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ তারিখে ৪৮/১, আগাসাদেক রোড, ঢাকাতে একটি বাড়ী ভাড়া নেয়া হয়। ১ জুলাই ১৯৭৭ তারিখে বিজ্ঞান জাদুঘর সড়ক নং ৬, বাড়ী নং ১০ বি, ধানমিন্ডতে আরেকটি ভাড়া বাসায় স্থানান্তর করা হয়। ০১.০২.১৯৮২ তারিখে বিজ্ঞান জাদুঘরের কার্যক্রম ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা হতে কাকরাইলস্থ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। ৩০.০৫.১৯৭০ তারিখে প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ভবনের জমি অধিগ্রহণের জন্য গণপূর্ত বিভাগকে ৩ লক্ষ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়। কিন্তু ঐ টাকার বিপরীতে গণপূর্ত বিভাগ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় জমি বরাদ্দ প্রদান করলেও কোন জমি হস্তান্তর করেনি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ২২.১১.১৯৭৩ তারিখে বোর্ড অব গভর্ণরস্ের ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয় যা প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনুষ্ঠিত ৯ম সভা। ঐ সভাতেই সদ্য স্বাধীন দেশের ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে জাদুঘরের উন্নয়নের জন্য ৩৭১.২৫ লাখ টাকা সংশোধিত স্কিম প্রণয়ন করা হয়। এবং ১ম পর্যায়ে ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ সরকার থেকে পাওয়া যায়। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ১৯৭৭ থেকে ১৯৯০ মেয়াদে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। ঐ প্রকল্পে গণপূর্ত বিভাগ পুনরায় ৮ একর জমি বরাদ্দ করে এবং ৫ মে ১৯৮৪ তারিখে আগারগাঁওয়ের বর্তমান স্থানে ৫ একর জায়গার উপর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ তারিখে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আগারগাঁওস্থ বর্তমান স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃজন: ৭ নভেম্বর ১৯৬৬ তারিখে প্রথম বোর্ড অব গভর্ণরস্ের সভা হয়। ঐ সভায় ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর জনাব মোঃ এনামুল হককে খন্ডকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব গভর্ণরস্ের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ২২ মার্চ ১৯৬৭ খ্রিঃ তারিখে। ঐ সভায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য রুলস অব বিজনেস প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত রুলস অব বিজনেসে এ জাদুঘর পরিচালনার জন্য পরিচালক পদ সৃজন করা হয় এবং তার অধীনে ৫টি শাখা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শাখাগুলো হল

প্রশাসন, প্রযুক্তি, ভৌত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এবং ওয়ার্কশপ শাখা। ওয়ার্কশপ শাখা পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক, অন্য শাখা সমূহের জন্য কিপার, এবং হিসাব এবং প্রশাসন শাখার সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য পরিচালক পদ সৃজনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর , ১৯৬৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের রিডার ডক্টর এম.এ. মুহতাশেম হোসেনকে প্রথম পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। কিন্তু নিয়োজিত ব্যক্তি ঐ পদে যোগদান না করায় বোর্ড অব গভর্ণরস্ ১৯৬৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের সভায় ড. আবুল খায়ের ভূঁইএগ্রা সিনিয়র রিসার্স অফিসার, পিসিএসআইআরকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে এবং তিনি প্রথম পরিচালক হিসেবে ০৭.০৬.১৯৬৯ তারিখে ঢাকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কার্যক্রম শুরু করেন। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ তারিখে বোর্ড অব গভর্ণরসের ৫ম সভায় স্টেনোগ্রাফার, উচ্চমান সহকারী, পিওন, এবং সুইপার (খন্ডকালীন) এর ১টি করে পদ সৃষ্টি করে জনবল নিয়োগ অনুমোদিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৪ এপ্রিল ১৯৭০ তারিখে বোর্ড অব গভর্ণরস্ের ৬ষ্ঠ সভায় এ্যাক্সিবিট প্রিপারেটর, অডিওভিস্যুয়াল অফিসার, এ্যাকাউন্টস অফিসার, চেয়ারম্যানের পিএ, আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ান, সিনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাডমিন, বাংলা টাইপিস্ট, ক্যাশিয়ার, পিওন, চৌকিদার, দারোয়ান, নাইটগার্ড, মালি ও সুইপারের ১টি করে মোট ১৫টি পদে জনবল নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। প্রথম নিয়োজিত পরিচালক ০৭.০৬.১৯৬৯ তারিখে কাজে যোগদান করলেও বোর্ড অব গভর্ণরস্ ০৬.০৫.১৯৭০ তারিখে তাঁর চাকুরি স্থায়ী করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অন্যান্য পদসমূহ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৪ সনে ব্রিগেডিয়ার এনাম কমিশনের প্রতিবেদনে এ সংস্থার জন্য মোট ৪৮ টি পদ সৃজিত হয়। পরবর্তীতে ২০০০ সালে ৩টি, ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২১টি এবং এপ্রিল মাসে ৭টি পদসহ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে বর্তমান পর্যন্ত মোট ৭৯টি পদ অনুমোদিত হয়েছে।

যারা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন:

১। এম ও গনি, ০৭ নভেম্বর ১৯৬৬ থেকে ০২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ (১ম সভা থেকে ৫ম সভা)

২। ডক্টর এম কুদরত-ই-খুদা , ১৪ এপ্রিল ১৯৭০ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১(৬ষ্ঠ থেকে ৮ম সভা)

৩। ডক্টর এম ইন্নাস আলী, ২২ নভেম্বর ১৯৭৩ থেকে ১২ জুলাই ১৯৭৬ (৯ম সভা থেকে ২০তম সভা)

৪। ডক্টর আনোয়ার হোসেন, ০৯ ডিসেম্বর ১৯৭৬ থেকে ৩০ মার্চ ১৯৭৮ (২১তম সভা থেকে ২৭তম সভা)

৫। ডক্টর সৈয়দ বজলে আলী, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭৯ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ (২৮তম সভা থেকে ৩৬তম সভা)

৬। ডক্টর ফারুক আজিজ খান, ০৩ জুন ১৯৮০ থেকে ৩০ এপ্রিল ১৯৮১ (৩৭তম সভা থেকে ৩৮তম সভা)

৭। জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ (৩৯তম সভা)

৮। ডক্টর আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন, ২৯ মে ১৯৮২ থেকে ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫ (৪০তম সভা থেকে ৫২তম সভা)

৯। জনাব আহমেদ ফরিদ, ২৮ জুন ১৯৮৭ থেকে ১৬ আগস্ট ১৯৯৫ (৫৩তম সভা থেকে ৫৭তম সভা)

১০। জনাব আ ন ম ইউসুফ, ১৮ জুলাই ১৯৮৯ থেকে ১৫ জানুয়ারি ১৯৯০ (৫৮তম সভা থেকে ৫৯তম সভা)

১১। জনাব আবুল হাসেম, ১৫ জুন ১৯৯১ (৬০তম সভা)

১২। আলহাজ্ব অধ্যাপক এম এ মান্নান, ০৫ জুলাই ১৯৯৪ থেকে ০৯ আগস্ট ১৯৯৫ (৬১তম সভা থেকে ৬৫তম সভা)

১৩। কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা, ৩০ নভেম্বর ১৯৯৫ (৬৬তম সভা)

১৪। জনাব এ এস এইচ কে সাদেক, ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ (৬৭তম সভা)

১৫। ডক্টর মহীউদ্দীন খান আলমগীর, ০৪ জানুয়ারি ১৯৯৮ (৬৮তম সভা)

১৬। লেঃ জেনারেল মোহাম্মদ নুর উদ্দীন খান, পিএসসি (অবঃ), ০৫ মে ১৯৯৯ থেকে ০৭ মে ২০০১ (৬৯তম থেকে ৭২তম সভা)

২৭ এপ্রিল ২০০০ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রজ্ঞাপনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে একটি সংযুক্ত পরিদপ্তরে রূপান্তর করা হয়। যার ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য কোন পরিচালনা বোর্ড ছিল না।

জাতীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি জাদুঘর আইন ২০১০, অনুযায়ী গঠিত পরিচালনা বোর্ডের সভাপতিগন:

১। জনাব মোঃ আবদুর রব হাওলাদার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে ০৩ এপ্রিল ২০১২ (১ম ও ২য় সভা)

২। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, ০৩ এপ্রিল ২০১২ থেকে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৩ (৩য় থেকে ৬ষ্ঠ সভা)

৩। জনাব এ কে এম আমির হোসেন, ০৮ অক্টোবর ২০১৫ (৭ম সভা)

৪। জনাব খোন্দকার মোঃ আসাদুজ্জামান, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ১০ জুন ২০১৫ (৮ম থেকে ১০ম সভা)

৫। জনাব মোঃ সিরাজুল হক খান, ০৮ অক্টোবর ২০১৫ থেকে বর্তমান (১১তম সভা থেকে বর্তমান)

(পরিচালনা বোর্ডের সভায় ১ম বার থেকে শেষ বার সভাপতিত্ব করার তারিখ বিবেচনা করে উল্লেখ করা হয়েছে)

যারা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন:

১। জনাব মোঃ এনামুল হক, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ০৭.১১.১৯৬৬ থেকে ০৬.০৬.১৯৬৯

২। ড. মোঃ আবুল খায়ের ভূঁইয়া, পরিচালক, ০৭.০৭.১৯৬৯ থেকে ১৮.০৮.১৯৭৫

৩। ড. এ কে রফিক উল্লা, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ১৯.০৮.১৯৭৫ থেকে ০৪.০২.১৯৭৭

৪। ড. খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক, ০৪.০২.১৯৭৭ থেকে ০৪.০৩.১৯৮

৫। জনাব সালেহ্ আহমদ, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ০৪.০৩.১৯৮০ থেকে ৩০.০৬.১৯৮০

৬। প্রফেসর ড. মোঃ মোবারক আলী আখন্দ, পরিচালক, ০১.০৭.১৯৮০ থেকে ৩০.০৯.১৯৮৭

৭। জনাব এ.এম. জালাল উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ০১.১০.১৯৮৭ থেকে ৩১.১২.১৯৮৭

৮। জনাব এ. এম. নূরউদ্দিন, পরিচালক, ০১.০১.১৯৮৮ থেকে ২৬.০৩.১৯৮৮

৯। প্রফেসর ড. খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ২৭.০৩.১৯৮৮ থেকে ২৯.১০.১৯৯০

১০। প্রফেসর ড. মোঃ মোবারক আলী আকন্দ, পরিচালক, ৩০.১০.১৯৯০ থেকে ২৭.১১.১৯৯২

১১। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ২৮.১১.১৯৯২ থেকে ১১.১২.১৯৯২

১২। প্রফেসর ড. মোঃ শামসুর রহমান, পরিচালক, ১১.১২.১৯৯২ থেকে ০৬.১১.১৯৯৪

১৩। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ০৭.১১.১৯৯৪ থেকে ২৯.১১.১৯৯৪

১৪। প্রফেসর আ.ম. আজিজুর রহমান খান, পরিচালক, ৩০.১১.১৯৯৪ থেকে ১৯.০৮.১৯৯৮

১৫। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ২০.০৮.১৯৯৮ থেকে ২২.১১.১৯৯৮

১৬। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), ২৩.১১.১৯৯৮ থেকে ২৮.০৯.২০০৪

১৭। জনাব মোঃ নুরুল হক, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), ২৯.০৯.২০০৪ থেকে ৩১.০১.২০০৮

১৮। জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), ৩১.০১.২০০৮ থেকে ২২.০১.২০০৯

১৯। জনাব সদর উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), ২৬.০১.২০০৯ থেকে ০১.০৬.২০০৯

২০। জনাব মোঃ মনসুর হোসেন, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), ০৩.০৬.২০০৯ থেকে ০২.১২.২০১০

২১। জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, পরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), ০২.১২.২০১০ থেকে ১৯.০১.২০১১

২২। জনাব জ্যোতির্ময় সমদ্দার, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), ১৯.০১.২০১১ থেকে ১০.০৪.২০১১

২৩। জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), ১১.০৪.২০১১ থেকে ০৭.০৯.২০১১

যারা মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন:

১। জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান(অতিরিক্ত সচিব), ০৮.০৯.২০১১ থেকে ০৬.০৪.২০১৪

২। জনাব এস এম আশরাফুল ইসলাম(অতিরিক্ত সচিব), ২০.০৪.২০১৪ থেকে ১১.০৫.২০১৪

৩। জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির খান(অতিরিক্ত সচিব), ১৮.০৫.২০১৪ থেকে ০৮.০১.২০১৫

৪। জনাব স্বপন কুমার রায়(অতিরিক্ত সচিব), ০৮.০১.২০১ থেকে বর্তমান

প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ:

• স্বাধীনতা পূর্বকালে প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও অল্প কিছু প্রদর্শনীর বস্তু ক্রয় ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন উন্নয়ন সংগঠিত হয় নাই। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ২২.১১.১৯৭৩ তারিখে বোর্ড অব গভর্ণরস্‌ের ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয় যা প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনুষ্ঠিত ৯ম সভা। ঐ সভাতেই সদ্য স্বাধীন দেশের ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে জাদুঘরের উন্নয়নের জন্য ৩৭১.২৫ লাখ টাকা সংশোধিত স্কিম প্রণয়ন করা হয়। এবং ১ম পর্যায়ে ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।

• বোর্ড অব গভর্ণরস্‌ের ২৭.০৫.৭৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০ম সভায় প্রতিষ্ঠানটির বাংলা নাম 'বিজ্ঞান জাদুঘর' রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

• ২৬.০৭.১৯৭৫ তারিখে বিজ্ঞান জাদুঘরের চতুর্দশ সভায় বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারনের জন্য মিউজুবাস সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মিউজুবাস সংগ্রহ করা হয় ২০১০ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর শক্তিশালীকরণ কমসূচির আওতায়।

• ১৯৭৮ সালের ১৯ মার্চ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত ১ম জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান সপ্তাহ উদ্‌যাপন শুরু হয়।

• ১১.০৭.১৯৮৫ তারিখে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর পরিচালনা পর্ষদের ৫১তম সভায় কিশোর বিজ্ঞান নামে ১টি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ প্রকাশনার জন্য ড. আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনকে সভাপতি , প্রফেসর এম মুস্তাফিজুর রহমান, জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা ও শিল্পী জনাব কাইয়ুম চৌধুরীকে সদস্য এবং পরিচালক ড. মোঃ মোবারক আলী আখন্দকে সদস্য-সচিব করে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। জনাব আবদুল হক খন্দকারকে পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক এবং প্রতিষ্ঠানের কিউরেটর জনাব সালেহ আহমেদকে নির্বাহী সম্পাদক করে পত্রিকা প্রকাশনার কার্যক্রম শুরু করা হয়। মূলতঃ ১৯৮৭ সনের জুন মাস থেকে পত্রিকাটি 'নবীন বিজ্ঞানী' নামে প্রকাশিত হয়।

• ২১.১২.১৯৮৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদের ৫২তম সভায় বিজ্ঞান জাদুঘরের জন্য ৮″ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট স্মীড ক্যাসেগ্রেইন (অটো ও ম্যানুয়াল ড্রাইভ) এস্ট্রো ফিল্ম ক্যামেরা ও সরঞ্জামাদিসহ ১টি টেলিস্কোপ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর মুহতাশেম হোসেন, ফলিদ পদার্থবিদ্যা ও ইলেকট্রোনিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এ আর খান এবং জ্যোর্তিবিদ্যা সমিতির সভাপতি জনাব এফ আর সরকার সমন্বয়ে ১টি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এই উপদেষ্টা পরিষদের তত্ত্বাবধানেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের টেলিস্কোপের মাধ্যমে আকাশ পর্যবেক্ষণের কার্যক্রম শুরু হয়।

• ১৯.০৭.১৯৮৮ তারিখে পরিচালনা পরিষদের ৫৬তম সভায় জাদুঘর প্রাঙ্গনে ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি ডায়নোসরের ভাস্কর্য স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

• ১৯৯০ সন থেকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ৫ বছর মেয়াদে বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে নিবন্ধন দেয়ার কার্যক্রম শুরু করে।

• পরবর্তীতে ২০১০ সনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ পাস হয়। এবং ঐ আইনবলে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ১টি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ আইনের আওতায় পুনরায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট ১টি পরিচালনা বোর্ড গঠিত হয়েছে। উক্ত বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বর্তমান কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

• ১৯ মার্চ থেকে ২১ মার্চ ১৯৭৮ সালে ১ম জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ পালন করা হয়।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং উহা প্রতিপালনে জাদুঘরের সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো-

১৯৬৫ সনের ২৬ এপ্রিল তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এফ.১-০৪/৬৪-এসসি নম্বর স্মারকে ঢাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পর প্রতিষ্ঠানটিকে যে সকল দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, বাস্তবে তা প্রতিপালন করা সম্ভব হয় নাই। স্বাধীনতার পূর্বকালে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মচারিদের বেতন-ভাতা প্রদান ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম গ্রহণের নজির পাওয়া যায় নাই। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কর্মকান্ড উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন খাতে ১ম বারের মতো উন্নয়ন বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় ৫ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে শক্তিশালী এবং জনবান্ধব করার জন্য ২০১০ সনে বিজ্ঞান জাদুঘরের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যথা:-

(ক) জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টি করা;

(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করিবার লক্ষ্যে-

(অ) জাদুঘরে স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনীয় ব্যবস্থা করা;

(আ) বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নানাবিধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;

(ই) বিভিন্ন জেলা শহরের পাবলিক লাইব্রেরী বা টাউন হল এবং শিক্ষামুলক প্রতিষ্ঠানসমূহে মিউজু (গঁংবড়) বাসের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রদর্শনী, টেলিস্কোপের মাধ্যমে আকাশ পর্যবেক্ষণ এবং বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এর ব্যবস্থা করা;

(ঈ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও গবেষণা এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;

(উ) বক্তৃতামালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনের ব্যবস্থা করা;

(ঊ) জাদুঘর এর উন্নয়নে প্রদর্শনী বস্তুসমূহের সাহায্যে গবেষণামূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা করা;

(গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যেকটি জেলায় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন এবং প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নবীন ও সৌখিন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্পের মান উন্নয়নের জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া উক্তরূপ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনমূলক কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

(ঘ) দেশের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান;

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক নিদর্শনাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এর প্রায়োগিক ব্যবস্থা করা;

(চ) বৎসরের বিশেষ দিনগুলিতে চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ধূমকেতু, উল্কাপাত ইত্যাদি টেলিস্কোপের মাধ্যমে উন্মুক্ত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(ছ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ আবিষ্কার ও অবদানের জন্য স্বীকৃতি এবং পুরস্কার অথবা সম্মানী প্রদান করা; এবং

(জ) উপরে-বর্ণিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্য এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব সম্পাদন করা।

মহান জাতীয় সংসদ প্রণীত আইনি কাঠামোর আওতায় এবং প্রদত্ত কার্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে:

১। প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী প্রদর্শনীর জন্য ৮টি গ্যালারী সৃজন করা হয়েছে। গ্যালারী সমূহের নাম-

ক. পদার্থবিজ্ঞান গ্যালারী।

খ. জীববিজ্ঞান গ্যালারী।

গ. মজারবিজ্ঞান গ্যালারী।

ঘ. তথ্যপ্রযুক্তি গ্যালারী।

ঙ. শিল্পপ্রযুক্তি গ্যালারী।

চ. মহাকাশবিজ্ঞান গ্যালারী।

ছ. শিশু গ্যালারী।

জ. তরুণ বিজ্ঞানী গ্যালারী।

জনবলের স্বল্পতার কারণে তরুণ বিজ্ঞানী গ্যালারীটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হচ্ছে না।

২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের আয়োজন: ১৯৭৭-১৯৭৮ অর্থ বছর থেকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালিত হচ্ছে।

৩। মিউজুবাসের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী: ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর জন্য সংগৃহীত মিউজুবাস বাসের মাধ্যমে সারাদেশে বিজ্ঞান প্রদর্শনী আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ১০৪টি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে এবং চলতি বছরে কমপক্ষে ১০৪টির বেশী ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

৪। টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ: বিজ্ঞান জাদুঘরে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি টেলিস্কোপ সংগ্রহ করা হয়েছে।

টেলিস্কোপের সাহায্যে সারাদেশে মিউজুবাসের মাধ্যমে উন্মুক্ত আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে স্থায়ীভাবে আকাশ পর্যবেক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের আয়োজন করা হয়।

৫। মুভি বাসের মাধ্যমে ৪ডি মুভি প্রদর্শন: ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ২০ আসন বিশিষ্ট ১টি মুভি বাস সংগ্রহ করা হয়েছে (Tiller Rider With Prime Over) এর মাধ্যমে দেশব্যাপী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক ৪ডি মুভি প্রদর্শনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা মালার আয়োজন: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের অডিটরিয়ামে বিশিষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তার দ্বারা বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা মালার আয়োজন করা হয়। যাতে দেশের তরুন শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করে এবং বিজ্ঞান বিষয়ক নতুন নতুন তথ্য অবগত হয়।

৭। বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজের আয়োজন: প্রতিষ্ঠানটি ইতোপূর্বে মাঝে মাঝে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানের ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের অংশ হিসাবে দেশের সকল জেলায় বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে এবং ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৮। সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির আয়োজন: প্রতিবছর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। চলতি বছরেও দেশের প্রতিটি জেলায় বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়েছে। এ কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

৯। অলিম্পিয়াড আয়োজন: ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অলিম্পিয়াড আয়োজন একটি অন্যতম জনপ্রিয় প্রক্রিয়া। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতোপূর্বে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে অলিম্পিয়াড, কংগ্রেস ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছর থেকে দেশের সকল উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়েছে।

১০। নবীন বিজ্ঞানী ও অন্যান্য প্রকাশনা: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর থেকে তরুনদের মাঝে বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টির জন্য 'নবীন বিজ্ঞানী' নামে ১টি ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও বিজ্ঞান মেলার প্রতিবেদন ও অন্যান্য আরো কিছু প্রকাশনা প্রকাশিত হয়। চলতি অর্থ বছরে নিয়মিত নবীন বিজ্ঞানী সাময়িকীর প্রকাশসহ আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা যেমন-8th International plant Tissue Culture Conference-2016 (Souvenir Abstract), Annual Botanical Conference-2017 (Abstract), ঠাকুরগাঁওয়ে শতবর্ষী আমগাছ সংরক্ষণে আয়োজিত সেমিনারের প্রতিবেদন, বাংলাদেশ বোটানি অলিম্পিয়াড ২০১৭ এর স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আরো ৪টি প্রকাশনা ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রকাশিত হবে।

১১। ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে বিজ্ঞানাগার উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদান: ২০১১ সনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়। ঐ আইনের আওতায় ১টি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। যার চেয়ারম্যান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সদস্য সচিব জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক। এ ট্রাস্টের তহবিল দ্বারা ইতোমধ্যে দেশের ৩৮৩টি প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞানাগার উন্নয়ন ও বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার এ তহবিলের অর্থ দ্বারা আয়োজন করা হয়।

১২। জাদুঘরের ১টি পরিবহন বাস দ্বারা ঢাকা মহানগরের ও নিকটবর্তী এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বিনা ভাড়ায় নিয়মিত জাদুঘর পরিদর্শনের জন্য আনা নেয়া করা হয়।

১৩। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের সাথে যৌথ উদ্যোগে এ প্রতিষ্ঠানে ১টি ইনোভেশন ল্যাব স্থাপিত হয়েছে। এই ল্যাবের মাধ্যমে নিয়মিত উদ্ভাবন বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

১৪। ওয়ার্কশপ: প্রতিষ্ঠানে ১টি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ওয়ার্কশপ আছে। যেখানে তরুন বিজ্ঞানীদের ৬০টি উদ্ভাবনী কার্যক্রমের উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যে কোন উদ্ভাবনী কার্যক্রমে তরুন বিজ্ঞানীরা বিনা খরচে এ ওয়ার্কশপ ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

১৫। বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে সহায়তা করা: সারাদেশে ৪৯০টি উপজেলা বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে বেসরকারিভাবে ৩৫৩টি বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা হয়েছে।

১৬। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ক্যাম্পাস ও ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী (মিউজু বাস) উন্মুক্ত ওয়াই ফাই সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৭। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ৪-ডি মুভি থিয়েটার নামক ডিজিটালাইজড প্রদর্শনীর মাধ্যমে একটি স্থায়ী বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৮। সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক কর্মকান্ড এক ছাতার নীচে আনার লক্ষ্যে ২টি আন্ডারগ্রাউন্ড বেইজমেন্ট সহ ১৩ তলা বিশিষ্ট জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুগর নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে প্রদর্শনী বস্তুসমূহ ডিজিটালাইজড করা হবে;
- বর্তমান প্রদর্শনীবস্তুসমূহ ডিজিটালি ইন্টারএকটিভ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- একটি সায়েন্স সিটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- মিউজু বাস ও মুভি বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- বিভাগীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান জাদুঘরের শাখা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- বিজ্ঞান প্রদর্শনী সমৃদ্ধ একটি ট্রেন চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- বিজ্ঞান প্রদর্শনী সমৃদ্ধ একটি নৌযান চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞানমনস্ক জাতিগঠনে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। মহান জাতীয় সংসদ প্রদত্ত এ দায়িত্ব পালনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ভবিষ্যতে যথাযথভাবে পরিকল্পনা বাস্তাবায়ন করা গেলে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে প্রতিষ্ঠানটি তার রুপকল্প বাস্তবায়নে সক্ষম হবে।

নক্ষত্রের জীবন

ড. সালেহ্ হাসান নকীব
প্রফেসর, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাতের আকাশে দৃশ্যমান অনন্ত নক্ষত্রবীথি স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এর অপার সৌন্দর্য কবিদের অনুপ্রাণিত করেছে। বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের ভাবিয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র, সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্য নিজেই যে একটি নক্ষত্র বা তারা তা বুঝতে মানুষের সময় লেগেছে।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাস (Anaxagoras) ধারণা করেন অন্যান্য তারার মত সূর্যও একটি নক্ষত্র। অ্যানাক্সাগোরাস অবশ্য মনে করতেন নক্ষত্রগুলি হচ্ছে আগুনে মোড়া বিশাল সব পাথুরে খণ্ড। একেকটির ব্যাস কয়েকশত মাইলের মত। অ্যানাক্সাগোরাসের এই ধারণা সে কালে তেমন গ্রহণযোগ্য হয়নি। এর প্রায় দু'হাজার বছর পর গ্যালিলিও এবং ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনস্ বিভিন্ন তত্ত্ব উপাত্তের মাধ্যমে সূর্যের নক্ষত্র পরিচয়টি সবার সামনে নিয়ে আসেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিজ্ঞানী মহল সূর্যকে একটি নক্ষত্র বলে মেনে নিয়েছেন।

পাঠ্যপুস্তক ঘাঁটলে দেখা যাবে নক্ষত্রগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এমন সব মহাজাগতিক বস্তু পিণ্ড হিসেবে যাদের আলো দেওয়ার ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ তারাগুলো কোটি কোটি বছর ধরে আলোক শক্তি উৎপাদন করে যেতে পারে। অন্যদিকে পৃথিবী বা চাঁদের মত গ্রহ, উপগ্রহগুলি তারার আলোয় আলোকিত হয়। এদের নিজেদের আলোক শক্তি তৈরির ক্ষমতা নেই। এই তারা বা নক্ষত্রগুলো আসলো কোথা থেকে? মহাবিশ্বের শুরু থেকেই কি এরা ছিল? প্রাচীন কালে ধারণা করা হত, মহাবিশ্বের শুরু থেকেই তারারা আছে এবং থাকবে - অক্ষয় এবং অবিনশ্বর। এখন অবশ্য আমরা জানি শুরুতে তারারা ছিল না, তারারা অক্ষয়ও নয়। এদের আছে সৃষ্টি এবং লয়, এমনকি মৃত তারা থেকে নতুন তারা সৃষ্টির পরম্পরা। অনেকটা জীবজগতে ঘটে যাওয়া জীবনচক্রের মত।

দৃশ্যমান মহাবিশ্বের বয়স প্রায় চৌদ্দ বিলিয়ন বছরের কাছাকাছি। শুরু থেকে মহাবিশ্বের বিকাশ ও প্রসারণ কয়েকটি ধাপে সংঘটিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখাটিতে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তা বিগ-ব্যাং কসমোলজি (Big-bang cosmology) নামে পরিচিত। বিগ-ব্যাং কসমোলজি আমাদের সামনে মহাবিশ্বের যে প্রতিরূপটি (model) ফুটিয়ে তোলে তা অনুযায়ী অকল্পনীয় শক্তিঘনত্ব (energy density) থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি। উৎপত্তিক্ষণ থেকে মাত্র তিন মিনিটের মাথায় কিছু অত্যন্ত হালকা পরমাণুর নিউক্লিয়াস তৈরি হওয়া শুরু হয়। এই নিউক্লিয়াসগুলোর মধ্যে ছিল প্রধানত হাইড্রোজেন, ডিউটেরন (একটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রন নিয়ে গঠিত হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ), হিলিয়াম এবং কিছু লিথিয়াম। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত এই তিন মৌলই মহাবিশ্ব জুড়ে অনেকটা রাজত্ব করছে। সময়ের সাথে সাথে একটু একটু করে ভারী মৌল তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে অনেক পরে। এদের সৃষ্টি মূলত তারার গর্ভে এবং কখনো কখনো সুপারনোভা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে।

প্রাচীনতম গ্যালাক্সিগুলোর জন্ম বিগ-ব্যাং-এর কয়েকশ মিলিয়ন বছর পরে। এই সমস্ত গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রদের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার শুরুও মোটামুটি একই সময়ে। সেই সময় থেকে এখন অব্দি নতুন নতুন গ্যালাক্সি এবং তারা তৈরির ধারাবাহিকতা চলছে নিরন্তর। দৃশ্যমান মহাবিশ্বে $১০^{২৩}$ (একের পর তেইশটি শূন্য!) এর অধিক নক্ষত্র।

একটি নক্ষত্র জন্ম নেয় কিভাবে? মহাবিশ্বজুড়ে এদিক ওদিক ছুটে বেড়ানো হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের মত হালকা মৌলগুলির ভেতর মহাকর্ষীয় বল বিদ্যমান। মূলত ভর আছে এমন সকল বস্তুকণার মধ্যে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল কাজ করে। এই আকর্ষণ বলের প্রভাবে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের মত অণুগুলি পরস্পর কাছে আসে। সৃষ্টি হয় গ্যাস পিন্ডের এই পিন্ডে অবস্থিত গ্যাস কণা আরেক নাম, তারকা ধূলি (stellar dust) এই গ্যাস পিণ্ড আকারে এবং সামগ্রিক ভরে যতই বড় হতে থাকে, সৃষ্ট মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র (gravitational field) ততই শক্তিশালী হয়। ফলশ্রুতিতে তা আরও দূরে অবস্থিত অণু পরমাণুদের কাছে টেনে আনার ক্ষমতা লাভ করে। এতে গ্যাস পিণ্ড আকারে আরো বড় এবং ভারী হয়, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র হয় আরো শক্তিশালী। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় বিশাল সব গ্যাস পিণ্ড। বাংলায় এদের বলা যেতে পারে

প্রাক-নক্ষত্র। ইংরেজিতে বলা হয় প্রোটোস্টার (Protostar)। অপেক্ষাকৃত হালকা পিণ্ডগুলো থেকে সৃষ্টি হতে পারে গ্রহসমূহের। তবে গ্রহসমূহের গঠন উপাদান নক্ষত্র থেকে কিছু আলাদা। গ্রহগুলোতে ভারী মৌলের পরিমাণ অনেক বেশী। তো যাই হোক, এই গ্যাসীয় প্রাক-নক্ষত্রের মধ্যেকার অণুগুলো নিজেরাও মাধ্যাকর্ষণ জনিত আকর্ষণ বল অনুভব করতে থাকে এবং একে অপরের কাছে চলে আসে। ফলে ঘনত্ব বাড়তে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় বিপুল তাপ। এই তাপ শক্তির উৎস ক্রমহ্রাসমান মহাকর্ষীয় বিভব শক্তি (gravitational potential energy)। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে অবস্থিত বস্তুকণা যখন পরস্পর কাছাকাছি আসে তখন মহাকর্ষীয় বিভব শক্তি কমতে থাকে। হারানো শক্তি পরিণত হয় তাপ শক্তিতে। শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী - শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শক্তি কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। এখানেও ঠিক তাই ঘটে। মহাকর্ষীয় বিভব শক্তির হ্রাসকৃত অংশটি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে সংকোচনশীল প্রাক-নক্ষত্রের কেন্দ্রে গ্যাসের ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার প্রান্তিক মান নির্ভর করে প্রাক নক্ষত্রের সমগ্র ভরের উপর। তাপমাত্রা একটি পর্যায়ে পৌছালে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া শুরু হয়। শুরু হয় নিউক্লিয়ার ফিউশন (nuclear fusion)।

ফিউশন একটি নিউক্লিয়ার মিথস্ক্রিয়ার (nuclear interaction) নাম। ফিউশনের ফলে দুটি হালকা নিউক্লিয়াস জোড়া লেগে একটি ভারী নিউক্লিয়াস তৈরি হয়। ফিউশন বিক্রিয়ায় বিপুল শক্তি উৎপন্ন হয়। সৌরজগতের অধিপতি সূর্য প্রায় পাঁচশো কোটি বছর ধরে যে তাপ ও আলোক শক্তি বিতরণ করে চলেছে তার পেছনে রয়েছে এই নিউক্লিয়ার ফিউশন। ফিউশনের সরলতম উদাহরণ হচ্ছে দুটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস মিলে একটি ডিউটেরন নিউক্লিয়াস তৈরি এবং এই ডিউটেরন নিউক্লিয়াসের সাথে আবারও একটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংযুক্ত হয়ে হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়াস সৃষ্টি। দুটি হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়াস থেকে ফিউশনের ফলে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় হিলিয়াম-৪ সেই সাথে দুটি হাইড্রোজেন। এই পুরো প্রক্রিয়া থেকে শক্তি উৎপাদিত হয় ২৪ মেগা ইলেকট্রন-ভোল্টের মত। যে সমস্ত নিউক্লিয়াস ফিউশনে অংশ নেয় এবং ফিউশন শেষে যা পাওয়া যায় তাদের ভেতর ভরের পার্থক্য রয়েছে। এই হারানো ভরটুকুই আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E=mc^2$ সূত্র অনুযায়ী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে যে শক্তি পাই তার উৎস হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া। একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তা মোটামুটি কয়েক ইলেকট্রন-ভোল্ট পর্যায়ের। এক মেগা ইলেকট্রন-ভোল্ট হচ্ছে এক মিলিয়ন বা দশলক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্টের সমান। কাজেই যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার চেয়ে নিউক্লিয়ার ফিউশন থেকে লক্ষ বা কোটি গুণে বেশি শক্তি উৎপন্ন হয়। ফিউশনের ফলে নক্ষত্রের কেন্দ্রে বিপুল পরিমাণে অতিরিক্ত তাপ শক্তির উদ্ভব হয়। এই শক্তি ফিউশন বিক্রিয়ার হারকে করে তরান্বিত এবং যতক্ষণ ফিউশন উপযোগী অপেক্ষাকৃত হালকা মৌলের নিউক্লিয়াসের সরবরাহ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ এই প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত ভারী নিউক্লিয়াস তৈরি এবং শক্তি উৎপাদনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। নক্ষত্র শক্তি উৎপাদন করতে থাকে। নিচে কয়েকটি ফিউশন বিক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হল-

হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস + হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস→ডিউটেরন নিউক্লিয়াস + পজিট্রন[১] + নিউট্রিনো[২]

ফিউশনের ফলে উৎপন্ন ডিউটেরনটি আর একটি হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়-

ডিউটেরন নিউক্লিয়াস + হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস→হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়াস[৩] + গামা রশ্মি

এরপর হিলিয়াম-৩ অপর একটি হিলিয়াম-৩ এর সাথে যুক্ত হয়-

হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়াস + হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়াস→হিলিয়াম-৪ নিউক্লিয়াস[৪] + হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস + হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস

এই ফিউশন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হয় এবং প্রক্রিয়া শেষে শক্তি পাওয়া যায় ২৪.৭ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট।

আগেই বলা হয়েছে, নক্ষত্রের কেন্দ্র যথেষ্ট উত্তপ্ত না হলে ফিউশনের শুরু হয় না। যেমন হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের ফিউশন চক্র শুরু করতে হলে একটি নক্ষত্রের কেন্দ্রের তাপমাত্রা হতে হয় এক কোটি ডিগ্রী কেলভিনের কিছু বেশী। বেশীরভাগ ধাতব পদার্থ হাজার ডিগ্রী কেলভিনেই গলে যায়। কাজেই নক্ষত্রের কেন্দ্র কি ভীষণ উত্তপ্ত, এ থেকে নিশ্চয়ই তা

বোঝা যাচ্ছে। এই প্রচণ্ড উত্তাপ ফিউশনের জন্য কেন প্রয়োজন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের ইলেকট্রিক চার্জের ভেতরে যে মিথস্ক্রিয়া তা বিবেচনায় আনতে হবে। সকলেই জানেন, সমধর্মী চার্জ পরস্পর বিকর্ষণ করে। ধরা যাক দুটি সমধর্মী চার্জ আছে যাদের ভেতর বিকর্ষণ বল বিদ্যমান। এই বলকে কুলম্ব বল বলা হয়। এই বিকর্ষণ বল চার্জ দুটির মানের গুণফল এবং তাদের মধ্যকার দূরত্বের উপর নির্ভর করে। দূরত্ব যত কম বিকর্ষণ বল তত তীব্র (পাঠ্যবইয়ের ভাষায় বলতে হয়, চার্জদ্বয়ের মধ্যকার কুলম্ব বল চার্জগুলোর মানের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের ভেতর দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক)। ফিউশনের কথায় ফিরে আসি। হাইড্রোজেন নিয়েই একটু ভাবা যাক। হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসে একটি করে প্রোটন আছে। প্রোটনের চার্জ ধনাত্মক এবং মানের দিক থেকে ইলেকট্রনের চার্জের সমান। কাজেই দুটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের ভেতর কুলম্ব বিকর্ষণ কাজ করে। হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস দুটির মধ্যে দূরত্ব যতই কমবে এই বিকর্ষণ বল ততই বাড়তে থাকবে। অর্থাৎ বিকর্ষণী কুলম্ব বল কখনোই চাইবে না যে দুটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস পরস্পর কাছাকাছি আসুক। অথচ যথেষ্ট কাছাকাছি না আসলে ফিউশন ঘটার কোন সম্ভাবনাও নেই। কুলম্ব বিকর্ষণকে উপেক্ষা করে কাছে আসতে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের প্রয়োজন উচ্চ গতি শক্তি। নক্ষত্রের কেন্দ্রে তৈরি হওয়া বিপুল তাপ শক্তি থেকেই হালকা নিউক্লিয়াসগুলো এই গতি শক্তি লাভ করে এবং কুলম্ব বাধা অতিক্রম করে ফিউশন বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। যে সব গ্যাসপিন্ড অপেক্ষাকৃত হালকা তার কেন্দ্র যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে ওঠে না। ফিউশন শুরু হয় না এবং এরা শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রে পরিণত হতে পারে না। নক্ষত্র তারাই কেবলমাত্র যাদের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়ার ফিউশন চলছে এবং অবিরাম শক্তি উৎপাদন জারি আছে। গ্যাস পিণ্ড-থেকে ফিউশন শুরুর আগ পর্যন্ত অবস্থাটিকে গর্ভস্থ ভ্রূণের সাথে তুলনা করা যায়। ফিউশন শুরুর অর্থ হচ্ছে একটি শিশু তারার জন্ম।

একটি নক্ষত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার ভর এবং আয়তন। নক্ষত্রের আয়তন নির্ভর করে দুটি নিয়ামকের উপর। ফিউশনের ফলে কেন্দ্রে সৃষ্ট শক্তি বাইরের দিকে প্রবাহিত হয়। এর প্রবণতা হচ্ছে নক্ষত্রটিকে স্ফীত করে তোলা। অন্যদিকে সর্বদা আকর্ষণী মহাকর্ষ বল চায় নক্ষত্রটিকে সংকুচিত করতে। এই দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রের একটি সাম্য (equilibrium) আয়তন দাঁড় করায়। যেকোনো একটি প্রবণতা অপরটিকে ছাপিয়ে গেলে একটি নক্ষত্র হয় স্ফীত অথবা সংকুচিত হতে শুরু করে। যখন একটি প্রবণতা অন্যটির সমান হয় তখন নক্ষত্রের আয়তন স্থির থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় উদস্থিতিক সাম্যাবস্থা (hydrostatic equilibrium)। ভারী নক্ষত্রের অভ্যন্তরে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে ভিন্ন ভিন্ন ফিউশন চক্র। শুরুতে হাইড্রোজেন থেকে ডিউটেরন, এর পর হিলিয়াম, ইত্যাদি। এই অবস্থায় নক্ষত্রের ভেতর তৈরি বহির্মুখী শক্তি প্রবাহ অনেক সময় মাধ্যাকর্ষণজনিত বিভব শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়। নক্ষত্র তখন আকারে বড় হতে থাকে। নক্ষত্রের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন থেকে ফিউশনের মাধ্যমে হিলিয়াম তৈরির হার এক পর্যায়ে কমে আসে (যেহেতু কেন্দ্রে হাইড্রোজেনের মজুদ অসীম নয়)। কেন্দ্রে জমা হতে থাকে আপার নিষ্ক্রিয় হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। তবে একই সাথে ফিউশনসৃষ্ট তাপের ফলে কেন্দ্রের কাছে চারিদিকে অবস্থিত হাইড্রোজেন স্তরে নতুন করে ফিউশন শুরু হতে পারে। এই অবস্থায় শক্তি উৎপাদনের হার আবার বৃদ্ধি পায় এবং নক্ষত্রটি দ্রুত স্ফীত হতে শুরু করে। একটি নক্ষত্রের ঘনত্ব সবখানে একই রকম নয়। কেন্দ্রের চারপাশে ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। কেন্দ্র থেকে দূরুত্ব বাড়ার সাথে সাথে ঘনত্ব কমতে থাকে। নক্ষত্রের স্ফীতি মূলত অপেক্ষাকৃত হালকা এই বাইরের স্তরেই। একটি স্ফীত নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ শত থেকে হাজার গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে, আয়তন বেড়ে দাঁড়াতে পারে মিলিয়ন গুণ। এই ধরণের স্ফীত নক্ষত্রকে লাল দানব (Red giant) বলা হয়ে থাকে।

আমরা জেনেছি, সূর্যের বয়স প্রায় পাঁচ বিলিয়ন বছর। সৃষ্টির পর থেকেই সূর্যের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন ফিউশন চলছে। এই ফিউশন চলবে আরও পাঁচ বিলিয়ন বছর ধরে। এর শেষ দিকে সূর্য পরিণত হবে এক লাল দানবে। বর্তমানে সূর্যের যে আকার, লাল দানব দশায় আকার (আয়তন) গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় মিলিয়ন গুণে বড় (চিত্র-১)। সূর্য স্ফীত হতে শুরু করলে সৌরজগতের সকল গ্রহ প্রবলভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। সাগর শুকিয়ে যাবে। ধারণা করা হয় এক পর্যায়ে সূর্য এতটাই স্ফীত হয়ে যাবে যে পৃথিবী ঢুকে যাবে সূর্যের অভ্যন্তরে। পৃথিবী নামক আমাদের এই অতি প্রিয় গ্রহটির এই দুর্গতির কথা ভাবলে খারাপ লাগতে পারে। তবে স্বস্তির কথা হচ্ছে এমন ঘটনা ঘটতে এখনো শত শত কোটি বছর দেরি আছে। লাল দানব দশা সূর্যের বা তুলনীয় ভর বিশিষ্ট নক্ষত্রগুলোর শেষ পরিণতি নয়। তবে অন্তিম সময়ের শুরু। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন এখন থেকে প্রায় পাঁচশো কোটি বছর পর, সূর্য পরিপূর্ণ লাল দানবে পরিণত হওয়ার পরে

ফিউশনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করতে পারবে আর মাত্র দশ কোটি বছর পর্যন্ত। নক্ষত্রের জীবনের এই শেষ দশ কোটি বছর অত্যন্ত ঘটনাবহুল এবং তার খুঁটিনাটি বর্ণনা বুঝতে হলে জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকতে হবে। এই লেখাটি যেহেতু সকল শ্রেণি এবং পেশার পাঠকদের কথা বিবেচনা করে রচিত, খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বাদ দিয়ে অনেকটা মোটা দাগে লাল দানব পরবর্তী সময়টুকুর একটি সহজ এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আশ্রয় আমরা নিতে যাচ্ছি।

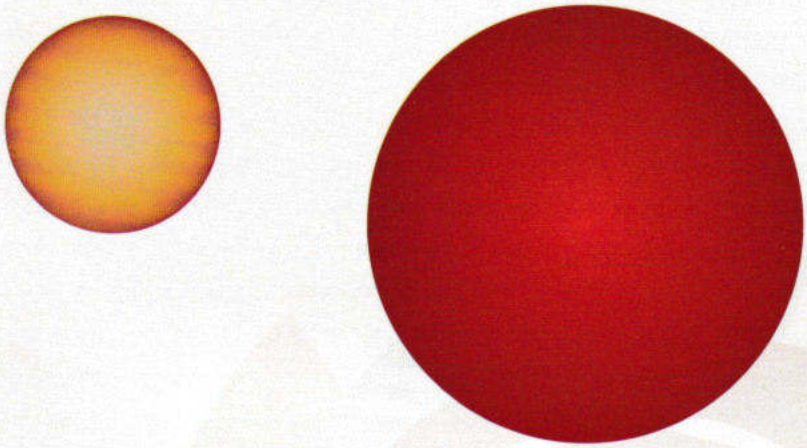

চিত্র-১ বামে আজকের সূর্য। ডানে সূর্য-লাল দানব দশায়। একটি তুলনামূলক চিত্র।

লাল দানব দশায় নক্ষত্রের কেন্দ্রে হাইড্রোজেনের চেয়ে উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট হিলিয়াম নিউক্লিয়াস জমা হয়। উচ্চ ঘনত্ব শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং নক্ষত্রের কেন্দ্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে তাপমাত্রা দশ কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াসে পৌছায়। এই তাপমাত্রা হিলিয়াম ফিউশন চক্র শুরুর জন্য উপযোগী। এর ফলে শুরু হয় বিপুল হারে কেন্দ্রীয় হিলিয়াম ফিউশন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন। হিলিয়াম ফিউশন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় কার্বন এবং অক্সিজেনের মত ভারী নিউক্লিয়াসের। কার্বন তৈরির প্রক্রিয়াটি ট্রিপল্-আলফা প্রক্রিয়া নামে পরিচিত এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহাবিশ্বে প্রাণের যে অস্তিত্ব তা আমাদের জানামতে পুরোপুরি কার্বন-নির্ভর। কার্বন নিউক্লিয়াসের একটি বিশেষ উত্তেজিত শক্তিস্তরের উপস্থিতি নক্ষত্রের গর্ভে কার্বন তৈরিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখে। কেতাবি ভাষায় ঘটনাটিকে আমরা কার্বন রেজোন্যান্স (অনুনাদ) বলে থাকি। পদার্থবিদ ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) এই অনুনাদের ধারণা উপস্থাপন করেন বলে একে হয়েল রেজোন্যান্সও বলা হয়ে থাকে। এই বিশেষ শক্তিস্তরটি না থাকলে মহাবিশ্বে কার্বনের পরিমাণ হত অনেক কম এবং কার্বন-নির্ভর প্রাণের অস্তিত্বই হয়ত অসম্ভব হয়ে উঠত। কার্বন নিউক্লিয়াসের সাথে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস ফিউশনের মাধ্যমে যুক্ত হতে পারে, এর ফলে তৈরি হয় অক্সিজেন। অক্সিজেনও প্রাণের জন্য এক অপরিহার্য মৌল। এছাড়াও কার্বন এবং হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের সম্মিলনে সৃষ্টি হয় নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াস। ট্রিপল্-আলফা থেকে কার্বন এবং ক্রমান্বয়ে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সৃষ্টির ফিউশন প্রক্রিয়াকে একত্রে কার্বন সাইকেল বা চক্র বলা হয়ে থাকে।

সূর্য বা তার কাছাকাছি ভর সম্পন্ন নক্ষত্রের জন্য এই কার্বন সাইকেলই হচ্ছে শেষ ফিউশন চক্র। সূর্যের চেয়ে অনেক কম ভর বিশিষ্ট তারকারাজির জন্য হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরির প্রক্রিয়াই শেষ কথা। যেসব নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে অনেক গুণে ভারী সেখানে কার্বন সাইকেলের পরবর্তী সাইকেলগুলো চলতে থাকে। এর ফলে তৈরি হয় অক্সিজেনের চেয়ে ভারী মৌল সমূহ। একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে, নক্ষত্রের ভর যত কম তার জীবনকাল তত দীর্ঘ। আসলে অধিক ভর তীব্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি করে এবং নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এর ফলে ফিউশন তরান্বিত হয়। সব মিলিয়ে নক্ষত্রের ভেতর ফিউশনযোগ্য নিউক্লিয়াসগুলি খুব দ্রুত নিজ নিজ সাইকেল বা চক্র সমাপ্ত করে।

লাল দানবে পরিণত হবার পর, এক পর্যায়ে নক্ষত্র তার বাইরের অংশটুকু চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। খুব সহজ কথায় বলতে গেলে, এর কারণ হচ্ছে ফিউশন সৃষ্ট বহির্মুখী চাপ এবং মাধ্যাকর্ষণজনিত অন্তর্মুখী চাপের টানাপোড়ন। এর ফলে নক্ষত্রের বাইরের স্তর কিছুটা 'আলগা' হয়ে যায় এবং ফিউশন শক্তি যখন মাধ্যাকর্ষণজনিত বিভব শক্তিকে ছাড়িয়ে যায় তখন এই 'আলগা' অংশটি নক্ষত্রের চারপাশের মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। নক্ষত্রের ভেতরের দিকের উচ্চ ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা বিশিষ্ট অংশ অটুট থাকে। একে আমরা নক্ষত্রের অবশিষ্টাংশ বলে অভিহিত করব। নক্ষত্রের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া বস্তুসমূহকে

(হাইড্রোজেন, হিলিয়ামের মত হালকা মৌল এবং কিছু অন্যান্য আয়নিত গ্যাস) প্ল্যানেটারি নেবুলা (Planetary nebula) বলা হয় (চিত্র-২)। এই অবস্থায় নক্ষত্রের ভেতরের অংশে নতুন করে ফিউশন চক্রে অংশ নেওয়ার মত আর কোন নিউক্লিয়াস অবশিষ্ট থাকে না। শক্তির উৎস নিঃশেষ হওয়ায় মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে চাপ সৃষ্টি করা প্রথম দিকে সম্ভব হয় না। ফলে নক্ষত্রের এই অবশিষ্টাংশ মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সংকুচিত হতে থাকে। সূর্যের সাথে তুলনীয় ভরের নক্ষত্রগুলোর ক্ষেত্রে এই সংকোচন একটি পর্যায়ে এসে থেমে যায়। এর কারণ হচ্ছে ইলেকট্রনের একটি বিশেষ ধর্মের কারণে সৃষ্ট বহির্মুখী চাপ। আমরা বলি electronic degeneracy pressure, বাংলায় ইলেক্ট্রনিক আপজাত্য চাপ। বিষয়টি বুঝতে হলে মৌলিক কণাগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু জানতে হবে। মৌলিক কণাগুলোকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে- ফার্মিয়ন (Fermion) এবং বোসন (Boson) (বাঙ্গালী পদার্থবিদ সত্যেন বোসের নামানুসারে)। একটি সিস্টেমে দুটি ফার্মিয়ন কখনো একই অবস্থায় (কঠিন করে বললে, একই কোয়ান্টাম স্টেটে) থাকতে পারে না। এটাই বিজ্ঞানী পাউলির বর্জন নীতি (Pauli's exclusion principle)। অন্য দিকে যারা বোসন তারা মিশুক প্রকৃতির, একই অবস্থায় অনেকের থাকতে কোন আপত্তি নেই। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন হচ্ছে ফার্মিয়নের উদাহরণ। আলোক কণিকা, ফোটন, বোসনের একটি উদাহরণ। নক্ষত্রের অবশিষ্টাংশে যে ইলেকট্রনগুলো আছে তারা সংকোচনের ফলে কাছাকাছি চলে আসে। এক সময় সংকোচন এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে বর্জন নীতি মেনে চলা এই ইলেকট্রনগুলোর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় ইলেকট্রনগুলো তাদের ফার্মিয়নিক প্রকৃতি বজায় রাখতে গিয়েই মাধ্যাকর্ষণজনিত সংকোচন প্রবণতার বিপরীতে একটি চাপ সৃষ্টি করে। এই দুইয়ে মিলিয়ে একটি সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং নক্ষত্রের অবশিষ্টাংশ একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। এই নির্দিষ্ট আকারের উত্তপ্ত এবং সংকুচিত বস্তুপিণ্ডকে শ্বেত বামন (White dwarf) বলা হয়ে থাকে। শ্বেত বামন সূর্যের মত তারাদের শেষ পরিণতি। আসলে এদের তারার অবশিষ্টাংশ বলাই শ্রেয়, কারণ এরা তারা নয়। তারা হতে হলে একটি আভ্যন্তরীণ শক্তির উৎস থাকতে হয়। শ্বেত বামনের তা নেই।

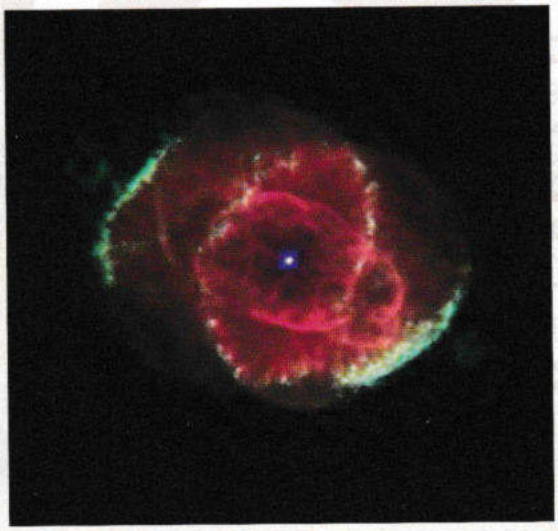

চিত্র-২ প্ল্যানেটারি নেবুলা। নক্ষত্রের উত্তপ্ত কেন্দ্রীয় অংশটি নেবুলার মধ্যে উজ্জ্বলভাবে দৃশ্যমান।

বাইরের স্তর মহাশূন্যে ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যের অবশিষ্টাংশ যখন শ্বেত বামনে পরিণত হবে তখন তার ভর গিয়ে দাঁড়াবে আজকের ভরের মোটামুটি ৬০ শতাংশ। সংকুচিত এই শ্বেত বামনের আকার হবে পৃথিবীর কাছাকাছি। এই মুহূর্তে সূর্যের ভর পৃথিবীর ৩,৩০,০০০ গুণ। আয়তন পৃথিবীর ১৩,০০,০০০ গুণ। অর্থাৎ শ্বেত বামন দশায় সূর্যের অবশিষ্টাংশের ভর হবে পৃথিবীর তুলনায় প্রায় দুই লাখ গুণে বেশি কিন্তু আয়তন পৃথিবীর সমান। শ্বেত বামনের বস্তু ঘনত্ব সম্পর্কে এখান থেকে একটি ধারণা পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যেতে পারে। আমরা সবাই এক লিটারের বোতল দেখেছি। এই বোতল যদি শ্বেত বামনের উপাদান দিয়ে ভর্তি করা হয় তবে তার ভর গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় দৃশ্যে পূর্ণ বয়স্ক আফ্রিকান হাতির সমান। রাতের আকাশে শ্বেত বামন একটি ক্ষুদ্র আলোক বিন্দুর মত দেখায়। মহাকাশের গড় তাপমাত্রা অত্যন্ত কম। তাপগতিবিদ্যার রীতি অনুযায়ী উত্তপ্ত বস্তু শীতল পরিবেশে তাপ শক্তি হারাতে থাকে। এই নিয়ম

অনুসারে শ্বেত বামন মহাকাশে তাপ শক্তি বিকিরণের মাধ্যমে একটু একটু করে শীতল হতে থাকে। শীতল হওয়ার সাথে সাথে তার উজ্জ্বলতাও কমতে থাকে। এই প্রক্রিয়া অবশ্য অত্যন্ত ধীর। একটি শ্বেত বামনের শীতলীকরণ প্রক্রিয়া শেষ হতে হাজার কোটি বছরেরও বেশি সময় লাগতে পারে। শীতলীকরণ শেষে শুরুতে উজ্জ্বল, শ্বেত বামন তার উজ্জ্বলতা হারায়। তখন আর তা দৃশ্যমান থাকে না। এই অবস্থায় একে কৃষ্ণ বামন বলাটাই সঙ্গত। আমাদের সবচেয়ে কাছের শ্বেত বামনটি হচ্ছে সিরিয়াস-বি (Sirius-B), দূরত্ব প্রায় ৮.৬ আলোকবর্ষ[৬৫]।

সূর্যের চেয়ে দশগুণ বা তার চেয়েও বেশি ভর বিশিষ্ট নক্ষত্রগুলো ফিউশন শেষে শ্বেত বামনে পরিণত হয় না। এরা নিউট্রন তারায় (Neutron star) রূপান্তরিত হয়। নিউট্রন তারা নামে তারা হলেও প্রকৃত পক্ষে তারা নয়, কারণ শ্বেত বামনের মতই এর ফিউশনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনের কোন ক্ষমতা নেই। নিউট্রন তারার কথা বলতে গেলে যে চমকপ্রদ প্রসঙ্গটি সামনে চলে আসে তা হচ্ছে সুপারনোভা বিস্ফোরণ। ভারী নক্ষত্রের জীবন চক্রে সুপারনোভা বিস্ফোরণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমরা আগেই জেনেছি, ফিউশন চক্র শেষে নক্ষত্রের কেন্দ্রে উচ্চ ঘনত্বের ভারী মৌল পুঞ্জীভূত হতে থাকে। নক্ষত্রের ভর যত বেশি কেন্দ্রীয় ঘনত্বও তত বেশি। আবার এটাও আমাদের জানা যে নক্ষত্রের বাইরের স্তর অনেক হালকা এবং অনেকটাই আলগা। অতি উচ্চ ঘনত্বের কেন্দ্রীয় অংশ প্রবল শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ বলের সৃষ্টি করে। যেহেতু ফিউশন চক্র সমাপ্ত, কাজেই বহির্মুখী চাপ আর কার্যকরী থাকে না। এই অবস্থায় নক্ষত্রের বাইরের হালকা স্তর প্রবল বেগে সংকুচিত হতে চায় এবং কেন্দ্রের দিকে ধেয়ে আসে। এই ধেয়ে আসা বস্তু উচ্চ ঘনত্বের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারে না। এদের পরিণতি হয় অত্যন্ত দৃঢ় একটি দেয়ালের দিকে তীব্র গতিতে ধাবমান যে বস্তু আছড়ে পড়ে উল্টো দিকে ছিটকে যায় তার মত। এ এক মহাযজ্ঞ। সুপানোভা বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রের বাইরের আলগা অংশটি দ্রুতবেগে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৩০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। সুপারনোভা বিস্ফোরণে বিপুল পরিমাণ শক্তি মহাশূন্যে ছড়িয়ে যায়। অল্প সময়ের জন্য একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণে বিপুল পরিমাণ শক্তি মহাশূন্যে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। এই অল্প সময়ের জন্য একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের ঔজ্জ্বল্য একটি গ্যালাক্সির সকল তারার ঔজ্জ্বল্যকে হার মানাতে পারে। সুপারনোভা বিস্ফোরণের আরো একটি উপায় আছে। কোন কারণে যদি নক্ষত্রের অভ্যন্তরে হঠাৎ একটি শক্তিশালী ফিউশন চক্র শুরু হয় তাহলেও এমনটি ঘটতে পারে।

ফিউশনের মাধ্যমে ভারী মৌলের সৃষ্টি অবিরত চলতে পারে না। এর একটি সীমা আছে। এই সীমা নির্ধারণ করে নিউক্লীয় বন্ধন শক্তি (nuclear binding energy)। এই নিউক্লীয় বন্ধন শক্তি ফিউশনের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় নিকেলের (Ni) চেয়ে ভারী কোন মৌল তারার ভেতরে সৃষ্টি হতে দেয় না। তেজস্ক্রিয় নিকেল সৃষ্টির পরপরই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে লোহায় (Fe) পরিণত হয়। অর্থাৎ লোহাই তারার গর্ভে সৃষ্ট সবচেয়ে ভারী মৌল। তাহলে প্রশ্ন জাগে, লোহার চেয়ে ভারী মৌলগুলো আসলো কোথা থেকে? সুপারনোভা বিস্ফোরণ, এই প্রশ্নের একটি উত্তর। সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে যে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয় সেখান থেকে লোহার চেয়ে ভারী মৌল তৈরি হতে পারে। সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে একটি নক্ষত্র তার অনেকখানি ভর মহাকাশে ছড়িয়ে দেয়। কেন্দ্রীয় যে অংশটুকু রয়ে যায় তা হচ্ছে একটি নিউট্রন স্টার।

নিউট্রন তারার কথা আবার শুরুর আগে, শ্বেত বামনের প্রসঙ্গে একটু আসা যাক। শ্বেত বামন তার গঠনগত স্থিতি ধরে রাখে অন্তর্মুখী মাধ্যাকর্ষণজনিত চাপ এবং বহির্মুখী ইলেক্ট্রনিক আপজাত্য চাপের সমতার কল্যাণে। নিউট্রন তারাগুলোর ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটে। তবে ইলেকট্রনিক আপজাত্য চাপের পরিবর্তে এখানে বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি হয় নিউট্রন আপজাত্য দশা থেকে। ইলেকট্রনের মত, নিউট্রনও এক ধরণের ফার্মিয়ন। কাজেই বিশেষ পরিস্থিতিতে নিউট্রন আপজাত্য চাপের উদ্ভব ঘটতে পারে এবং তীব্র মহাকর্ষীয় সংকোচন প্রবণতা প্রশমিত করে একটি গঠনগত স্থিতির উদ্ভব হতে পারে। নিউট্রন তারার অকল্পনীয় বস্তু ঘনত্ব এই বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। শ্বেত বামনের বিপুল বস্তু ঘনত্বের কথা আগে বলা হয়েছে। কিন্তু নিউট্রন তারার বস্তু ঘনত্বের তুলনায় তা যেন কিছুই নয়। একটি ক্রিকেট বলের কথা বিবেচনা করি। নিউট্রন তারার উপাদান দিয়ে তৈরি একটি ক্রিকেট বলের ওজন এই মুহূর্তে পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল (সোতশো কোটির মত) মানুষের ওজনের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি।

একটি প্রসঙ্গ বোধহয় এখানে আলোচনার দাবী রাখে। আমরা জানি, মৌলের কেন্দ্রে থাকে প্রোটন আর নিউট্রন নিয়ে গঠিত নিউক্লিয়াস, আর কেন্দ্রের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ইলেকট্রন। প্রচণ্ড তাপের কারণে নক্ষত্রের ভেতরে ইলেকট্রনগুলো অবশ্য আর নিউক্লিয়াসের সাথে আটকানো থাকে না। তারা প্রবল গতি শক্তি নিয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে

থাকে। নিউট্রন তারা শুধুই নিউট্রন দিয়ে তৈরি। ফিউশনের ফলে সৃষ্ট কেন্দ্রীয় মৌলগুলোর প্রোটন আর ছোটাছুটি করতে থাকা ইলেকট্রনের কি হল? বিষয়টি বুঝতে হলে নিউক্লিয়াসের ইলেকট্রন ক্যাপচার (electron capture) নামক একটি প্রক্রিয়ার কথা জানতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় একটি প্রোটন এবং একটি ইলেকট্রন মিলে একটি নিউট্রন তৈরি হয়। সেই সাথে সৃষ্টি হয় অত্যন্ত হালকা ভর বিশিষ্ট এক মৌলিক কণিকা নিউট্রিনো। এভাবেই নিউট্রন তারায় প্রোটন এবং ইলেকট্রন বিলীন হয়ে বাড়তি নিউট্রন তৈরি হয়।

নক্ষত্রের ভর যদি আরো বেশি হয়? অর্থাৎ নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় অংশের ভর এবং ঘনত্ব যদি এত বেশি হয় যে নিউট্রন আপজাত্য চাপ মহাকর্ষীয় সংকোচনকে প্রশমিত করতে না পারে, তখন কি হবে? এই অবস্থায় মহাকর্ষীয় সংকোচন জয়ী হবে এবং নক্ষত্রটি ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হতে হতে সৃষ্টি হবে একটি ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ-বিবরের। কৃষ্ণ-বিবর হচ্ছে প্রায় অসীম ঘনত্বের বস্তু পিণ্ড যা বিশাল একটি তারকার জীবনের অন্তিম দশা। কৃষ্ণ-বিবর আসলেই কৃষ্ণ, তার কারণ এখান থেকে আলোও বেরিয়ে যেতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞানে মুক্তি বেগ বলে একটা কথা আছে। ইংরেজিতে বলে escape velocity। এই মুক্তি বেগে কোন বস্তুকে উপর দিকে ছুঁড়ে দিলে তা আর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে নিচে ফিরে আসে না। মুক্তি বেগ নির্ভর করে বস্তুর ঘনত্ব এবং আকারের ওপর। পৃথিবীর জন্য মুক্তি বেগ হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ১১ কিলোমিটারের একটু বেশি। এই বেগে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কোন ভর উপরে ছুঁড়ে দিলে তা আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। কৃষ্ণ-বিবরের জন্য মুক্তি-বেগ আলোর বেগের সমান বা তার চেয়েও বেশি। আবার আমাদের এটাও জানা আছে, কোন বস্তুকণাই আলোর বেগ অতিক্রম করতে পারে না। অর্থাৎ কৃষ্ণ-বিবরের ভেতর থেকে কোন বস্তুকণা তো দূরে থাক, আলোরও বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কৃষ্ণ-বিবরের ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। আমাদের পৃথিবী যদি সেই ঘনত্ব অর্জন করতে চায়, তাহলে তাকে মোটামুটি এক সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটি গোলকের ভেতর আবদ্ধ করে ফেলতে হবে। ব্যাপারটি দাঁড়াবে অনেকটা এই রকম-বড় সাইজের একটি মার্বেল, যার ভর সমগ্র পৃথিবীর সমান।

কৃষ্ণ-বিবর, নিউট্রন তারা, শ্বেত বামন বা লাল দানব, এর প্রতিটিই এক একটি বিশাল আলোচনা এবং গবেষণার বিষয়। ক্ষুদ্র পরিসরে খুব সামান্যই বর্ণনার সুযোগ আছে। এখানে যেটুকু বর্ণনা করা হয়েছে তা ক্ষেত্র বিশেষে অতিসরলিকৃত। পাঠকের মনে সামান্য কৌতুহল জাগানোই এর একমাত্র উদ্দেশ্য।

সমাপ্তি টানার আগে একটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। শুরুতে নক্ষত্রের জীবনের কথা বলা হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন ভরের নক্ষত্রের অন্তিম দশারই একটি বর্ণনা দিয়েছি। আসলে এই বর্ণনার মাঝেই নক্ষত্রের জন্মের কথাটিও পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। প্ল্যানেটারি নেবুলা এবং সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রের বাইরের যে অংশ মহাশূন্যে ছড়িয়ে পরে তা এক পর্যায়ে আবার মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করে গ্রহ, প্রাক-নক্ষত্র এবং শিশু নক্ষত্র। এ ভাবেই নক্ষত্ররা তাদের জন্ম, বিকাশ আর মৃত্যুর ধারাবাহিকতা হাজার কোটি বছর ধরে চালু রেখেছে।

[১]পজিট্রন-ইলেকট্রনের প্রতিকণা (antiparticle)। এদের ভর ইলেকট্রনের সমান তবে তড়িৎ আধান ইলেকট্রনের বিপরীত, অর্থাৎ ধনাত্মক।

[২]নিউট্রিনো-প্রায় ভরহীন এবং আধানহীন একটি মৌলিক কণিকা।

[৩]হিলিয়াম-৩ - হিলিয়ামের একটি আইসোটোপ। এর নিউক্লিয়াসে দুটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রন রয়েছে।

[৪]হিলিয়াম-৪ - হিলিয়ামের একটি আইসোটোপ। নিউক্লিয়াসে রয়েছে দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন। একে একত্রে আলফা কণাও বলা হয়।

[৫]আলোকবর্ষ হচ্ছে দূরত্বের একটি পরিমাপ। আলো শূন্য মাধ্যমে এক সৌর বছরে যে পথ অতিক্রম করে তাকে আলোকবর্ষ বলা হয়। প্রতি সেকেন্ডে আলো শূন্য মাধ্যমে তিন লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে।

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে রসায়নের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা

ড. মোঃ মুহিবুর রহমান
প্রাক্তন অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রয়োগ মানব সভ্যতাকে বর্তমান বিশ্বে এমন এক উচ্চপর্য্যায়ে নিয়ে গিয়েছে যা কয়েক দশক আগেও কল্পনাতীত ছিল। আজ মহাকাশ ও মহাসাগর আমাদের আয়ত্তে; বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে কথা বললে অন্য প্রান্তে শোনার ক্ষমতা প্রায় সকল মানুষের রয়েছে। যে সব রোগ অতীতে মহামারি ঘটিয়েছে, সেগুলোকে নির্মূল করা হয়েছে এবং অন্যান্য রোগের প্রতিষেধক আবিস্কার করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট খাদ্য উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। আবাসন এর উন্নয়ন এবং মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্র আবিষ্কার, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিনোদন-এর জন্য নতুন নতুন কৌশল ও সামগ্রী আমাদের জীবন যাত্রার গুণগত মানকে প্রতিনিয়ত উন্নত করছে।

মানব সভ্যতার এই অগ্রযাত্রায় রসায়ন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মাঠের যে ফসল মানবজাতির খাদ্য চাহিদা মেটাচ্ছে তার মূলে রয়েছে রসায়নবিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবিত সার এবং কীটনাশক। একবিংশ শতাব্দির বোয়িং ৭৮৭ উড়োজাহাজ, যার যাত্রী বহন ক্ষমতা পরিবহন ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে, তার নির্মাণ সম্ভব হয়েছে অত্যন্ত মজবুত কিন্তু হালকা কার্বন ফাইবারযুক্ত পলিমার আবিষ্কার-এর ফলে। আজকের এই ডিজিট্যাল যুগে যে সব নিত্যব্যবহার্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী আমাদের জীবনধারায় অবিচ্ছেদ্য অংগ হয়েছে, সেগুলোর নির্মাণে ব্যবহৃত বস্তু রসায়ন গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়েছে। মুঠোফোন, টেলিভিশন ইত্যাদি যন্ত্রের এল-ই-ডি স্ক্রীন, এদের বডি নির্মাণে ব্যবহৃত কম্পোজিট পলিমার এবং সর্বোপরি এদের কেন্দ্রীয় যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত সিলিকন চিপ রসায়ন গবেষণারই ফল। সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত সোলার প্যানেলের পি-ভি সেল-নির্মাণে এই সিলিকনই সর্বোত্তম বস্তু। তবে অল্পতর খরচে উৎপাদনযোগ্য এবং অধিকতর স্থায়িত্ব বিশিষ্ট বিকল্প বস্তুর সন্ধানে বিজ্ঞানীদের যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, তাতে রসায়ন শাস্ত্রের মূখ্য ভূমিকা রয়েছে। রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ আবিস্কার রসায়ন গবেষণাগারেই হয়েছে এবং হচ্ছে। বাসস্থানসহ সবধরণের ভবন নির্মাণে এবং যানবাহন নির্মাণে ব্যবহৃত উত্তরোত্তর উন্নত মানের দ্রব্যাদির আবিষ্কারও রসায়ন গবেষণাগারে হচ্ছে।

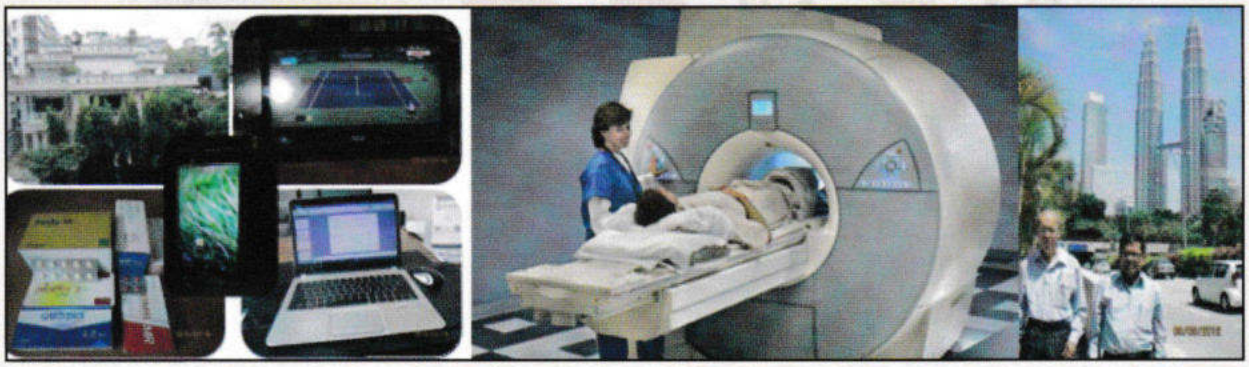

চিত্র-১: বর্তমান যুগে জীবন যাত্রার গুণগত মান-নির্দেশক কয়েকটি নমুনা: (বাম থেকে) বিলাসবহুল বাসভবন, টি.ভি. পর্দায় খেলাদেখা; ঔষধ সামগ্রী, ল্যাপটপ কমপিউটার; রোগ সনাক্ত করার এম.আর. আই. যন্ত্র; ইসপাত নির্মিত গগনচুম্বী অট্টালিকা।

রসায়ন শাস্ত্র বিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় অংগ। এটি মূলত এই বিশ্বের বস্তুসমূহের গঠন ও ধর্মাবলী এবং এক বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর আন্তঃক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা। সেই আলকেমির যুগ থেকে রসায়ন-এর প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন বস্তু উদ্ভাবন ও তৈরী এবং তাদের ধর্মাবলী নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চলে আসছে, মূলতঃ কৌতুহলী ও অনুসন্ধিৎসু মনের জ্ঞান-পিপাসা মেটানো এবং সেই সাথে মানবজাতির জীবন-মান-কে উন্নততর করার লক্ষ্যে।

রসায়ন শাস্ত্রের বিবর্তন ও বর্তমান পরিস্থিতিঃ

বস্তুর গঠন উদঘাটন এবং নতুন ব্যবহার উপযোগি বস্তু প্রস্তুতের প্রচেষ্টা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চলে আসছে। তাপ উৎপাদনের জন্য বস্তুর দহন বিশ লক্ষ বৎসর আগেও ব্যবহার করা হয়েছে বলে প্রমাণ রয়েছে। খৃষ্টপূর্ব চার হাজার সাল নাগাদ তামার ও টিনের আকরিক-এর মিশ্রণ উত্তপ্ত করে পিতল তৈরী করা হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব এক হাজার সাল নাগাদ লোহার আকরিক থেকে লৌহ নিষ্কাশন-এর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য বস্তু তৈরীতে এবং অস্ত্র তৈরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। আগুনের ব্যবহার দ্বারা গ্লাস উৎপাদনসহ ধাতু নিষ্কাশনের প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, তামাসহ মূল্যবান ধাতু তৈরী করা হয়েছে।

একটি বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র হিসেবে রসায়ন চর্চার শুরু হয় নবম শতাব্দীতে, ইসলামের স্বর্ণযুগে। মুসলিম রসায়নবিদদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন জাবির-বিন-হায়ান - যাকে রসায়নের জনক বলা হয়। তিনিই পরীক্ষাগারে পরিকল্পিত গবেষণার সূচনা করেন। তিনি বহু বস্তুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করেন এবং অম্ল ও ক্ষারের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করেন। অন্যান্য প্রখ্যাত রসায়নবিদদের মধ্যে আবু আল রায়হান আল বিরুনীর নাম উল্লেখ করা যায়, যিনি ভরের নিত্যতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর এংলো-আইরিশ রসায়নবিদ রবার্ট বয়েল-কে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি ১৬৬২ সালে বদ্ধপাত্রে গ্যাসের চাপ ও আয়তনের মধ্যে বিপরীত আনুপাতিক সম্পর্ক সূত্র, যা বয়েল সূত্র নামে পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রত্যেক পদার্থের এমন একটি গাঠনিক কণার ধারণা প্রবর্তন করেন, যে কণা পদার্থটির ক্ষুদ্রতম অংশ এবং যার মধ্যে পদার্থটির সব ধর্ম বিদ্যমান। বিত্তশালী পরিবারের সন্তান বয়েল ছিলেন একজন সৌখিন বিজ্ঞানী, "অদৃশ্য কলেজ" (বলে অভিহিত একটি বিজ্ঞানী-দলের) সদস্য। নিজের বাসভবনে পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে ১৬৬৩ সালে এই দলটির নাম হয় "The Royal Society of London for improving Natural knowledge"।

১৭৬৬ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিশ হাইড্রোজেন এবং ১৭৭৩ সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী কার্ল ভিলহেলম শীল এবং ইংলিশ রসায়নবিদ জোসেফ প্রিস্টলী অক্সিজেন আবিষ্কার করেন.

১৭৭৯ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী আন্টন লেভশিয়ে তার নিজস্ব গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে ভরের নিত্যতাসূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম রসায়ন চর্চায় পরিমাণ পরিমাপ ব্যবহার করেন, যার প্রেক্ষিতে তাকে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের জনক বলা হয়।

১৮০২ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ড্যালটন পদার্থের পারমাণবিক তত্ত্ব প্রস্তাব করেন এবং এর সাহায্যে রাসায়নিক সংযোগসূত্র ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন। বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাগারে রসায়ন বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত হয়। ১৮১১ সালে ইতালীর তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আমাদিও অ্যাভোগাড্রো গ্যাস-এর অ্যাভোগাড্রো সূত্র প্রতিষ্ঠিত করেন, যার ফলে অণুর ধারণা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তী শতক গুলোতে নতুন নতুন মৌল আবিষ্কৃত হয় এবং তাদের ধর্ম চিহ্নিত করা হয়। এই সময়ে পদার্থবিদ ও রসায়নবিদদের সমবেত প্রচেষ্টায় তাপ রসায়নের সূত্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পদার্থের, বিশেষভাবে গ্যাসের, গতিতত্ত্ব প্রয়োগ করে তাদের ভৌত ধর্ম ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। যে সব বিজ্ঞানী নিউটনের সূত্রের উপর ভিত্তিপ্রাপ্ত পৌরাণিক কৌশল পদ্ধতি প্রয়োগ করে পদার্থের ধর্মাবলী ব্যাখ্যা করেন তাঁদের মধ্যে জেমস মাক্সওয়েল ও লুডভিগ বোল্টজম্যান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ে নতুন নতুন মৌলের আবিষ্কার এবং ধর্মানুযায়ী তাদের শ্রেণী বিভাগ চলতে থাকে এবং ১৮৬৯ সালে রুশ বিজ্ঞানী দিমিত্রি মেন্ডেলিফ পর্য্যায় সূত্র প্রস্তাব করেন ও ধর্ম অনুযায়ী বিন্যস্ত মৌলের পর্য্যায় সারণী প্রবর্তণ করেন। তার এই সূত্র বর্তমানেও গৃহীত, তবে বহুলাংশে পরিমার্জিত হয়ে এখন সারণীটিতে ৯৪টি প্রাকৃতিক মৌলসহ মোট ১১৮টি মৌল রয়েছে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে পরমাণুর বন্ধন সম্বন্ধেও ধারনা প্রবর্তিত হয় এবং বিশেষ করে জৈব যৌগে

অণুর গাঠনিক কাঠামো নির্ধারণ পদ্ধতি প্রবর্তন হয়। যে সব বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এই উন্নয়ন ঘটে তাদের মধ্যে জার্মানীর বিজ্ঞানী অগাস্ট কেকুল এর নাম উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভৌত বিজ্ঞানে অনেক গুলো আবিষ্কার ভৌত ও রসায়ন বিজ্ঞানের ভিত্তি কাঁপিয়ে তোলে। এর মধ্যে রয়েছে পদার্থের আলোক তড়িৎ প্রভাব (হাইনরিশ হার্টস, ১৮৮৭), রঞ্জন রশ্মি (X-ray এর আবিষ্কার) ও পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা (অঁরি বেকারেল ১৮৯৬, রাথার ফোর্ড, পিয়েরকুরি, মারি কুরি)। ড্যালটন প্রবর্তিত পরমাণুর অবিভাজ্যতার ধারণা আর টিকলো না। হাইড্রোজেন পরমাণুর এমিশন বর্ণালীতে পরিলক্ষিত লাইন বর্ণালীর ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল না। ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশ পদার্থবিদ জে, জে, থমসন ইতোপূর্বে আবিষ্কৃত ক্যাথোড রশ্মির গুণাগুণ পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে এই রশ্মি কণার সমষ্টি এবং তিনি এই কণাকে পদার্থের গাঠনিক কণা হিসেবে ইলেক্ট্রন নামে অভিহিত করলেন এবং সকল পদার্থের গাঠনিক কণা হিসেবে চিহ্নিত করলেন। স্বর্ণপাত দ্বারা আলোক কণার বিচ্ছুরণ পরীক্ষর ফলাফল-এর উপর ভিত্তি করে রাথারফোর্ড পরমাণুর সোলার মডেল প্রস্তাব করেন, যার সারকথা হল যে পরমাণুর কেন্দ্রে ধনাত্মক আধান এবং অতিক্ষুদ্র ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট (10^{-10} মিঃ) নিউক্লিয়াস রয়েছে এবং ইলেকট্রনসমূহ নিউক্লিয়াসের চতুপার্শ্বে চলমান রয়েছে। পরমাণুর ভরের প্রায় সবটুকুই নিউক্লিয়াসে থাকে। ইতোমধ্যে ১৯০১ সালে পদার্থবিদ মাক্স প্লাংক কোনো উত্তপ্ত বস্তু থেকে আলোক রশ্মির বিকিরণ ব্যাখার জন্য তার যুগান্তকারী কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন উৎস থেকে নিৎসারিত আলোর শক্তির মান কেবল মাত্র একটি মৌলিক ইউনিটের বা শক্তি-প্যাকেটের গুনীতক হতে পারে। গাণিতিক ভাবে এই প্যাকেটের শক্তির জন্য প্লাংক প্রস্তাব করলেন যে $E=hn$ যেখানে n হল সংশ্লিষ্ট আলোক রশ্মির ফ্রিকুয়েন্সী এবং h একটি ধ্রুবক, যেটি পরবর্তীতে প্লাংক ধ্রুবক নামে অভিহিত হয়েছে। এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে আলোক তড়িৎ প্রভাব ব্যাখ্যা করেন এবং আলোর শক্তি-প্যাকেটকে "ফোটন" নামে অভিহিত করেন। প্লাংক-এর তত্ত্বের আলোকে হাইড্রোজেন পরমাণুর লাইন-বর্ণালী ব্যাখ্যা করার লক্ষে ১৯১৩ সালে ড্যানিশ বিজ্ঞানী নীল্‌স্ বোর তার পরমাণুর গঠনতত্ত্ব প্রস্তাব করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাণুর ইলেকট্রনসমূহ নিউক্লিয়াসের চতুর্পার্শ্বে নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ্যবিশিষ্ট অর্বিটে চলমান থাকে এবং নিদিষ্ট শক্তির শোষণ/বিকিরণ-এর মাধ্যমে অর্বিট পরিবর্তন করতে পারে। বোর তত্ত্ব দ্বারা হাইড্রোজেন পরমাণুর লাইন বর্ণালী ব্যাখ্যা সম্ভব হলেও লাইনসমূহের সূক্ষ্ম গঠন ব্যাখ্যা সম্ভব হয় নাই।

১৯২৫ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই দ্য ব্রগলি ইলেকট্রনের তরঙ্গ প্রকৃতি প্রস্তাব করেন এবং সকল পদার্থের জন্য কণা ও তরঙ্গ প্রকৃতি প্রস্তাব করে দুই ধরণের ধর্মের মধ্যে একটি সমীকরণ $l=h/p$ (দ্য ব্রগলি সমীকরণ) প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে নিকেল কেলাস দ্বারা ইলেকট্রন-এর ডিফ্র্যাকশন পরিমাপ করে এই সমীকরণ-এর যথার্থতা প্রমাণ করা হয়েছে। এতকাল বস্তু কণার জন্য নিউটনিয়ান কৌশল এবং তরঙ্গের জন্য তরঙ্গ কৌশল প্রয়োগ করা হত। কোন কণাতে উভয় আচরণ বিদ্যমান থাকলে তার জন্য প্রযোজ্য কৌশল উদ্ভাবন করলেন অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী এরউইন শ্রডিঙ্গার এবং জার্মান বিজ্ঞানী ভেরনার হাইযেনবার্গ, যা কোয়ান্টাম কৌশল নামে অভিহিত হয়। এই কৌশল দ্বারা পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন-এর অবস্থান বর্ণনা করার জন্য কোন বিন্দুতে তার অবস্থানের সম্ভাবনার ধারণা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং পরমাণুর এবং অণুর মধ্যে ইলেকট্রনের আচরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তমান যুগেও এই কৌশলের প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটে। পদার্থবিদ ও রসায়নবিদদের মধ্যে সহযোগিতার ফলে গবেষণা ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উম্মোচিত হয়। তিরিশের দশকে জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান পরমাণুর বিভাজন এবং এর ফলে নতুন মৌল উৎপাদন এবং কল্পনাতীত পরিমাণ শক্তি সঞ্চারণ আবিষ্কার করেন। প্রাপ্ত শক্তি ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে প্রয়োগের জন্য রসায়নবিদ ও পদার্থবিদদের যৌথ প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রে পরমাণু বোমা তৈরী করা হয় এবং দ্বিতীর মহাযুদ্ধে জাপান যখন পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে, সেই সময় ১৯৪৫ সালে আগষ্ট মাসে হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে এই বোমা নিক্ষেপ করে কয়েক ঘন্টার মধ্যে লক্ষাধিক সাধারণ নাগরিক-কে হত্যা করা হয়। এই বোমাদ্বয়ের বিস্ফোরণে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব ৭০ বৎসর পর এখনও পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে লক্ষণীয় রয়েছে।

নিউকিয়ার শক্তি ও মানব সভ্যতাঃ (বাম থেকে) ১৯৪৫ সালে হিরোশিমাতে নিউকিয়ার বোমা নিক্ষেপ; বোমার আঘাতে ভস্মীভুত নগরী; নিউকিয়ার চুল্লি ব্যবহার করে জার্মানির একটি আধুনিক কারখানায় বিদ্যুৎ উৎপাদন।

পরবর্তীতে আইনস্টাইন, পাউলিং প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্ঠায় ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে পরমাণু বিভাজন-এর প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য গবেষণা উৎসাহিত করা হয়। নিউক্লিয় রসায়ন নামে রসায়নে একটি নতুন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিদ্যুৎ শক্তির মোট চাহিদার একটি বড় অংশ এখনও নিউক্লিয়ার চুল্লিতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দ্বারা মেটানো হচ্ছে। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে ২৪টি তেজস্ক্রিয় মৌল তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে, যে গুলো নানাবিধ বিশ্লেষণ কৌশল এবং রোগ সনাক্তসহ চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীতে আরো একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন হচ্ছে কৃত্রিম পলিমার। রসায়নের উন্নয়নের সাথে পলিমার রসায়নের উন্নয়নও ঘটে এবং বিশেষ চিহ্নিত ধর্ম বিশিষ্ট পলিমার তৈরী করা রসায়ন বিজ্ঞান সম্ভব করেছে। বিগত শতকগুলোতে পলিমার কম্পোজিট যেমন জৈব পলিমার-এর গাঠনিক কাঠামোতে অন্য ধরণের উপাদান যথা সিলিকা, ধাতব অক্সাইড এবং কাবন ন্যানো-টিউব, গ্রাফিনসহ বিভিন্ন যৌগ সংস্থাপন করে অভিনব ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ তৈরা করা হচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী অগণিত জিনিস এই ধরনের পলিমার কম্পোজিট ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম এবং আণবিক গঠন নির্ধারণের জন্য আণবিক বর্ণালী বিদ্যার উন্নয়ন ঘটে। বস্তু দ্বারা শোষিত বিভিন্ন ধরণের আলোক রশ্মির শোষণ পরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য থেকে বস্তুর অণুসমূহের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা হয়। এই সময়ে ১৯৬০ সালে লেজার আবিষ্কার রসায়ন চর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। উচ্চ তীব্রতা ও অতি সংকীর্ণ তরঙ্গ ব্যান্ড-এর আলোক রশ্মি হচ্ছে লেজার রশ্মি। এই রশ্মি ব্যবহার রামান বর্ণালী যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করে এবং বর্ণালীবিদ্যা ভিত্তিক অনেকগুলো বিশ্লেষণ কৌশল-এর সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে। লেজার ভিত্তিক এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে অতি দ্রুত সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার (অর্ধায়ু $<$ lms) গতি পরিমাপ সম্ভব হয়। এই ধরণের দ্রুত বিক্রিয়া সাধারণত মৌলিক ধাপ এবং এই গুলোর গতি পরিমাপ সাধারণ বিক্রিয়ার বিক্রিয়া কৌশল উদঘাটনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে মৌলিক বিক্রিয়ার গতি পরিমাপ দহন, অগ্নিশিখা, বায়ুদূষণ, আবহাওয়া পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানে সমর্থ হয়। মৌলিক বিক্রিয়ার গতির উপর গবেষণা স্ট্র্যাটোমন্ডলে ওজোন বিলুপ্তির ক্রিয়াকৌশল উদঘাটন করতে সমর্থ হয়েছে। ষাট-এর দশক-এর শেষের দিকে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন যে স্ট্র্যাটোমণ্ডলে ওজোন ঘনমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। বিজ্ঞানীরা ওজোন-স্তর তৈরীর রসায়ন ইতোপূর্বেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অতি বেগুনী রশ্মি দ্বারা অক্সিজেন অণুর বিভাজন যে অক্সিজেন পরমাণু উৎপন্ন করে, সেটি একটি অক্সিজেন অণু এবং অন্য যেকোন একটি অণুর সাথে একক সংঘর্ষে ওজোন উৎপন্ন করে। আবার ওজোন অণু শুধু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে দুটি অক্সিজেন অণু উৎপন্ন করে। এই গঠন বিভাজন প্রক্রিয়ার মধ্যে সাম্যাবস্থা স্ট্র্যাটোমন্ডলে একটি স্থির ওজোন ঘনমাত্রা বজায় রাখে। বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে ক্লোরিন পরমাণুর উপস্থিতি বিভাজন বিক্রিয়াটির গতিবৃদ্ধি পায় যার ফলে সাম্যাবস্থায় ওজোন ঘনমাত্রা হ্রাস পায়। স্ট্র্যাটোমন্ডলে ক্লোরিন পরমাণু কোথা থেকে আসতে পারে তার সন্ধান চলল।

১৯৩২ সালে ফ্রিয়ন (CF_2Cl_2) যৌগটি আবিষ্কৃত হয় এবং এটি জুল-থমসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শীতলীকরণ যন্ত্রের অত্যন্ত কার্যকর গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত হয়। এটি গন্ধবিহীন একটি নিষ্ক্রিয় যৌগ যা একটি সম্মেলনে নিঃশ্বাসের সাথে নিয়ে প্রশ্বাসের সাথে বের করে মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে প্রস্তুতকারক বিজ্ঞানী এই যৌগের নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন। শীতলীকরণ যন্ত্রে ইতোপূর্বে ব্যবহৃত ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও ক্ষতিকারক সালফারডাই অক্সাইড ও অ্যামেনিয়া বাজার থেকে সরে গেল এবং ফ্রিয়ন যৌগটি তাদের স্থান দখল করল। কিন্তু যখন বিজ্ঞানী জেমস লাভলক ১৯৭৪ সালে তাঁর নবনির্মিত ইলেকট্রন ক্যাপচার ডিটেকটর দ্বারা আটলান্টিক মহাসাগরের বায়ু মন্ডলে এই যৌগটির উপস্থিতি চিহ্নিত করলেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে গেলেন। যৌগটি কী এতই নিষ্ক্রিয় যে জন অধ্যুষিত এলাকা থেকে এতদূরে চলে যেতে পারে? আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরভাইন ক্যাম্পাসের শেরউড রওল্যান্ড এবং সান-ডিয়েগো ক্যাম্পাসের মারিও মলিনা এই সময় অতি সাহসী এবং যুগান্তকারী একটি ধারণা প্রদান করলেন যে বিধায় ফ্রিয়ন অণু যদি জন অধ্যুষিত এলাকা থেকে হাজার কিঃমিঃ দূরে আটলান্টিক সাগরের উপর পযন্ত পৌছাতে পারে, তবে এটি ১৫ কিঃমিঃ উচ্চতার স্ট্র্যাটোমন্ডলেও যেতে পারে, যেখানে অতিবেগুনী রশ্মি রয়েছে। ফ্রিয়ন স্ট্র্যাটোমন্ডলে পৌছে অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে বিভাজিত হয়ে ক্লোরিন পরমাণু উৎপন্ন করে এবং ওজনের বিলুপ্তি ঘটায়। ডাচ বিজ্ঞানী পল ক্রুটসেন কম্পিউটার মডেলে গণনা করে দেখালেন যে ফ্রিয়ন এর ব্যবহার চলতে থাকলে ৪০ কিঃমিঃ উচ্চতায় ৪০% পর্যন্ত ওজোন বিলুপ্তি ঘটতে পারে। বিজ্ঞানীরা ফ্রিয়ন ব্যবহার-এর ভীতিসূচক পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী প্রদান করলেন এবং এর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং বন্ধ রাখার পরামর্শ দিলেন। ফ্রিয়ন উৎপাদনকারী শিল্পপতিরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ডু-পন্ট কোম্পানীর বোর্ড চেয়ারম্যান ওজোন অবক্ষয় তত্ত্বকে এক গাদা আবর্জনা বলে আখ্যায়িত করলেন। প্রিসিশন ভালভ কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট ক্যালিফোনিয়া আরভাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর-এর নিকট রওল্যান্ড-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে স্ট্র্যাটোমন্ডলে প্রত্যেক বৎসর বসন্তের আবির্ভাব থেকে কয়েকমাস অবধি অস্বাভাবিক ওজোন অবক্ষয় প্রমাণিত হলো। পরবর্তীতে গবেষণাগারে সম্পাদিত বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে এবং ফিল্ড পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে "ওজোন গর্ত" নামে অভিহিত এই প্রভাবের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সম্ভব হলো। এই ব্যাখ্যাটি ওজোন অবক্ষয়ে ফ্রিয়ন-এর ভূমিকা প্রমান করেছে। বিশ্বের নীতি নির্ধারকগণ এবং বিজ্ঞানীবৃন্দ ১৯৮৭ সালে ক্যানাডার মন্ট্রিয়ো-তে এক সম্মেলনে একমত হলেন যে ফ্রিয়ন স্ট্র্যাটোমন্ডলে ওজোন অবক্ষয়ের কারণ এবং এই পৃথিবীকে এই অবক্ষয়ের ভীতিপ্রদ ফলাফল থেকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। সম্মেলনের ঘোষণা "মন্ট্রিয়ো প্রটোকল ১৯৮৭" নামে অভিহিত। এই ঘোষণা অনুযায়ী ধাপে ধাপে ফ্রিয়ন এর ব্যবহার কমিয়ে আনার এবং পরিশেষে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ঘোষণার কার্যকারিতার ফলে ইতোমধ্যে স্ট্র্যাটোমন্ডলে ওজোন ঘনমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্বের মান অর্জিত হচ্ছে। এখন বিজ্ঞানীরা বলেন যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরো ২-বৎসর বিলম্ব হলে স্ট্র্যাটোমন্ডলে ওজোন অবক্ষয় এমন এক পর্যায়ে পৌছাত যে এর ফলে এই পৃথিবী এক মহাবিপদের সম্মুখীন হতো।

বিজ্ঞান জগতে বিংশ শতাব্দীর আর একটি বড় উন্নয়ন হল অর্ধপরিবাহী পদার্থের আবিষ্কার ও প্রয়োগ। সিলিকন, জার্মেনিয়াম-সহ কিছু মৌলের এবং কিছু ধাতব অক্সাইডের অর্ধপরিবাহিতা রসায়নবিদ ও পদার্থবিদদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এগুলোর কেলাস-কাঠামোতে বিশেষ মৌলের পরমাণু প্রতিস্থাপন করে তাদের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল উদ্ভাবিত হয়। রসায়নবিদরা এই সব কেলাসের বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। রঞ্জনরশ্মির ডিফ্র্যাকশন পরিমাপ করে কেলাসের মধ্যে পরমাণু বিন্যাস উদঘাটনের পদ্ধতিও প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে দুই রকম অর্ধ-পরিবাহী বস্তুর সংযোগ স্থলে বিদ্যুৎ-বহনকারী ইলেকট্রনের আচরণ-কে কাজে লাগিয়ে ট্রানজিস্টার নামক যন্ত্রাংশ উদ্ভাবন করা হয়, যার সাহায্যে মূলত বিদ্যুৎ-বিভব পরিবর্দ্ধন সম্ভব হয়। ট্রানজিস্টার-এর আর্বিভাব বিদ্যুৎ-ভিত্তিক যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও নির্মাণে এক বিপ্লবের সূচনা করে। পরবর্তীতে একটি সিলিকন কেলাসের কাঠামোতে বিশেষ ডিজাইন অনুযায়ী ভিন্ন পরমাণু সংস্থাপন করে বহুসংখ্যক ট্রানজিস্টার সম্বলিত ইলেকট্রনিক সার্কিট বা ইনটিগ্রেইটেড সার্কিট (IC) নির্মাণের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে ফটো-লিথোগ্রাফির সাহায্যে ১-বর্গ সেঃমিঃ সাইজের IC-তে শতকোটি ট্রানজিস্টার স্থাপন করা সম্ভব। IC-এর উদ্ভাবন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। রসায়ন চর্চায় ব্যবহৃত প্রায় সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্মানে IC ব্যবহৃত হয়।

মানবসভ্যতার জন্য রসায়ন শাস্ত্রের একটি বড় উপহার হলো কৃত্রিম পলিমার। ষ্টার্চ, প্রোটিন, রাবার এই সব প্রাকৃতিক পলিমার অতি পরিচিত' বস্তু। বিগত শতাব্দীতে এগুলোর গঠন ও ধর্ম, বিশেষ করে মৌলের ভর এবং পলিমার অণুতে মনোমার সংখ্যা, নির্ণয় ইত্যাদি সম্ভব হয়। রসায়নবিদরা বিপুল সংখ্যক কৃত্রিম পলিমার তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। এগুলো এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথী। পলিথিন (ইথিলিন-এর পলিমার), PET বোতল (পলি টেট্রাফ্লুরোইথেন), পি.ভি.সি. (পলি ভিনাইল ক্লোরাইড), বেকেলাইট, (ফেনল-ফরমাল ডিইইড রেজিন), টেফলন (পলি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন), এবং নাইলন (পলি-অ্যামাইড) কয়েকটি মাত্র উদাহরণ। পলিমারকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে এর কাঠামোতে অন্য বস্তু যেমন কার্বন ফাইবার, ধাতব অক্সাইড ইত্যাদি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। কার্বন-চেইন বিশিষ্ট পলিমার থেকে ফাইবার তৈরী করে নিয়ন্ত্রিত দহনের মাধ্যমে অন্যান্য মৌলসমূহ অপসারণ করে কেবল কার্বন-পরমাণুর শিকল বা কার্বন ফাইবার উৎপন্ন করা হয়। এই কার্বন ফাইবার আরেকটি পলিমার-এর সাথে মিশিয়ে কার্বন-ফাইবার কম্পোজিট পলিমার তৈরী করা হয়। এটি ওজনে হালকা অথচ ইস্পাতের চাইতেও অধিক মজবুত। বোয়িং ৭৮৭ উড়োজাহাজটির মূল কাঠামো এই ধরনের বস্তু দিয়ে তৈরী। আধুনিক টেনিস র‍্যাকেটের ফ্রেইম কার্বন-ফাইবার কম্পোজিট পলিমার দিয়ে তৈরী করা হয়।

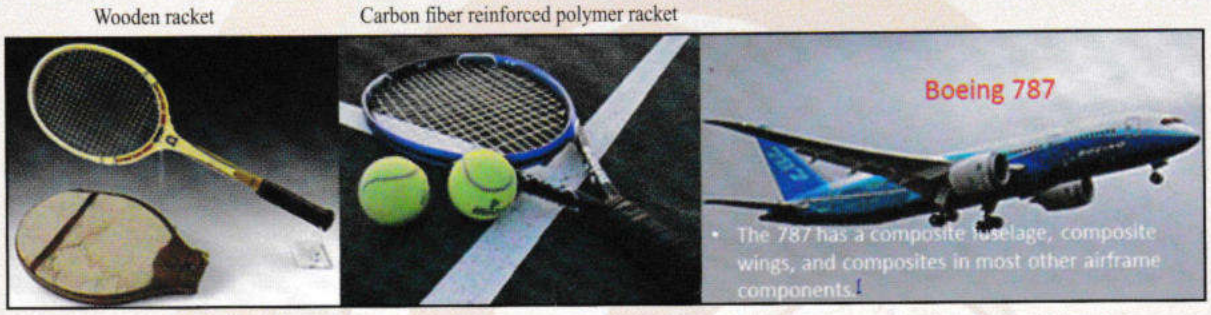

ন্যানো-টেকনোলজি ও রসায়নবিদ্যা ঃ

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ন্যানো-টেকনোলজি বা ন্যানো-প্রকৌশল নামে একটি নতুন প্রকৌশল-এর আবির্ভাব ঘটে। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা এক রাশি অণু বা পরমাণু একত্র হয়ে যে কঠিন কেলাস তৈরী করে, তার গঠন, আকৃতি এবং ধর্ম চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিল। আরো দেখা যায় যে এই ধরনের বহু-কেলাসীয় (poly-crystalline) বস্তুর ধর্ম তার প্রস্তুতিকরণে ব্যবহৃত পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। কঠিন পদার্থের গাঠনিক কণাসমূহের অবস্থান প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য নতুন ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। সাধারণ আলোক রশ্মির পরিবর্তে ইলেকট্রন রশ্মি ব্যবহার করে লক্ষ বস্তু দ্বারা এই রশ্মির বিচ্ছুরণ পরীক্ষা করে বস্তুর উপরিতলের প্রতিচ্ছবি তৈরী করা হয়, যেটি বস্তুর মধ্যে কণাসমূহের আকার ও আকৃতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ক্যাম্ব্রিজ ইনস্ট্রুমেন্ট কোম্পানী বাণিজ্যিকভাবে স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র উৎপাদন আরম্ভ করে। ১৯৮১ সালে জুরিখের IBM কোম্পানীর বিজ্ঞানী গের্ড বিন্নিগ এবং হাইনরিশ রোহবার স্ক্যানিং টানেলিং অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে কঠিন পদার্থের উপরিতলে পরমাণুর বিন্যাস সরাসরি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। একটি ধাতব সুক্ষ্ম সূচাগ্র থেকে কঠিন পদার্থের উপরিতলের পরমাণুতে সরাসরি স্পর্শ ছাড়া ইলেকট্রন প্রবাহ (electron tunneling) এর উপর ভিত্তি করেই এই যন্ত্র তৈরী করা হয়। এই সময়ে অতি পাতলা কঠিন পাতের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহ প্রয়োগ করে Transmission Electron Microscope (সংক্ষেপে TEM) উদ্ভাবিত হয়। এই সব অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ন্যানোমিটার (10^{-9} মিটার) আকৃতির কঠিন কণার উপস্থিতি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

বহু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রভাবক হিসেবে কঠিন পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এদের সক্রিয়তা তাদের উপরিতল ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল। এই জন্য রসায়নবিদরা প্রভাবক উৎপাদনে কণার আকৃতি ছোট রাখার কৌশল সন্ধান করেন। তারা লক্ষ্য করলেণ যে কণার আকার ছোট করা হলে (কোন এক দিকে ১০০nm-এর কম) তাদের ধর্মে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এর মূল কারণ হিসেবে কেলাসের ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ ইলেকট্রনসমূহের শক্তি স্তর পরিবর্তন-কে চিহ্নিত করা হয়। কোয়ান্টাম প্রভাবের ফলে ধর্মে নতুনত্ব উৎপন্ন হয় বিধায় এই ধরনের কেলাস-কে "কোয়ান্টাম ডট" (QD) বলা হয়। লক্ষণীয় এই যে সাধারন আকারের কেলাসে কোন ধর্মই আকারের উপর নির্ভরশীল নয়, তবে ন্যানো-কেলাস বা কোয়ান্টাম ডট-এ এই ধর্মাবলী কেলাসের আকারের উপর নির্ভরশীল। প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করে রসায়নবিদরা এই ধরণের ন্যানো-কেলাস-এর আকার নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ন্যানো-কেলাস বা কোয়ন্টাম ডট-এর অপটো-ইলেকট্রিক ধর্মের উপর ভিত্তি করে বিবিধ যন্ত্রাংশ (devices) তৈরী করা হচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে ট্রানজিস্টার সৌর কোষ, LEDs, diode laser ইত্যাদি। কম্পিউটার জগতের "কোয়ন্টাম কমপিউটিং" বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত দিচ্ছে, তাতেও কোয়ন্টাম ডট বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ধাতব এবং ধাতব অক্সাইড ও সিলিকা-কে তাদের বিশেষ মেক্যানিক্যাল, ইলেকট্রনিক, ম্যাগনেটিক ও রাসায়নিক ধর্মের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। সিলভার ন্যানো-কেলাস তার ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস-ক্ষমতার প্রেক্ষিতে রোগ চিকিৎসায় ব্যবহার হচ্ছে।

ন্যানো-কেলাস-এর নানা ধর্মের উপর ভিত্তি করে এর নানাবিধ ব্যবহার ও প্রযুক্তিতে প্রয়োগের সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে "ন্যানো-টেকনলজি" নামে অভিহিত বিজ্ঞানের একটি শাখা স্বীকৃতি লাভ করে। রসায়নবিদ, পদার্থবিদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসাবিদসহ বিজ্ঞানীরা ন্যানো-টেকনোলজির বিবর্তণ ও নতুন নতুন প্রয়োগের উপর গবেষণা করে চলেছেন।

বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ১৯৮৫ সালে কার্বন মৌলের নতুন রূপ (অ্যালোট্রোপ) "ফুলারিন" (fullerene) আবিষ্কৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ হ্যারল্ড ক্রটো দীর্ঘকাল কার্বন-অণুর সন্ধানে গবেষণারত ছিলেন। ১৯৮৫ সালে তিনি যুক্তরাষ্টের হিউস্টনে রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ে রিচার্ড স্মলী ও রবার্ট কার্লের সাথে গবেষণা করেন। লেজার রশ্মি দ্বারা গ্রাফাইটকে বাস্পীভূত করে প্রাপ্ত ঘনীভূত পদার্থের ভর-বর্ণালী পরিমাপ করে তারা ঐ বস্তুতে C_{60} অণুর উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন। এই ফরমুলা বিশিষ্ট একটি অণুর সম্ভাবনা ও গোলকাকৃতি গঠন সম্পর্কে ধারণা বিভিন্ন বিজ্ঞানী ইতোপূর্বে প্রদান করেছিলেন। ক্রটো ঐ বস্তু থেকে টলুইনে দ্রবীভূত হয় এরকম একটি যৌগ পৃথক করতে সমর্থ হলেন। পরবর্তীতে ৬০-টি কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট অণুটির গোলকাকৃতি গঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় নিখুঁত গোলক হওয়ায় বস্তুটির বিশেষ গুণাগুণ রয়েছে। অণুটি একেবারে নিষ্ক্রিয় নয় এবং এই অণুর সাথে পরমাণুগুচ্ছ যুক্ত করে অনেকগুলো যৌগ তৈরী করা হয়েছে। স্থাপত্যবিদ বাকমিনস্টার ফুলার কর্তৃক প্রণীত ক্যানাডার মনট্রিও শহরে নির্মিত বায়ো-গোলক-এর আকৃতির সাথে মিল রয়েছে বিধায় C_{60} অণুকে "বাকমিনস্টার ফুলেরিন" বা শুধু "ফুলেরিন" বলা হয়। কার্বনের পরিচিত কেলাসরূপ হীরক ও গ্রাফাইট-এর জন্য কোন দ্রাবক নেই। এই নতুন আবিষ্কৃত কেলাসরূপের জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়ে রঙিন তরল উৎপাদন করা বিজ্ঞান জগতকে চমকিত করে।

কার্বন ন্যানোটিউব ও গ্রাফিনঃ

কার্বন ন্যানোটিউব কার্বনের আরো একটি অ্যালোট্রোপ। কার্বন পরমাণুর এক পরমাণু পুরুত্ব বিশিষ্ট ষড়ভুজ রিং দ্বারা গঠিত স্তর-কে গ্রাফিন বলা হয়। এই গ্রাফিন স্তর দ্বারা গঠিত সিলিন্ডার আকৃতির যৌগকে কার্বন ন্যানোটিউব বলা হয়। এই ন্যানোটিউব অসাধারণ মজবুত এবং শক্ত যার ফলে বহুশত কোটি দৈর্ঘ ও ব্যাস এর অনুপাত বিশিষ্ট নানোটিউবও তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এই অনুপাতের উপর ন্যানোটিউবের ইলেকট্রনিক ধর্ম নির্ভর করে। একক-কেন্দ্রিক একাধিক ওয়ালবিশিষ্ট ন্যানোটিউবও তৈরী করা যায়। সিলিন্ডারের ব্যাস সাধারনত 1nm-এর থেকে কয়েক nmপর্যন্ত হয়ে থাকে।

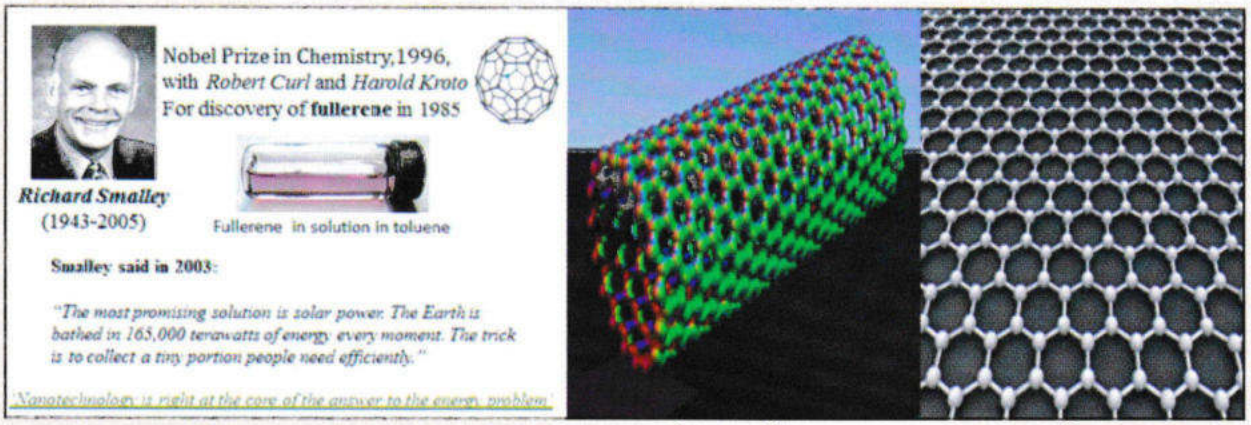

কার্বন ন্যানোটিউব গ্রাফিন

গ্রাফিন দীর্ঘকালে যাবত একটি পরিচিত পদার্থ হলেও পৃথকভাবে এর প্রস্তুতিকরণের একটি সহজ পদ্ধতি উদ্বাবন করেন ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশ বংশোদ্ভুত দুজন পদার্থবিদ আন্দ্রে গাইম এবং কনস্টান্টিন নভোসেলভ ২০০৪ সালে। এই উদ্ভাবন-এর জন্য তাঁরা ২০১০ সালের পদার্থ বিষয়ে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। তারা স্কচ-টেইপ-এর সাহায্যে গ্রাফাইটর উপরিতল থেকে একটি কেলাসীয় পরমাণবিক স্তর টেনে উঠিয়ে একটি সিলিকা পাত-এর উপর স্থাপন করতে সক্ষম হন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে X-ray imaging এবং Magnetic Resonance Imaging (MRI)- Gcontrast agent হিসেবে ফুলেরিন ব্যবহার করা হয়। বিশেষ রাসায়নিক সক্রিয়তা প্রয়োগের মাধ্যমে ক্যান্সার গবেষণায়ও ফুলেরিন বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

গ্রাফিন একটি স্বচ্ছ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী বস্তু। এটি ইস্পাতের চেয়ে ২০০ গুণ মজবুত। বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে, যেমন সৌর-কোষ, স্পর্শ-প্যানেল, LEDs, Smart Phones ইত্যাদি যন্ত্রে এর ব্যবহারের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।। এর অসাধারণ আলোক-শোষণ ক্ষমতা (আপতিত রশ্মির ৯৫%) ব্যবহার করে জলাধারে দূষিত পদার্থ ধ্বংস-করণে ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া হাইড্রজেন উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সৌর ইলেক্ট্রো-বিশ্লেষণ কোষ-এ কার্যকর ইলেকট্রোড হিসেবে প্রয়োগেরও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানী উদ্ভাবনে রসায়ন ঃ

জীবাশ্ম জ্বালানীর দহন থেকে তাপশক্তি লাভ করার পদ্ধতির উন্নয়নে রসায়ন গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পেট্রোলিয়াম পরিশোধন-এর জন্য আংশিক পাতন পদ্ধতিসহ "ক্যাটালাইটিক ক্র্যাকিং" ও "ক্যাটালাইটিক রিফরমিং" পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস-এর দহন-প্রক্রিয়ায় ক্যাটালাইটিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। কয়লা থেকে তরল জ্বালানী প্রস্তুত করার জন্য কয়লা তরলীকরণ পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ষাট-এর দশকে লক্ষ্য করা হলো যে জীবাশ্ম জ্বালানী দহনের সময় CO, NOx এবং SO_2-এর নিঃসরণের ফলে বায়ুমন্ডল দূষিত হয়। এই দূষকসমূহ বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অত্যন্ত ক্ষতিকারক ওজোন ও পার-অক্সিএসিটাইল নাইট্রেট (PAN)- এ পরিণত হয়। বড় বড় নগরীর বাতাসে বিশেষ জলবায়ু পরিস্থিতিতে এই দূষকসমূহের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে মারাত্মক "স্মগ" (Smog) সৃষ্টি হত। রসায়নবিদরা মোটরযানে ব্যবহারের জন্য "ক্যাটালাইটিক কনভার্টার" উদ্ভাবন করেন। মোটর যানে এই ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ব্যবহারের ফলে বড় বড় নগরী যেমন লস এঞ্জেলস, লন্ডন, হামবুর্গ, টোকিও ইত্যাদি শহরকে "স্মগ" (Smog) থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

কল-কারখানায় জীবাশ্ম-জ্বালানী ব্যবহার করা হলে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষে এই ধরণের কনভার্টার ব্যবহার সকল দেশেই বর্তমানে বাধ্যতামূলক।

সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদন ঃ সোলার বিদ্যুৎ-কোষ

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে p-type ও n-type অর্ধপরিবাহী বস্তুর সংযোগ ব্যবহার করে সোলার PV-কোষ (photo Voltaic Cell, PVC) উদ্ভাবন করা হয়। অতি বিশুদ্ধ সিলিকন কেলাসে অতি অল্প পরিমাণ আর্সেনিক ও ফসফরাস প্রতিস্থাপন করে যথাক্রমে p-ও n-type অর্ধপরিবাহী তৈরী করা হয়। যে সব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের জন্য বিকল্প পদ্ধতি নেই, যেমন মহাকাশযানে, সেখানে এই ধরণের বিদ্যুৎ-কোষ ব্যবহার করা হয়। ১৯৭৩ সালে পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশগুলোর কর্তৃত্বের ফলে বিশ্ববাজারে হঠাৎ পেট্রোলিয়ামের মূল্যবৃদ্ধি অন্য দেশগুলোকে, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোকে, ভূগর্ভে সঞ্চিত জীবাশ্ম জ্বালানীর সীমিত পরিমাণ সম্পর্কে সজাগ করে। এর অব্যবহিত পরে আবহাওয়াবিদরা লক্ষ্য করলেন যে বায়ুমন্ডলে CO_2 ঘনমাত্রার বৃদ্ধি উদ্বেগজনক হয়ে পড়ছে, এর ফলে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরবর্তী দশকগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অতিবৃষ্টি, খরা, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুযোগ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী ঘটছে বলে প্রতীয়মান হয়। মডেল গণনার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা বায়ুমন্ডলে CO_2 ঘনমাত্রা বৃদ্ধির ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হিসাব করেন এবং এই সতর্কবাণী প্রদান করেন যে জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা এমন পর্যায়ে পৌছাবে যে উত্তর মেরুর বরফ গলে মহাসাগরের পানি-লেভেল বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ, হল্যান্ড-সহ বিশ্বের অনেক দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডুবে যাবে। অসংখ্য লোক গৃহহারা হবে এবং আবাদী জমি অনাবাদী হয়ে যাবে। এক নতুন উদ্ভ্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে এই প্রভাব পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছে। ঢাকা শহরের রাজপথে সম্প্রতি যে সব বস্তি গড়ে উঠেছে, সেই বস্তিবাসীদের অধিকাংশই জলবায়ু-উদ্বাস্তু।

জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের এই ভয়াবহ পরিণতি উপলব্ধি করে ১৯৮৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে জাতিসংঘ কর্তৃক গঠিত কমিটি মিলিত হয়ে CO_2 বা সংক্ষেপে কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষে একটি চুক্তিনামা Kyoto Protocol প্রণয়ন করেন। এ পর্যন্ত বিশ্বের ১৯২টি দেশ এই চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেছে।

বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকেই জীবাশ্ম জ্বালানীর বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানী উদ্ভাবনের ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হয়। সৌরশক্তি ছাড়া বায়ুশক্তি, ঢেউ শক্তি, ভুগর্ভস্থ তাপশক্তি, এবং উদ্ভিদ জাতীয় বস্তু জীবাশ্ম জ্বালানীর বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। সৌরশক্তি ব্যবহার করে PV- কোষদ্বারা সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ইলেক্ট্রো-বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হাইড্রোজেন উৎপাদন এদুটি ক্ষেত্রে রসায়বিদরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বর্তমানে সোলার PV- কোষ সমন্বয়ে তৈরী সোলার প্যানেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সিলিকন-এর উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা হলে কিংবা বিকল্প বস্তু উদ্ভাবন করা সম্ভব হলে এবং এর ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে PV-সোলার প্যানেল দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্য জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্যের চাইতে কম হতে পারবে। সম্ভাবনাময় বস্তুর মধ্যে রয়েছে কলোয়ডীয় কোয়ান্টাম ডট যাদের আলোক শোষণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। ইন্ডিয়াম আর্সেনাইড ব্যবহার করে এ পর্য্যন্ত সূর্যালোকের ৪০% বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে।

সোলার আলো দ্বারা ইলেকট্রো-বিশ্লেষণ করে পানি থেকে হাইড্রোজেন উৎপাদন করার পদ্ধতি উদ্ভাবনেও অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এক্ষত্রে সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানী মাইকেল গ্র্যাটসেল এর অবদান বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহারযোগ্য এমন বস্তুর সন্ধান করছেন, যেটি অন্তত ২০ বৎসর কাল টিকে থাকবে এবং সোলার বর্ণালীর একটি বৃহত্তর ফ্রিকুয়েন্সী রেঞ্জে আলোক শোষণ করতে সমর্থ হবে।

২০১৫ সালে জাতিসংঘ প্রণীত ১৫টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে কার্বন নিংসরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিশ্বের উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধ এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানী (বিদ্যুৎ) সকল মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে আনা। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন এই দুটি লক্ষ্য অর্জনেই সহায়ক হবে এবং রসায়ন গবেষণা এই প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। ফুলেরিনের সহ-আবিষ্কারক এবং ১৯৯৬ সালের রসায়ন নোবেল পুরস্কারের অংশীদার রিচার্ড স্মলী ২০০৩ সালে বলেছেন যে ন্যানো-টেকনোলজি প্রয়োগ করে ২০৩০ সাল নাগাদ সমগ্র বিশ্বের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট বিদ্যুৎ সৌরশক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন করা সম্ভব হবে এবং উৎপাদন ব্যয় প্রচলিত জ্বালানী ব্যবহার করে উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্যের চাইতে কম হবে।

পরিচ্ছন্ন পানির জন্য রসায়নঃ

শিল্পের বর্জ্য এবং কারখানায় ব্যবহৃত পানির নির্গমন খাল, বিল নদী সমুদ্রসহ সকল জলাধারকেই দূষিত করে। ঢাকা শহরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর পানি বর্তমানে এতই দূষিত যে দূর্গন্ধযুক্ত এই পানি নগর কর্পোরেশনের পানি শোধনাগারে পরিশোধন করে সুপেয় পানি পাওয়া সম্ভব নয়। এই পানিকে দূষিত না বলে ময়লা পানি বলাই সঙ্গত। ঊনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে লন্ডনের টেমস নদীর পানির এই অবস্থা ছিল। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশসমূহে অনেক জলাধারের পানিই ময়লা পানি। সুপেয় পানি কেবলমাত্র পরিচ্ছন্ন পানি থেকেই পাওয়া সম্ভব। বর্তমানে কলকারখানায় ব্যবহারের জন্য পানি ও পরিচ্ছন্ন পানির পরিশোধনের মাধ্যমে তৈরী করা হয়।

জলাধারের পানি পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় হলো পার্শ্ববর্তী কলকারকানা বা গৃহস্থালীর বর্জ্য ও তরল বর্জ্যের জলাধারে প্রবেশ রোধ করা। কলকারখানার বর্জ্য তরলকে পরিশোধন করেই জলাধারে ঢালার আইনী বাধ্যবাধকতা কার্য্যকর রাখা একান্ত প্রয়োজন।

কলকারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের একাধিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে। এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে জলাধারের পানিকে দূষণ থেকে রক্ষণ করা সম্ভব। নিষ্কাশিত তরল বর্জ্যে উপস্থিত বিভিন্ন জৈব যৌগকে CO_2 ও পানিতে জারিত করার জন্য রসায়নবিদরা একাধিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। ধাতব অক্সাইড প্রভাবক এবং ধাতব অক্সাইড ফটো-প্রভাবক ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রে এই জারণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যায়। অণুজীব দ্বারা এবং ইলেক্ট্রো-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তৈরী সক্রিয় অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা জারণ প্রয়োগ করেও দূষক পদার্থ ধ্বংস করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

সুপেয় পানি প্রস্তুতির জন্য পরিচ্ছন্ন পানির মধ্যে দ্রবীভূত অনাকাঙ্খিত অজৈব লবন অপসারণের জন্য বিপরীতমুখী অভিস্রাবণ (reverse osmosis) এবং পরিশোধন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের জন্য অতিবেগুনী আলোক রশ্মি এবং ওজোন দ্বারা জারণ পদ্ধতিও ব্যবহার করা যায়। সিরামিক বস্তু দ্বারা পরিস্রাবণ প্রয়োগ করে ব্যাকটেরিয়া অপসারণ করা হয়।

বাংলাদেশে রসায়ন গবেষণা ও প্রয়োগ ঃ

বাংলাদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ও ফলিত রসায়ন বিভাগে এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান শিল্প গবেষণা পরিষদের রসায়ন গবেষণাগার সমূহে রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাট-এর দশকে রাসায়নিক দ্রব্যের সাথে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে পাট তন্তু থেকে বস্ত্রে ব্যবহারোপযোগী তন্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা হয়। এছাড়া পাট থেকে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারোপযোগী কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ উৎপাদনের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা হয়। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের যেমন মাছের মধ্যে ফরমালিন, শিশুখাদ্যে মেলামাইন, পানিতে আর্সেনিক চিহ্নিত করার ও পরিমাণ পরিমাপের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বর্তমানে কয়েকটি গবেষণাগারে ন্যানো-কণা বা কোয়ান্টাম ডট তৈরী করার উপর গবেষণা চলমান রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে মাইক্রো-ইমালশন ব্যবহার করে কোয়ান্টাম ডট তৈরীর জন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়া নতুন প্রয়োগের লক্ষে নতুন বস্তু উদ্ভাবন করার প্রচেষ্টা চলছে। মানব দেহের হাড় প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে ডিমের খোসা থেকে ক্যালসিয়াম হাইড্রোএপাটাইট প্রস্তুতির প্রচেষ্টা চলছে। বিজ্ঞান ও শিল্প পরিষদের ঢাকা গবেষণাগারে এ ধরনের বস্তু ব্যবহার করে ন্যানো-সার উদ্ভাবনের প্রচেষ্টাও চলছে।

সীমিত সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রসায়নবিদরা কার্যকর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রতি বছর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা-বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। গবেষণার জন্য সরকারী অনুদান বৃদ্ধি করা হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে রসায়ন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর নিয়ে কিছু কথা

প্রকৌশলী মো: আলী জুলকারনাইন
সাবেক চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তিকমিশন

রিঅ্যাক্টর বলতে কী বোঝায়, তা দিয়েই শুরু করা যাক। রিঅ্যাক্টর হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যেখানে নিয়ন্ত্রিতভাবে কোন রিঅ্যাকশন বা বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এখানে "নিয়ন্ত্রিতভাবে" বলতে বোঝানো হচ্ছে যে, সংঘটিত বিক্রিয়ার হার অর্থাৎ, প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো বিক্রিয়া ঘটবে তা, প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো বা কমানো যায়। বিভিন্ন ল্যাবোরেটরী এবং কল-কারখানায় আমরা নানা ধরণের রিঅ্যাক্টর ব্যবহৃত হতে দেখি। এদের মধ্যে কতগুলো বায়ো-রিঅ্যাক্টর, কতগুলো কেমিক্যাল রিঅ্যাক্টর, আবার কতগুলো নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর। তোমরা নিশ্চই ধরে ফেলেছ যে, বায়ো-রিঅ্যাক্টরগুলোতে কোন এক ধরণের বায়োলজীক্যাল রিঅ্যাকশন এবং কেমিক্যাল রিঅ্যাক্টরগুলোতে কোন এক ধরণের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন ঘটানো হচ্ছে। একইভাবে একটি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে কোন এক ধরণের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন ঘটানো হয়ে থাকে। এই নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনটি হতে পারে বিভিন্ন ধরণের যেমন, ফিউশন (fusion), ফিশন (fission), স্পলেশন (spallation), ইত্যাদি। এসব নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন সম্পর্কে জানার অগে একটি বিষয় নিয়ে কিছু বলা দরকার। বিষয়টি হচ্ছে কেমিক্যাল এবং নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনের মধ্যে পার্থক্য। তাপ উৎপাদন করে থাকে এমন দুইটি রিঅ্যাকশনের উদাহারণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা যাক। প্রথমে ধরি, কার্বন ও অক্সিজেনের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়া। আমরা জানি যে, একটি কার্বন পরমাণু দুইটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে এবং এই বিক্রিয়া হতে আমরা প্রায় ৪ ইভি (4 eV) শক্তি পেয়ে থাকি ($C + O_2 => CO_2 + 4\ eV$)। বোঝার সুবিধার্থে বলে রাখা ভাল যে $1\ eV = 1.9 \times 10^{-19}$ জুল এবং এক কেজি ভরের কোন বস্তুকে এক মিটার খাড়া ওপরে ওঠালে প্রায় ১০ জুল কাজ করা হয়। যা বলছিলাম, তাপ হিসেবে প্রকাশিত এই শক্তিকে আমরা প্রতিনিয়ত খাবার রান্নাসহ নানান কাজে ব্যবহার করে থাকি। আমরা জানি যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী পরমাণুগুলোর বাইরের দিকে অবস্থিত অরবিটগুলো পুনর্বিন্যস্ত হয়ে নতুন আকার ধারণ করে এবং এদের ইলেকট্রনগুলো নতুন অরবিটে অবস্থান গ্রহণ করে। নতুন অর্বিটে অবস্থিত ইলেকট্রনগুলোর মোট শক্তি যদি তাদের আগের মোট শক্তি থেকে কমে যায়, তবে সেই বিক্রিয়া হতে তাপ উৎপন্ন হয়। আর যদি নতুন অর্বিটে অবস্থিত ইলেকট্রনগুলোর মোট শক্তি বিক্রিয়ার আগের মোট শক্তি থেকে বেড়ে যায়, সে ক্ষেত্রে এই বিক্রিয়ার ফলে তাপ শোষিত হয়। একটা বিষয় বলে রাখা দরকার যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তাপ উৎপন্ন বা শোষিত যাই হোক না কেন, বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী পরমাণুগুলোর নিউক্লিয়াসসমূহ সম্পুর্ণ অপরিবর্তিত থেকে যায়। অর্থাৎ, মূল কথা এই যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী পরমাণুসমূহের ইলেকট্রনগুলোর বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে কিন্তু নিউক্লিয়াসে কোন পরিবর্তন ঘটে না।

এবার নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনের কথায় আসা যাক। প্রথমে ধরা যাক ফিউশন রিঅ্যাকশনের কথা। এটি এমন একটি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন বা বিক্রিয়া যা সংঘটিত হয় পরমাণুর নিউক্লিয়াসে। আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র, সূর্যে প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকা ফিউশন বিক্রিয়ার কথাই ধরা যাক। এই বিক্রিয়ার ফলে একই অথবা ভিন্ন ধরণের মৌলের একাধিক নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে নতুন ধরণের নিউক্লিয়াস অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন মৌল উৎপন্ন হয়। মহা বিশ্বের রন্ধনশালা হিসেবে পরিচিত অজস্র-কোটি নক্ষত্রে প্রতিনিয়ত এই ফিউশন বিক্রিয়া ঘটে চলেছে আর এর মাধ্যমে হিলিয়াম থেকে শুরু করে লোহা অবধি সকল মৌলিক পদার্থ তৈরী হচ্ছে। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায় যে, চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস (অর্থাৎ প্রোটন) ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হওয়ার সময় প্রায় ২৫ মিলিয়ন ইভি (25 MeV) শক্তি উৎপন্ন হয় (১ মেগা বা মিলিয়ন = ১০ লক্ষ)। বলে রাখা দরকার যে লোহার চেয়ে ভারী মৌলগুলো নক্ষত্রে তৈরী হয় না। এগুলো তৈরী হয় তখন, যখন একটি বিশাল নক্ষত্র (যা কিনা আমাদের সূর্য অপেক্ষা বেশ বড়) সুপারনোভা নামে খ্যাত মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিদীর্ণ হয়। এই বিস্ফোরণ থেকে উদ্ভূত প্রচন্ড শক্তি লোহা এবং এর আশে পাশের মৌলের নিউক্লিয়াসের মধ্যে ফিউশন বিক্রিয়া ঘটিয়ে টাংস্টেন, ইউরেনিয়াম, ইত্যাদির মত অত্যন্ত ভারী মৌল সৃষ্টি করে।

এখন ফিশন বিক্রিয়ার কথায় আসা যাক। ফিউশন বিক্রিয়ায় যা ঘটে ফিশন বিক্রিয়ায় ঘটে ঠিক তার উল্টোটা। ফিশন বিক্রিয়ার ফলে একটি অত্যন্ত ভারী মৌল যেমন, ইউরেনিয়াম (U) নিউক্লিয়াসকে একটি থারমাল নিউট্রন, অর্থাৎ ০.০২৫ eV শক্তির নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে তা ভেঙ্গে দুই বা ততোধিক অপেক্ষাকৃত হালকা মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত করা হয়। যে রিঅ্যাক্টরে এই ফিশন বিক্রিয়া সংঘটিত হয় তাই হচ্ছে আমার এ লেখার মূল বিষয়। তোমরা অনেকেই হয়ত জান যে একটি ফিশন রিঅ্যাক্টর বিগত প্রায় ৩০ বছর ধরে সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চালু আছে। ট্রিগা (TRIGA: Training, Research, Isotope, General Atomic) গবেষণা রিঅ্যাক্টর নামে পরিচিত এই রিঅ্যাক্টরটিকে অনেকে হয়ত ইতোমধ্যে দেখেও থাকতে পার। সাভারের যে রিঅ্যাক্টরের কথা বলছি তার থারমাল পাওয়ার বা তাপ উৎপাদন ক্ষমতা তিন মেগাওয়াট (১ মেগাওয়াট = ১০ লক্ষ ওয়াট এবং ১ ওয়াট = ১ জুল/সেকেন্ড)। উল্লেখ্য যে, এই রিঅ্যাক্টর কোন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে না। এটি আসলে একটি নিউট্রন সোর্স যা দিয়ে বিভিন্ন প্রকার আইসোটোপ উৎপাদনসহ নানাবিধ গবেষণা কাজ করা হয়।

রূপপুরের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আমরা যে দুইটি ফিশন রিঅ্যাক্টর বসাতে যাচ্ছি এবার তাদের কথায় আসা যাক। ধারণা করছি যে, তোমরা সবাই ইতোমধ্যে খবরের কাগজের মাধ্যমে রূপপুরের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিষয়টি জেনে গেছ। রূপপুরের রিঅ্যাক্টর দুইটির প্রতিটির থারমাল পাওয়ার হবে প্রায় ৩,৬০০ মেগাওয়াট। একটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রর প্রতিটি পাওয়ার ইউনিট (পাওয়ার ইউনিট বলতে রিঅ্যাক্টর, টারবাইন এবং জেনারেটর মিলে যে ইউনিট তাকে বোঝায়) যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তা সাধারণত ঐ ইনিটের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরটির থারমাল পাওয়ারের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। এ হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিটি পাওয়ার ইউনিট থেকে প্রায় ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। অর্থাৎ দুইটি পাওয়ার ইউনিট হতে মোট প্রায় ২,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

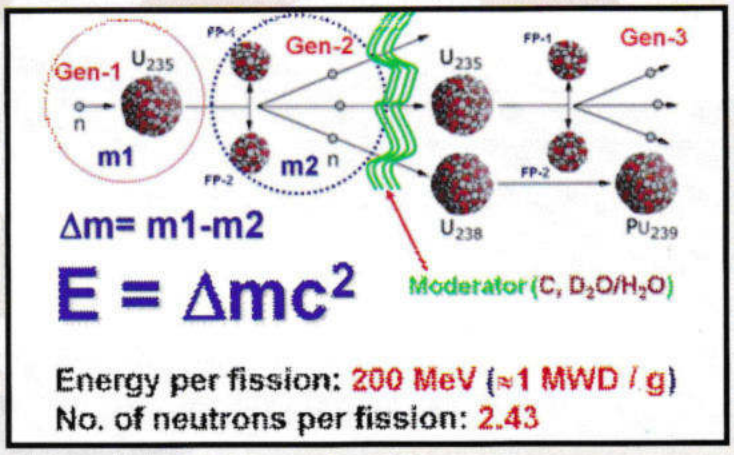

চিত্র:১ ফিশন বিক্রিয়া

এবার ইউরেনিয়ামে সংঘটিত ফিশন রিঅ্যাকশন নিয়ে আলোচনায় আসা যাক। আমরা জানি যে ইউরেনিয়াম একটি মৌলিক পদার্থ যা মূলত খনি হতে সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধাপে প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে রিঅ্যাক্টরে ব্যবহার উপযোগী জ্বালানীতে রূপান্তরিত করা হয়। খনি হতে প্রাপ্ত ইউরেনিয়ামে মূলত দুইটি আইসোটোপ, U-238 (৯৯.৩%) এবং U-235 (০.৭%) থাকে। বলে রাখা দরকার যে, পৃথিবীতে একই মৌলের ভর ভিন্ন হতে দেখা যায়। প্রোটন সংখ্যা সমান বলে এগুলো একই মৌল। কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন বলে এদের ভর ভিন্ন হয়। আমরা এদের আইসোটোপ বলে থাকি। U-238 এবং U-235 ইউরেনিয়ামে দুইটি আইসোটোপ। এদের দুটিতেই প্রোটন সংখ্যা ৯২, কিন্তু প্রথমটিতে নিউট্রন সংখ্যা ১৪৬ এবং দ্বিতীয়টিতে ১৪৩। এদের মধ্যে U-235, যার পরিমাণ মাত্র ০.৭%, সেটিই হচ্ছে আমাদের আলোচিত ফিশন রিঅ্যাক্টরের মূল জ্বালানী। কানাডায় তৈরী CANDU (CANadian Deuterium Uranium) নামে পরিচিত রিঅ্যাক্টরে ০.৭% U-235 আইসোটোপ সম্বলিত ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা গেলেও LWR (Light Water Reactor) নামে পরিচিত রিঅ্যাক্টরে (যেমন রূপপুরের রিঅ্যাক্টরে) ব্যবহারের জন্য U-235 আইসোটোপের পরিমাণ ০.৭% থেকে বাড়িয়ে ৩ থেকে ৫%-এ উন্নীত করতে হয়। U-235 আইসোটোপের পরিমান বাড়ানোর প্রক্রিয়াকে এনরিচমেন্ট (enrichment) বলা হয়। একটি U-235 নিউক্লিয়াস এবং একটি থারমাল নিউট্রনের মধ্যে সংঘটিত ফিশন বিক্রিয়া চিত্র-১ এ দেখান হলো। থারমাল নিউট্রনের মাধ্যমে সংঘটিত ফিশন বিক্রিয়াকে আমরা থারমাল ফিশন বলি। থারমাল নিউট্রন জিনিসটি কী তা একটু পরেই বিস্তারিতভাবে বলা হবে।

চিত্র-১ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ফিশন বিক্রিয়ার ফলে U-235 নিউক্লিয়াসটি ভেঙ্গে দুইটি ফিশন প্রোডাক্ট (FP-1 and FP-2) এবং তিনটি নিউট্রন উৎপন্ন হয়েছে। এখানে যে নিউট্রনগুলো উৎপন্ন হলো সেগুলো অতি উচ্চ শক্তির (গড় শক্তি প্রায় ২.১ MeV) এবং এগুলো ফাস্ট (fast) নিউট্রন নামে পরিচিত। ফাস্ট নিউট্রন U-235 নিউক্লিয়াসে ফিশন বিক্রিয়া ঘটাতে পারে না। ফিশনের জন্য প্রয়োজন হয় মাত্র ০.০২৫ eV শক্তির থারমাল নিউট্রনের। এ জন্যে ফিশন হতে প্রাপ্ত ফাস্ট নিউট্রনগুলোকে অপেক্ষাকৃত হাল্কা মৌল, যেমন হাইড্রোজেন, কার্বন, ইত্যাদির নিউক্লিয়াসের সাথে বার বার সংঘর্ষ ঘটানো হয়। প্রতিটি সংঘর্ষে কিছু কিছু শক্তি হারিয়ে ফাস্ট নিউট্রনগুলো একসময় ০.০২৫ eV শক্তির থারমাল নিউট্রনে রূপান্তরিত হয়ে U-235 নিউক্লিয়াসের সাথে ফিশন বিক্রিয়া ঘটিয়ে থাকে। যে সকল মৌল ব্যবহার করে ফাস্ট নিউট্রনকে থারমাল নিউট্রনে পরিণত করা হয় তাদেরকে মডারেটর বলা হয়। সাধারণ পানি (H_2O) অথবা ভারী পানির (D_2O) অণুতে বিদ্যমান হাইড্রোজেন মডারেটর হিবেবে ব্যবহৃত হয় বলে এসব পানি মডারেটর হিসেবে পরিচিত। বলে রাখা ভাল যে, আমাদের সাভারের রিঅ্যাক্টরে এবং রূপপুরে যে রিঅ্যাক্টর বসানো হবে সেগুলোর মডারেটর হচ্ছে সাধারণ পানি।

চিত্র-১ টি এবার ভাল করে দেখা যাক। এখানে বাম দিকের নীল বৃত্তের মধ্যে প্রথম জেনারেশনের (Gen-1) একটি থারমাল নিউট্রন এবং একটি U-235 নিউক্লিয়াস রয়েছে এবং এদের সম্মিলিত ভর দেখানো হয়েছে m1। পরের লাল রঙের বৃত্তের মধ্যে রয়েছে U-235 নিউক্লিয়াস ভেঙে সৃষ্ট ফিশন প্রোডাক্টসমূহ (FP-1 এবং FP-2) এবং তিনটি দ্বিতীয় জেনারেশনের (Gen-2) ফাস্ট নিউট্রন। এদের সম্মিলিত ভর দেখানো হয়েছে m2। এখানে m2 এর মান m1 অপেক্ষা কম। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, ফিশন বিক্রিয়ার ফলে কিছু ভর হারিয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ভর গেল কোথায়? আসলে যা ঘটেছে তা হচ্ছে, হারিয়ে যাওয়া ভর বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ, $E=mc^2$ অনুসরণ করে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে (এখানে, E: Energy বা শক্তি, m: mass বা ভর এবং c: আলোর বেগ)। আলোচিত ফিশন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই শক্তির পরিমাণ প্রায় ২০০ MeV অর্থাৎ ২০ কোটি ইভি। এখান থেকে হিসেব করে বের করা যায় যে, ১ গ্রাম U-235 এর সবকটি নিউক্লিয়াস ফিশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে ফেলা হলে প্রায় ১ MWD (Mega Watt Day) অর্থাৎ ২৪ MWh (MW hour) শক্তি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে এ পরিমাণ শক্তি পেতে হলে আমাদের প্রায় ২৬,০০,০০০ গ্রাম (২,৬০০ কেজি) কয়লা পোড়াতে হবে। তোমরা নিশ্চই লক্ষ্য করে থাকবে যে, U-235 নিউক্লিয়াস এবং থারমাল নিউট্রনের মধ্যে সংঘটিত একটি ফিশন বিক্রিয়া থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তার পরিমাণ কার্বন ও অক্সিজেনের মধ্যে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া হতে প্রায় পাঁচ কোটি গুণ বেশী।

এখন দৃষ্টি দেয়া যাক চিত্র-১ এর লাল বৃত্তে অবস্থিত তিনটি ফাস্ট নিউট্রনের দিকে। দেখা যাচ্ছে যে এদের একটি কোন রকম বিক্রিয়া না ঘটিয়ে সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটি U-238 নিউক্লিয়াসের সাথে বিক্রিয়া করে Pu-239 (Pu-প্লুটোনিয়াম) তৈরী করছে। আর শেষ নিউট্রনটি থারমাল নিউট্রনে পরিণত হয়ে U-235 নিউক্লিয়াসে ফিশন বিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। উল্লেখ করা দরকার যে, আলোচিত ফিশন বিক্রিয়া থেকে গড়ে প্রায় ২.৪৩ নিউট্রন পাওয়া যায় এবং ফিশন প্রোডাক্ট হিসেবে বিভিন্ন ভরের আশিটিরও অধিক ভিন্ন ভিন্ন মৌল উৎপন্ন হয়। কখনো কখনো আবার একটি ফিশন বিক্রিয়া থেকে তিনটি ফিশন প্রোডাক্ট বা মৌল পাওয়া যেতে পারে। এ ধরণের ফিশনকে টারনারী (ternary) ফিশন বলা হয়।

চিত্র-১ এ প্রদর্শিত নিউট্রন Gen-2 এবং Gen-3 এ সফল ফিশন বিক্রিয়া সংঘটনকারী নিউট্রনের সংখ্যা সমান হলে আমরা এটিকে ক্রিটিক্যাল সিস্টেম বলে থাকি। Gen-3 এর নিউট্রনের সংখ্যা কম হলে সিস্টেমটিকে বলা হয় সাব-ক্রিটিক্যাল সিস্টেম আর বেশী হলে বলা হয় সুপার ক্রিটিক্যাল সিস্টেম। একটি রিঅ্যাক্টর সিস্টেমকে চাহিদা অনুযায়ী সুপার ক্রিটিক্যাল, সাব ক্রিটিক্যাল অথবা ক্রিটিক্যাল করার জন্য কন্ট্রোল রড ব্যবহার করা হয়। কন্ট্রোল রডগুলো এমন মৌল (যেমন, ক্যাডমিয়াম, বোরন, গ্রাফাইট, ইত্যাদি) দিয়ে তৈরী যা বিপুল পরিমাণ থারমাল নিউট্রন শোষণ করতে পারে। ফলে একটি ক্রিটিক্যাল রিঅ্যাক্টরে কন্ট্রোল রড ঢুকিয়ে দিলে তা ব্যাপক হারে থারমাল নিউট্রন শুষে নেয় এবং এর ফলে রিঅ্যাক্টর সাব ক্রিটিক্যাল হয়ে এর পাওয়ার দ্রুত কমে যায়। ক্রিটিক্যাল অবস্থায় কন্ট্রোল রড অধিকতর উঠিয়ে ফেলে রিঅ্যাক্টরটি সুপার ক্রিটিক্যাল হয়ে পড়ে এবং এর ফলে রিঅ্যাক্টরের পাওয়ার ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

এবার খুব সংক্ষেপে পাওয়ার রিঅ্যাক্টর বিষয়ে বলা যাক। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে রিঅ্যাক্টরগুলো ব্যবহৃত হয় তাদের পাওয়ার রিঅ্যাক্টর বলা হয়। একটি পাওয়ার রিঅ্যাক্টরের মূল অংশগুলো চিত্র-২ এ দেখানো হলো।

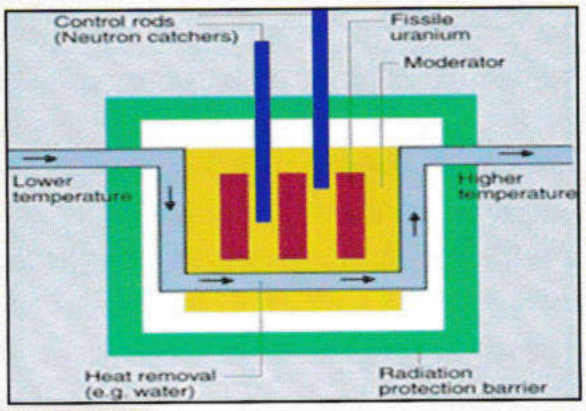

চিত্র:২ পাওয়ার রিঅ্যাক্টরের মূল অংশসমূহ

এখানে লাল রঙের দন্ডগুলো ৩ থেকে ৫% U-235 সম্বলিত জ্বালানী দন্ড। জ্বালানী দন্ডের বাকি ৯৭ থেকে ৯৫% হচ্ছে U-238 আইসোটোপ। নীল দন্ডগুলো কন্ট্রোল রড। এই রডগুলোর উঠানো নামানোর মাধ্যমে রিঅ্যাক্টরের পাওয়ার যথাক্রমে বাড়ানো বা কমানো যায়। বৈদ্যুতিক মোটর চালিত বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কন্ট্রোল রড উঠানো নামানোর কাজ করা হয়। বলে রাখা দরকার যে, একটি বড় রিঅ্যাকক্টরের পাওয়ার কন্ট্রোলের জন্য উপরোক্ত কন্ট্রোল রড ছাড়াও বোরিক এসিড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বোরিক এসিডের বোরন ব্যাপকভাবে থারমাল নিউট্রন শোষণ করে বিধায় রিঅ্যাক্টরের প্রথমিক শীতকে (অর্থাৎ, প্রাইমারী কুলিং লুপের পানিতে) এসিডের ঘনত্ব পরিবর্তন করে রিঅ্যাক্টরের পাওয়ার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

ছবিতে জ্বালানী দন্ড এবং কন্ট্রোল রড ঘিরে হলুদ রঙের যে অংশটি দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে মডারেটর। আমরা আগেই বলেছি যে, মডারেটরের কাজ হচ্ছে ফিশন বিক্রিয়া হতে প্রাপ্ত ফাস্ট নিউট্রনকে থারমাল নিউট্রনে পরিণত করা। সচল এবং এমন কি বন্ধ অবস্থায় একটি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ জমা হয়। এগুলো হতে বিচ্ছুরিত হতে থাকা রেডিয়েশন থেকে আশেপাশের জনগণ এবং সম্পদকে রক্ষা করার জন্য রিঅ্যাক্টরের চারপাশ ঘিরে বিভিন্ন পদার্থের পুরু বিকিরণ নিরোধ আস্তরণ বা রেডিয়েশন সিল্ডিং স্থাপন করা হয়। চিত্র-২ এ রিঅ্যাক্টরের চারপাশে ঘিরে থাকা সবুজ রঙের দেয়ালটিই হচ্ছে রেডিয়েশন সিল্ডিং। রিঅ্যাক্টরে চলমান ফিশন বিক্রিয়া হতে যে বিপুল পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় তা অপসারণ না করা হলে জ্বালানী দন্ড, কন্ট্রোল রড এবং রিঅ্যাক্টরের অন্যান্য স্ট্রাকচারাল মেটেরিয়ালের তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে এক সময় সেগুলো গলে গিয়ে অত্যন্ত বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরণের পরিস্থিতি যাতে না সৃষ্টি হয় সে লক্ষ্যে রিঅ্যাক্টরে উৎপন্ন তাপ সরিয়ে নেয়ার জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়। এই ব্যবস্থাটি কুলিং সিস্টেম বা শীতক ব্যবস্থা নামে পরিচিত। নীচের চিত্র-৩ এ একটি PWR বা Pressurized Water Reactor এর কুলিং সিস্টেম দেখানো হলো। এখানে উল্লেখ্য যে রাশান PWR রিঅ্যাক্টরগুলোকে VVER বলা হয় । রাশান ভাষায় পানিকে Vada বলা হয়। VVER-এর প্রথম V দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে এ রিঅ্যাক্টরের শীতক বা coolant হচ্ছে পানি। দ্বিতীয় V দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে এ রিঅ্যাক্টরে মডারেটর হিসেবেও পানি ব্যবহৃত হচ্ছে। শেষের ER এর অর্থ Energy Reactor। অর্থাৎ VVER এর অর্থ দাঁড়াল Water cooled and Water moderated Energy Reactor (WWER)।

বোঝার সুবিধার্থে চিত্র-৩ সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক। এখানে বাম দিকে ঘরের মত যে স্ট্রাকচারটি দেখা যাচ্ছে তাকে আমরা বলি কনটেইনমেন্ট বিল্ডিং। আমাদের রূপপুর প্লান্টের প্রতিটি রিঅ্যাক্টরকে ঘিরে পরপর দুইটি কনটেইনমেন্ট বিল্ডিং থাকবে। ভেতরের দিকেরটি প্রাইমারী কনটেইনমেন্ট এবং বাইরেরটি সেকেন্ডারী কনটেইনমেন্ট। কংক্রিটের তৈরী প্রাইমারী কনটেইনমেন্টের দেয়াল হবে ১.২ মিটার পুরু এবং এই দেয়ালের ভেতরের তল ঢাকা থাকবে ৬ মিলিমিটার পুরু লোহার আস্তরণ দিয়ে। প্রাইমারী কনটেইনমেন্ট থেকে প্রায় ২ মিটার দূরে থাকবে ০.৫ মিটার পুরু কংক্রিটের সেকেন্ডারী

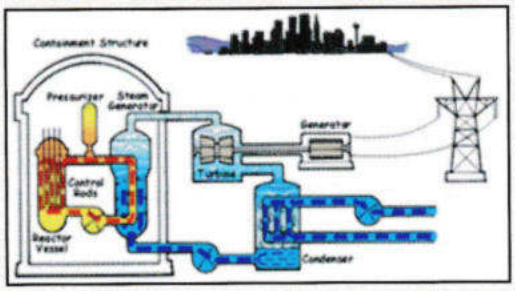

চিত্র-৩ : Pressurized Water Reactor (PWR) বা VVER-এর কুলিং সিসটেম/শীতল অবস্থা

কনটেইনমেন্ট। এটি এমনভাবে তৈরী করা হবে যে প্রায় ৫.৭ টন ওজনের একটি বিমান এটির উপর আছড়ে পড়লেও কনটেইনমেন্টের কোন ক্ষতি হবে না। এখানে বলা দরকার যে কনটেইনমেন্টের কাজ হচ্ছে কোন কারণে যদি রিঅ্যাক্টরের প্রাইমারী কুলিং সিস্টেম থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত হতে থাকে তবে তাকে বাইরে বেরুতে না দিয়ে কনটেইন বা ধারণ করা। কনটেইনমেন্টের ভেতরে লাল রঙের যে লুপটি দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে প্রাইমারী কুলিং লুপ। এই লুপের প্রধান অংশগুলো হচ্ছে রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল। এটি একটি লোহার পাত্র যার উচ্চতা প্রায় ১৫ মিটার, ব্যাস ৫ মিটার, দেয়ালের পুরুত্ব ২০ সেন্টিমিটার এবং ওজন প্রায় ৪০০ টন। ইউরেনিয়াম জ্বালানী, কন্ট্রোল রড এবং মডারেটর/শীতক ধারণকারী এই পাত্রটিই হচ্ছে মূল রিঅ্যাক্টর। প্রেসার ভেসেলের অভ্যন্তরের ইউরেনিয়াম জ্বালানী এবং কন্ট্রোল রড সজ্জিত অংশকে বলা হয় রিঅ্যাক্টর কোর। প্রাইমারী কুলিং লুপের অন্যান্য অংশগুলো হচ্ছে প্রাইমারী কুলিং পাম্প, প্রেসারাইজার এবং হিট এক্সচেঞ্জারের প্রাইমারী অংশ। হিট এক্সচেঞ্জারের সেকেন্ডারী অংশে থাকে সেকেন্ডারী কুলিং লুপের পানি যা কিনা বাষ্পে পরিণত হয়। প্রাইমারী লুপের সকল অংশই তৈরী করা হয় বিশেষ ধরণের স্টেইনলেস স্টীল দিয়ে। ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরীর জন্যে যে রিঅ্যাক্টর ব্যবহৃত হয় তার কোরের ভেতর দিয়ে প্রতি ঘন্টায় প্রায় ৮৬,০০০ টন পানি প্রবাহিত করতে হয়। এ জন্যে যে সব পাম্প ব্যবহৃত হয় তাদের সম্মিলিত ক্ষমতা প্রায় ৩০ মেগাওয়াট। রিঅ্যাক্টর কোর থেকে বেরুনোর সময় পানির তাপমাত্রা থাকে প্রায় 230^0C। হিট এক্সচেঞ্জারে তাপ ছেড়ে এই পানি যখন রিঅ্যাক্টরে কোরের প্রবেশ পথে এসে পৌছে তখন তার তাপমাত্র নেমে দাঁড়ায় প্রায় 200^0C। এত উচ্চ তাপেও কিন্তু প্রাইমারী লুপের পানি কখনো বাষ্পে পরিণত হয় না। এর কারণ এই যে, ছবিতে দেখানো প্রেসারাইজারের মাধ্যমে এই লুপের পানিকে প্রায় ১৬ মেগা প্যাসকেল (প্রায় 2300 psi) চাপে রাখা হয় বিধায় পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হতে পারে না। আগেই বলা হয়েছে যে, টারবাইন ঘোরানোর জন্য যে বাষ্পের প্রয়োজন তা তৈরী হয় হিট এক্সচেঞ্জারের সেকেন্ডারী অংশে। হিট এক্সচেঞ্জারের সেকেন্ডারী অংশ, টারবাইন, কনডেন্সার এবং ফিড পাম্প দিয়ে তৈরী হয় সেকেন্ডারী কুলিং লুপ। রিঅ্যাক্টরের অব্যবহৃত তাপকে আলটিমেট হিট সিংক, অর্থাৎ নদী, সমুদ্র অথবা কুলিং টাওয়ারের সাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় তৃতীয় একটি লুপ যা কনডেন্সার কুলিং লুপ নামে পরিচিত। শেষের এই লুপ দুইটি অন্যান্য তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত কুলিং লুপগুলোর অনুরূপ হয়ে থাকে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ফিশন বিক্রিয়ার ফলে রিঅ্যাক্টর কোরে উৎপাদিত কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ যদি কোনভাবে প্রইমারী কুলিং লুপের পানিতে মিশে গিয়ে থাকে তবুও তা কখনও সেকেন্ডারী এবং কনডেন্সার কুলিং লুপের বাধাগুলো অতিক্রম করে নদী অথবা সমুদ্রে গিয়ে পৌছতে পারেনা।

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের একটি বিশেষ দিক এই যে, এটিকে বন্ধ করার সাথে সাথে এর তাপ উৎপাদন ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায় না। এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উপাদন করছে এমন একটি রিঅ্যাক্টর বন্ধ করার পর মুহূর্তে কোরে যে তাপ উৎপন্ন হতে থাকে তার পরিমাণ প্রায় ২১০ মেগাওয়াট (৩০০০ মেগাওয়াট থারমাল পাওয়ারের ৭%)। সময়ের সাথে সাথে এই তাপ উৎপাদনের হার কমতে থাকে। মাস খানেক পর এর পরিমাণ এসে দাঁড়ায় প্রায় ৪.৫ মেগাওয়াটে। প্রশ্ন হচ্ছে যে, ফিশন রিঅ্যাকশন বন্ধ হবার পরও এই তাপ উৎপাদন অব্যাহত থাকে কী ভাবে? আসলে যা ঘটে তা হচ্ছে, রিঅ্যাক্টর চলার সময় রিঅ্যাক্টর কোরে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো হতে বহু বছর ধরে অতি উচ্চ শক্তির গামা, বিটাসহ বিভিন্ন ধরণের রশ্মি বিকিরিত হতে থাকে। বিকিরিত এই রশ্মিগুলো রিঅ্যাক্টর কোরের বিভিন্ন পদার্থে শোষিত হয়ে তাপ উৎপন্ন করে। এভাবে উৎপাদিত তাপ "ডিকে হিট" নামে পরিচিত। যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে রিঅ্যাক্টর কোর থেকে ডিকে হিট সরানো না হলে কোরের তাপ মাত্র বাড়তে বাড়তে এক সময় জ্বালানী দন্ডগুলো গলে গিয়ে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৯ সালে আমেরিকার থ্রি-মাইল আইল্যান্ড এবং ২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমার রিঅ্যাক্টরগুলোতে সংঘটিত দুর্ঘটনার মূল কারণ ছিল যথাসময়ে ডিকে হিট অপসারণ করতে না পারা।

১৯৫৪ সালে প্রথম জেনারেশন (Gen-I) রিঅ্যাক্টর দিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে তৃতীয় জেনারেশন (Gen-III) এমন কি Gen-III+ রিঅ্যাক্টর নির্মাণ করা হচ্ছে। এ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর নিউক্লিয়ার ইন্ডাস্ট্রিগুলোর মোট অভিজ্ঞতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬,০০০ রিঅ্যাক্টর-বছরে। বর্তমানে ৩০টি দেশে প্রায় ৪৪৭ টি রিঅ্যাক্টর ইউনিট চালু থেকে বিশ্বে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের প্রায় ১১ শতাংশ সরবরাহ করছে। রূপপুরে আমরা যে রিঅ্যাক্টর স্থাপন করতে যাচ্ছি তা হবে Gen-III+

ঘরনার। Gen-III+ রিঅ্যাক্টরের মূল বৈশিষ্ট হলো এই যে এগুলো অত্যন্ত নিরাপদ। যে কোন সংকটজনক পরিস্থিতিতে, এমনকি থ্রি-মাইল আইল্যান্ড কিংবা ফুকুশিমায় সংঘটিত সংকটজনক পরিস্থিতিতেও এ রিঅ্যাক্টরগুলোর কোর গলে গিয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না। এ ধরণের সুদৃঢ় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে প্যাসিভ (passive) নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যবহারের মাধ্যমে। প্যাসিভ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হচ্ছে এমন এক ধরণের ব্যবস্থা যা চালনার জন্যে কোন বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। প্রাকৃতিক বল যেমন, মাধ্যাকর্ষণ, সংকুচিত স্প্রিং বা গ্যাসের চাপ, ন্যাচারাল কনভেকশন কুলিং, ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে এসব রিঅ্যাক্টরের সেফটি সিস্টেম বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নির্মিত হয় বিধায় কোন কারণে বিদ্যুৎ না থাকলেও প্যাসিভ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে ডিকে হিট অপসারণ করে রিঅ্যাক্টর কোরকে শীতল রাখা সম্ভব হয়। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, Gen-III+ রিঅ্যাক্টর দ্বারা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সকল বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা যদি কোন দুর্ঘটনার ফলে বিকল হয়ে পড়ে (ফুকুশিমা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যেমনটি হয়েছিল) সে ক্ষেত্রে এসব কেন্দ্রের প্যাসিভ নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো কোন অপারেটরের সাহায্য ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে প্রায় ২৪ ঘন্টা ধরে ডিকে হিট অপসারণ করবে এবং এর ফলে রিঅ্যাক্টর কোর তথা জ্বালানীর কোন ক্ষতি হবে না। এখানে যে সময়ের (২৪ ঘন্টার) কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাকে বলা হয় "গ্রেস পিরিয়ড"। উল্লেখ্য যে, Gen-II রিঅ্যাক্টর, অর্থাৎ ফুকুশিমা রিঅ্যাক্টরের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ডের মান ছিল মাত্র ৩০ মিনিট।

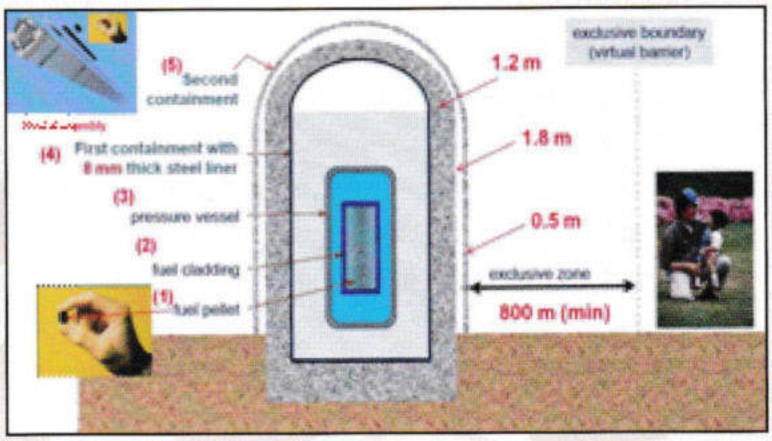

চিত্র-৪ : Gen-II VVER চিত্র-৩ রিঅ্যাক্টরে ব্যবহৃত পাঁচ স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা বেষ্টনী

রূপপুরের রিঅ্যাক্টরগুলোর প্রতিটিতে ৭ টি অ্যাকটিভ (অর্থাৎ বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত) এবং ৮ টি প্যাসিভসহ মোট ১৫ টি নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। এ ছাড়া রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেলের নীচে থাকবে একটি কোর ক্যাচার (core catcher)। প্রায় ৮০০ টন ওজনের এই কোর ক্যাচারটি কোন কারণে রিঅ্যাক্টরের কোর এবং প্রেসার ভেসেল গলে গিয়ে থাকলে গলিত কোর ধারণ করে তা শীতল করবে। এর ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ কোন অবস্থাতেই রিঅ্যাক্টর বিল্ডিং এর মেঝে ভেদ করে বাইরে আসতে পারবে না। অর্থাৎ এই রিঅ্যাক্টর হতে কখনোই পরিবেশের বা এর আশেপাশে বসবাসকারী লোকজনের কোন ক্ষতি হবে না। ফিশন বিক্রিয়ার ফলে ইউরেনিয়াম জ্বালানীর অভ্যন্তরে যে সকল তেজস্ক্রিয় ফিশন প্রোডাক্ট উৎপন্ন হয় তার দ্বারা যেন কোন অবস্থাতেই পরিবেশের ক্ষতি না হয় সে লক্ষ্যে রূপপুরের রিঅ্যাক্টরে পাঁচস্তর বিশিষ্ট বিশেষ নিরাপত্তা বেষ্টনীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চিত্র-৪ এ এই পাঁচটি স্তর দেখানো হয়েছে।

উল্লেখ করা দরকার যে Gen-II রিঅ্যাক্টরে কোন কোন ক্যাচার নেই। এখানে প্রথম নিরাপত্তা বেষ্টনী হচ্ছে, ইউরেনিয়াম ডাই অক্সসাইড (UO_2) জ্বালানী, যার গঠন অনেকটা সিরামিকের মত। এ ধরণের গঠনের ফলে জ্বালানীর ভেতরের অংশে উৎপাদিত ফিশন প্রোডাক্ট সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না বলে এটিকে প্রথম নিরাপত্তা বেষ্টনী হিসেবে গণ্য করা হয়। এর পরের বেষ্টনী হচ্ছে জ্বালানীর চারপাশে ঘিরে থাকা জিরকোনিয়াম ধাতু দ্বারা তৈরী আবরণ বা ক্ল্যাডিং। তৃতীয় স্তরে রয়েছে প্রাইমারী কুলিং সিস্টেমের প্রেসার বাউন্ডারী যার একটি অংশ প্রেসার ভেসেল, এবং এর কথা আগেই বলা হয়েছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম নিরাপত্তা বেষ্টনী হিসেবে কাজ করে যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় কনটেইনমেন্ট বিল্ডিং। এগুলোর কোনটি কত পুরু ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। একটি বিষয় বলা দরকার যে রিঅ্যাক্টর বিল্ডিং এর চারপাশে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত এলাকায় লোকজনকে বসবাস করতে দেয়া হয় না। এ এলাকাটি "এক্সক্লুসন জোন (exclusion zone)" নামে পরিচিত। রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এক্সক্লুসন জোনের মান ৮০০ মিটার যা ছবিতে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এক্সক্লুসন জোনের পরে অবস্থিত জায়গা-জমি দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

এতক্ষণ যা বলা হলো আশা করি যে তা হতে তোমরা পাওয়ার রিঅ্যাক্টর সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করতে পেরেছ। এ ছাড়া তোমরা নিশ্চই বুঝতে পেরেছ যে, উন্নত মানের প্রযুক্তি এবং অতীতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন জেনারেশনের যে রিঅ্যাক্টর এখন তৈরী করা হচ্ছে তা অত্যন্ত নিরাপদ। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমাদের কেন দরকার সে বিষয়ে কিছু বলে আমার লেখা শেষ করব। বর্তমানে আমাদের দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১৫,০০০ মেগাওয়াট। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত বিশ্বের একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে ঐ সময় আমাদের প্রায় ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে। বিদ্যুৎ ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ জন্যে বিজ্ঞজনরা বলে থাকেন যে, মানুষের কল্যাণের জন্য শরীরের রক্ত প্রবাহ যেমন প্রয়োজন দেশের কল্যাণ তথা উন্নতির জন্য তেমনই প্রয়োজন বিদ্যুৎ প্রবাহের। দেশের সমৃদ্ধি অব্যহত রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছর বিদ্যুতের উৎপাদন আমাদের বাড়িয়ে যেতেই হবে। বর্তমানে আমাদের প্রায় ৬৩ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় নিজেদের প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে। আমরা জানি যে, নতুন গ্যাস ক্ষেত্র পাওয়া না গেলে আমাদের গ্যাসের মজুদ আগামী ১৫/১৬ বছরের মধ্যেই হয়ত শেষ হয়ে যাবে। নিজেদের কয়লা থাকলেও বিভিন্ন কারণে তা উত্তোলন করা যাচ্ছে না। তেল ব্যবহার করে উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্য অত্যন্ত বেশী। সোলার বিদ্যুৎ দিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট-খাট কাজ করা গেলেও তা দিয়ে বড় বড় কল কারখানা চালানো সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়া সোলার বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি খরচও বেশ বেশী। কাজেই বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে আমাদের পরমাণু বিদ্যুতের দিকে যেতে হচ্ছে। পরমাণু বিদ্যুতের সুবিধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুবিধা এই যে, এখানে গ্রীন হাউস গ্যাস উৎপাদিত হয় না, জ্বালানী খরচ তথা উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম, অল্প পরিমাণ জ্বালানী প্রয়োজন হয় বিধায় তা সহজে পরিবহণ করা যায়, একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে দীর্ঘ সময় অর্থাৎ প্রায় ৭০/৮০ বছর ধরে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, ইত্যাদি। প্রসংগত উল্লেখ করা দরকার যে, পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ে আমাদের অন্যতম প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং চীনের মহা পরিকল্পনা রয়েছে। এই দু'টি দেশই ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের বর্তমান পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় দশগুণ বাড়িয়ে যথাক্রমে ৬০,০০০ এবং ২,০০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করবে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। বিষয়টি এই যে, ২০৩০ সালের মধ্যে বহু সংখ্যক পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমাদের দেশের আশেপাশে চলতে থাকবে। অর্থাৎ, সে সময় আমাদের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের প্রভাবের মধ্যেই বসবাস করতে হবে। যেহেতু আমরা চাই আর না চাই নিকট ভবিষ্যতে আমাদের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের প্রভাব বলয়ের মধ্যেই থাকতে হচ্ছে, সেহেতু নিজের দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানিয়ে তা থেকে উপকৃত হওয়াটাই যথাযথ বলে প্রতীয়মান হয়।

পাট নিয়ে কিছু কথা

ড. হাসিনা খান
অধ্যাপক
প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশীদের জন্য পাট শুধুমাত্র আঁশ উৎপাদনকারী ফসলই নয়, এটি জাতীয় পরিচয়ের একটি প্রতিচ্ছবি-যা দেশের গৌরবোজ্জ্বল সোনার বাংলার ঐতিহ্যের সাথে জড়িত। দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের পথে পাট ছিল অন্যতম হাতিয়ার। চিরায়ত সোনার বাংলাকে ঘিরে জাতীয় ঐতিহ্যের যে ছবি অঙ্কিত, সেখানে সোনালী ধানের ক্ষেতের সাথে সোনালী আঁশের আন্দোলিত মাঠের ছবিও পাশাপাশি স্থান পেয়ে আসছে।

উৎপত্তি, বিস্তার ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে পাট বাংলাদেশে আবহমানকাল ধরে চাষাবাদ হচ্ছে। বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৯৫ ভাগ পাট বাংলাদেশ, ভারত, বার্মা ও নেপাল এ উৎপাদিত হয়। যেহেতু পাট আমাদের দেশীয় ফসল এবং এর উন্নয়ন আমাদেরকেই করতে হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য দানাজাতীয় ফসলসহ অন্যান্য খাদ্যফসল যেমন- সব্জি, ডাল ও তেলজাতীয় ফসলের চাপে পাট অপ্রচলিত জমিতে (অপেক্ষাকৃত কম উর্বর) চাষ করতে হচ্ছে। এর জন্য পাটকে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য দরকার প্রতিকূল পরিবেশে সহনশীল জিন সম্পন্ন পাটের জাত ।

আমাদের দেশে পাটের দুটি প্রজাতি- দেশী ও তোষা জাতের ব্যাপক চাষ হয়। এটা আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল। আমাদের আমদানী আয়ের ৬% পাট থেকে আসে। এবং এই শিল্পের সাথে প্রায় ৩ কোটি মানুষের জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। প্রতি বছর গড়ে বাংলাদেশের ০.৩৯২ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে প্রায় ০.৭৯৪ মিলিয়ন টন পাট উৎপাদন হয়। ৫ মিলিয়ন কৃষক পরিবারের অর্থের সংস্থান করে পাট।

সারাবিশ্বে প্রাকৃতিক তন্তুর (সূতা) ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জল হয়ে উঠেছে। পরিবেশগত সচেতনতার কারণেই পৃথিবীতে সিনথেটিক পণ্যের পরিবর্তে প্রাকৃতিক পণ্যের ব্যবহার বেড়েছে। ভবিষ্যতে এ পণ্যের ব্যবহার আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জমির উর্বরতা সমৃদ্ধায়নে পাট

পাটের মূল অকর্ষণযোগ্য ভূমিস্তর ভাঙতে সহায়তা করে। পাটের মূল মাটিতে অণুজীব সমৃদ্ধ করে এবং ভূমির উপরের স্তরে পানির প্রাপ্যতা বাড়ায়। এছাড়া গড়পড়তা একটি পাট ক্ষেত হতে প্রতি হেক্টরে ১.৯২ টন পাতা মাটিতে যুক্ত হয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। পাটের পচনের পরে এর মূল ভরের প্রায় ৩৬% জৈবযৌগ মাটিতে যোগ হয়। পাট মাটি থেকে যতটুকু পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে তার ১০ গুণ মাটিতে ফেরত দেয়। এছাড়া রোগ এবং পোকামাকড়ের পুনরাবৃত্ত সংক্রমণ এড়ানোর জন্য এবং মাটিতে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের সুষম প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য পাটকে আমাদের শস্য বিন্যাসে আত্তীকরণ করা উচিত।

কৃত্রিম তন্তুর তুলনায় পাট আঁশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

পাটের আঁশ প্রাকৃতিক ভাবেই পচনশীল, তাই পরিবেশ বান্ধব। নদী ভাঙ্গন এবং ভূমিক্ষয় রোধে জিও-জুট (Geo-jute) এর রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা। পাট কাঠি এখন পারটেক্স ও আসবাসপত্র তৈরীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সবুজ পাট কাগজের মন্ড তৈরীতেও ব্যবহৃত হতে পারে।

বিগত এক দশকে বিভিন্ন উদ্ভিদ/ফসলের জিনোম সিকুয়েন্সিং সম্পন্ন হওয়ায় ও বিপুল পরিমানে মলিকুলার চিহ্নায়কের (molecular marker) আবিষ্কারের কারণে ফসলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রনকারী জিনের অবস্থান ও প্রকৃতি এবং এদের বিপাকীয় ও মলিকুলার প্রক্রিয়া সহজে ও সঠিকভাবে নির্নয় করা যাচ্ছে। বিশেষ করে এতদিন পর্যন্ত যে বৈশিষ্ট্যগুলোর উন্নয়ন সনাতন প্রক্রিয়ায় সম্ভব হয়নি; যেমন: প্রতিকুল পরিবেশ (বন্যা, খরা, শৈত্য, লবণ) সহনশীলতা ইত্যাদি। এ সকল বৈশিষ্ট্য সমূহের উন্নয়ন এখন মলিকুলার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি সহজেই সূক্ষ্মতা ও দ্রুততার সাথে সফলভাবে করা যাচ্ছে । উদাহরন হিসেবে বন্যা সহনশীল ধান স্বর্ণা-সাব ১ ও বিআর ১১-সাব ১ এর কথা উলে খ করা যায়, যা অল্প সময়ের (৩-৪ বছর) মধ্যেই উদ্ভাবন করা হয়েছে । একইভাবে উচ্চফলনশীল লবণ সহনশীল ধান বা পাট উৎপাদনও সম্ভব । বাংলাদেশের জন্য যে প্রতিকূল পরিবেশ বেশি সমস্যাদায়ক অন্য দেশের জন্য তা হয়ত কোন সমস্যাই নয়। তাই বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উৎপাদন উপযোগী ফসলে এই সহনশীলতা পরীক্ষা করতে আমাদের নিজেদেরই উদ্যোগ নিতে হবে। উৎপাদন করতে হবে উচ্চফলনশীল প্রতিকূলতা সহনশীল শস্য।

আধুনিক জীববিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা বায়োইনফরমেটিক্স যা আমাদের সাহায্য করে একটি জানা জিনের কার্যকারীতা এবং অনুক্রমের পর্যালোচনার ভিত্তিতে অন্য একটি অজানা জিনের কাজ কি হতে পারে তা অনুমান করে সেই জিনটির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে। এক্ষেত্রে একটি ফসলের সম্পূর্ণ জিনোমের ক্রম জানাটা জরুরী। যেমন, বর্তমান গবেষণায় বের হয়ে আসছে যে খরা ও লবণ সহনশীলতার জন্য একইধরনের কয়েকটি জিন কাজ করে। আবার এইসব প্রতিকূলতা সহনশীল জিনগুলো রোগ সহনশীলতার জিনের কাজের সাথেও যুক্ত। অর্থাৎ একটি প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকতে উদ্ভিদে অনেকগুলো পরস্পর নির্ভরশীল জিনের কার্যকর হওয়া প্রয়োজন। এইসব জিনের কার্যকর হওয়া বা না হওয়া অনেকাংশেই নির্ভর করে কিছু নিয়ন্ত্রক অণুর উপর। এইসব পরস্পর নির্ভরশীল জিন এবং তাদের নিয়ন্ত্রকের নেটওয়ার্ক গবেষণা করে এমন ফসল ফলানো সম্ভব যা হয়ত একই সাথে খরা, লবণাক্ততা ও বন্যা সহনশীলতার বৈশিষ্ট্য বহন করবে। প্রতিকূলতা সহনশীলতার জিনগুলো কিভাবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং কিভাবে সেগুলো কাজ করবে তা বুঝতে মলিকুলার বায়োলজির জ্ঞান আবশ্যক ।

একটি জীবের জেনোম হচ্ছে একটি বইয়ের মতো, যেখানে সেই জীবের জীবনগল্প লেখা থাকে। একটি জীব কেন কেবলই তার নিজের মতো, কেন সে তার জন্য নির্ধারিত কাজগুলোই করে কিংবা কেন সে শস্যকণা তৈরী না করে তন্তু উৎপাদন করে, তার পূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে তার জেনোম গ্রন্থে। আর তাই যখনই আমরা একটি জীবের ওপর কোন রকম নিয়ন্ত্রন অর্জন করতে চাই, তখনই প্রয়োজন হয় তার জেনোমে লিপিবদ্ধ এই গল্প পড়ার। আর এ ধরনের কোন গল্প পড়তে গেলে আমরা হাতে পাই একটি পান্ডুলিপি। এরকম অনেক খসড়া পান্ডুলিপি তৈরী করতে করতে আমারা ক্রমশ জেনোমের পূর্ণ গল্প উপলব্ধির দিকে ধাবিত হই। প্রত্যেক জীবেরই জেনোম পান্ডুলিপি আলাদা। এসব পান্ডুলিপি পড়ার জন্য প্রয়োজন এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ।

তবে একটি জীবকে বুঝতে হলে কেবল তার জেনোমের গল্প পড়াই যথেষ্ট নয়, আক্ষরিক অর্থেই গল্পের প্রত্যেকটি লাইনের মর্ম উদ্ধার করতে হয়। একাজের জন্য আমাদের প্রয়োজন অন্য আরেকদল বিশেষজ্ঞ, যারা কাজটি যথার্থভাবে করতে পারবে। জীবের এই জীবনগল্প খোদিত হয় তার জেনেটিক পদার্থ বা জেনোমে, যা চার ধরনের বেস বা নিউক্লিটাইডের সমবায়ে গড়ে ওঠা ডিএনএ দিয়ে তৈরী। যুগলবন্দী এই বেসগুলো বিভিন্ন সজ্জায় সজ্জিত থাকে এবং এদের সংখ্যা হতে পারে কয়েক বিলিয়ন পর্যন্ত। যেমন, মানব জেনোমে রয়েছে এরকম ৩.২ বিলিয়ন বেসযুগল। বিভিন্ন প্রজাতির পাটেরও রয়েছে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের জেনোম।

প্রত্যেক জীবিত প্রাণী, হোক সে মানুষ, জন্তু কিংবা উদ্ভিদ; সবার রয়েছে এক জেনেটিক নীলনকশা; যা অ, ঞ, ঈ, এ এই চার রাসায়নিক অক্ষরেই লিখিত। ঠিক সেভাবেই পাটেরও আছে এক জেনোম। এই জিন-নকশায় লিখিত আছে পাটের পাটত্ব। আর পাটকে ভবিষ্যতের জন্য যুগোপযোগী এক সম্ভাবনাময় ফসলে পরিণত করার চাবিকাঠিও লুকিয়ে আছে এই নকশার ভেতরেই। পাটের এই নকশা প্রোগ্রামের কথা জানতে পারার কারনে আমরা এমন পাট তৈরি করতে পারব, যার

তন্তু হবে আরও অনেক সরু জাতের। সহজেই তাকে তুলা কিংবা উলের সঙ্গে মেশানো কিংবা সংগ্রহ করা যাবে। পাটের যে শোলা বা কাঠি আছে, তা দিয়ে তৈরি করা যাবে কাগজ অথবা বাড়িঘর বানানোর বিভিন্ন সরঞ্জাম। পাটের সব জিনের খবর পাওয়া গেলে আমাদের জন্য খুলে যাবে জিন ভিত্তিক কাজের নতুন সব সম্ভাবনা।

প্রযুক্তিগত মঞ্চ তৈরীতে জুট জেনোম সিকুয়েন্স

যেহেতু উদ্ভিদ (কিংবা যেকোন জীব)-এর প্রত্যেক আণবিক কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় ডিএনএ দিয়ে, তাই একটি জীবের জেনোম রহস্য উদঘাটনের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এমন শস্য উদ্ভাবন করতে পারবেন যারা দ্রুত বাড়বে, রোগ ব্যাধির বিরুদ্ধে বেশী প্রতিরোধী হবে, এবং অধিকতর কার্যকারীতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণ করবে। আর তাই শস্য-উদ্ভিদগুলোর জেনোম নিয়ে গবেষণার পেছনে রয়েছে মানবখাদ্য, গবাদিপশুখাদ্য, শক্তি ও তন্তু সম্পর্কিত বিশাল শিল্প উদ্যোগের সম্ভাবনা । যখন উদ্ভিদের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের পেছনের জিন শনাক্ত করা যাবে, তখন রোগব্যাধি প্রতিরোধী কিংবা ঘাত (যেমন, বন্যা ও লবনাক্ততা) সহনশীল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শস্য তৈরীর ভিত্তি রচিত হবে। এসব প্রতিটি কৌশলেরই উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে সিকুয়েন্সিং, যা জেনেটিক বিশেষণের কৌশলকে শক্তিশালী করে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ জিন সনাক্তকরণ ও এসব জিনের মেধাসত্ত্ব অর্জনে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের পাট শিল্পের সমস্যা সমাধানে জুট জেনোম সিকুয়েন্সিং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়, যা এই বিশিষ্ট তন্তু-শস্যটির বৈশিষ্ট্য-পরিবর্তনের জন্য একটি রোমাঞ্চকর বিজ্ঞানভিত্তিক ক্ষেত্র তৈরী করতে সাহায্য করবে।

পাটের জেনোম জানার মাধ্যমে আমরা যে মৌলিক কাজটি করতে পেরেছি, এর ফলে পৃথিবীর বিজ্ঞানের মানচিত্রে বাংলাদেশ তার দৃঢ় অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। আমাদের দেশে পাটের একটি বিশাল ভাণ্ডার আছে যেখানে পৃথিবীতে উৎপন্ন প্রায় সব জাতের পাটবীজ রয়েছে। কম পোকামাকড় আক্রমণ করে এমন জাতের পাটও রয়েছে। কিন্তু এসব জাতের ফলনের পরিমাণ হয়তো খুবই কম। যেহেতু আমরা পাটের জীবন রহস্য জানতে পেরেছি, এখন এমন নতুন জাত আবিষ্কারে মনোনিবেশ করার সুযোগ অনেক বেড়ে গেল যার মাধ্যমে আমরা এখন পাট উদ্ভাবন করতে পারবো যার ফলন সন্তোষজনক হবে, যাতে পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হবে এবং যা শীতকালেও আবাদ করা সম্ভব। শুধু তাই নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত নতুন পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম নতুন জাতের পাটও আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। একটি জাতের পাটের জীবন রহস্য জানা হলে অন্য জাতের পাটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া সহজ। কাজেই এ রহস্য জানার ফলে বাংলাদেশের জন্য উপযোগী পাটের নতুন জাত আবিষ্কারের বিষয়টি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। তবে এক্ষেত্রে আমরা সাফল্যের প্রথম দিকের সিঁড়িতে অবস্থান করছি, এমনটাও বলা যায়। আমাদের প্রকৃত গন্তব্যে পৌছাতে যেতে হবে আরও বহুদূর। এর জন্য দরকার নিরন্তর গবেষণা।

যেহেতু জেনোম সব প্রাণীর ক্ষেত্রে একই উপাদানে তৈরি, ফলে পাট গবেষণায় আমাদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা অন্য আরও বহু ক্ষেত্রে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। যেমন– আমাদের দেশের প্রয়োজনে বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ধান, গম, বিভিন্ন সবজি– এগুলোর নতুন জাত আবিষ্কারে পাট গবেষণায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে কুটিরশিল্পে রশি, চট– বিভিন্ন সামগ্রী তৈরিতে পাটের চাহিদা ক্রমে বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় দেশে প্রয়োজনীয় পাটের উৎপাদন অব্যাহত রাখা এক বড় চ্যালেঞ্জ। জেনোম থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমাদের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহায্য করবে। এবং অবশ্যই আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি আমাদের সোনালী পাট তার সোনালী দিন ফিরে পাবে।

কণার নামটি বোজন

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
অধ্যাপক
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

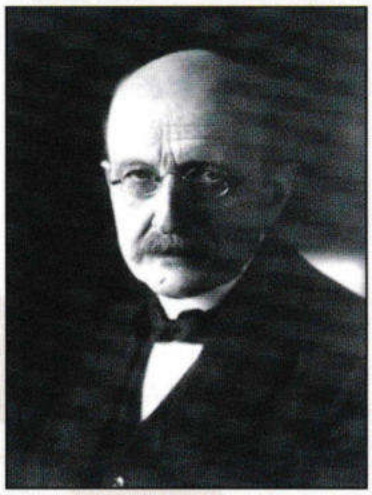

ম্যাক্স প্লাংক আলোকে কণা হিসেবে ধরে নিয়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা করেছিলেন

পদার্থবিজ্ঞানের আলো-আঁধারি জগৎ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জন্ম প্রক্রিয়া শুরু হয় 1900 সালে যখন ম্যাক্স প্লাংক আলো বিকিরণ সংক্রান্ত একটা বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্যে আলোকে বিচ্ছিন্ন কণা হিসেবে অনুমান করে নিলেন। এর আগ পর্যন্ত সবাই নিশ্চিতভাবে জানত আলো হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ—কাজেই ম্যাক্স প্লাংকের এই ঘোষণা পদার্থবিজ্ঞানের জগতে খুব বড় একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কিছুদিনের ভিতরেই বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ব্যাখ্যা করার জন্যে আলোর কণা তত্ত্ব ব্যবহার করে নোবেল পুরস্কার পেলেন। (তার আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল থিওরি অব রিলেটিভিটি কিন্তু সেটা এমনই বিচিত্র একটা বিষয় ছিল যে নোবেল কমিটির জন্যে সেটা হজম করা কঠিন ব্যাপার ছিল!) অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও নানা ধরনের পরীক্ষায় আলোর কণা তত্ত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন এবং পৃথিবীতে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো নূতন করে লিখতে বাধ্য হলেন। ম্যাক্স প্লাংক জগদ্বিখ্যাত একজন পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিলেন!

পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আলোকে কণা হিসেবে দেখা গেছে সত্যি কিন্তু পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানীদের সবার মনের ভেতরে একটা বিষয় খচখচ করছিল কারণ ম্যাক্স প্লাংক যেভাবে তার বিকিরণ সূত্রটি বের করেছিলেন সেখানে তার ব্যবহার করা যুক্তিতে একটা বড় গরমিল ছিল। পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সাথে মিলে যায় বলে কেউ সেটা ফেলেও দিতে পারেন না কিন্তু যুক্তির গরমিলটা মেনেও নিতে পারেন না—সবার ভেতরেই এক ধরনের অস্বস্তি। ঠিক এই সময়ে একজন তরুণ বিজ্ঞানী পুরো তত্ত্বটিকে সঠিক যুক্তির উপর দাঁড় করিয়ে সকল বিভ্রান্তি দূর করে পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে নিলেন—এই তরুণ বিজ্ঞানী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক একজন বাঙালি—তার নাম সত্যেন্দ্রনাথ বসু। স্নেহভরে আমরা শর্টকাট করে বলি সত্যেন বোস।

ম্যাক্স প্লাংকের সূত্রকে সঠিক যুক্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসু যার নামে বোজনের নামকরণ করা হয়েছে

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা সত্যেন বোস কত বড় বিজ্ঞানী সেটা অনুমান করাও কঠিন তবে তার একটা ধারণা দেয়ার জন্যে বলা যায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছু তৈরি হয়েছে যে সকল কণা দিয়ে সেই কণাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। দুই ভাগের এক ভাগের নাম ফারমিওন—ইতালীয় বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নামে এই নামকরণ। অন্য ভাগের নাম আমাদের সত্যেন বোসের নামানুসারে রাখা হয়েছে বোজন (Boson)। ফারমিওন এবং বোজনের বিশেষ ধর্ম রয়েছে—খুব সহজ ভাষায় বলা যায় ফারমিওন কণাগুলো যেন একটু ঝগড়াটে ধরনের, একই ধরনের কণা হলে এক জায়গায় থাকতে পারে না ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকতে হয়। সেই তুলনায় বোজন হচ্ছে খুব সামাজিক টাইপের কণা, একই ধরনের বোজন এক জায়গায় থাকতে কোনো সমস্যা হয় না—তারা সেটা পছন্দই করে। আমাদের পরিচিত কণা দিয়ে উদাহরণ দিতে হলে বলতে হয় আলো আর ইলেকট্রনের কথা। আলো হচ্ছে বোজন আর ইলেকট্রন হচ্ছে ফারমিওন। ফারমিওনের জন্যে এক ধরনের পরিসংখ্যানের সূত্র গড়ে উঠেছে, সেটা ফারমি-

ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স নামে পরিচিত। বোজনের পরিসংখ্যানের সূত্রকে বলা হয় বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স। কেউ যদি এই দুটো তত্ত্বের সাথে জড়িত বিজ্ঞানীদের নামগুলোর দিকে লক্ষ্য করে তাহলে আবিষ্কার করবে সত্যেন বোস ছাড়া অন্য সবাই তাদের কাজের জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন! আমাদের সত্যেন বোস যদি এত বড় বিজ্ঞানী না হতেন তাহলে কেন তাকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হলো না সেটা চিন্তা করে আমাদের ক্ষুব্ধ হবার কারণ থাকত। এখন ব্যাপারটা হয়ে গেছে উল্টো—আমরা সবাই জানি তাকে নোবেল পুরস্কার দিতে পারলে নোবেল কমিটিই ধন্য হতে পারত!

সত্যেন বোস কেমন করে তার জগদ্বিখ্যাত বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স বের করলেন সেটা নিয়ে নানা রকম গল্প আছে। বলা হয়ে থাকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের ম্যাক্স প্লাংকের বিকিরণের সূত্রটি পড়ানোর সময় সেখানে যৌক্তিক গরমিলটি দেখানোর চেষ্টা করছিলেন। তিনি তার মতো করে যেভাবে বিষয়টা ব্যাখ্যা করছিলেন তার কারণে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন সেই গরমিলটি আর নেই—পুরো বিষয়টি একটা যৌক্তিক কাঠামোর মাঝে দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি তখন টের পেলেন পদার্থবিজ্ঞানের অনেক বড় একটি সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন।

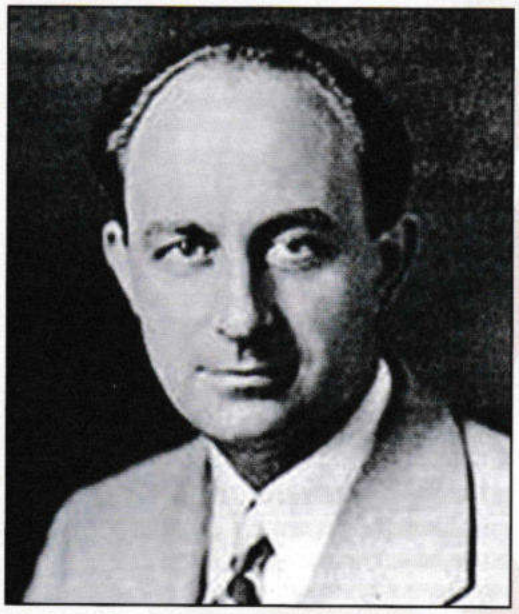

পৃথিবীর যাবতীয় কণাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তার এক ভাগ ফারমিওনের নাম হয়েছে এনরিকো ফারমির নামে

সময়টা ছিল 1924 সালের প্রথম দিকে। তখন সত্যেন বোসের বয়স মাত্র ত্রিশ। খুব উৎসাহ নিয়ে সত্যেন বোস তার যুগান্তকারী আবিষ্কারটি লিখে সেই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ জার্নাল "ফিলোসফিকেল ম্যাগাজিন"-এ পাঠিয়ে দিলেন। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু ফিলোসফিকেল ম্যাগাজিন তার প্রবন্ধটি ছাপানোর অনুপযুক্ত বিবেচনা করে তার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিল! এর পরে সত্যেন বোস যে কাজটি করলেন সেটা আরও অবিশ্বাস্য—তিনি তার প্রবন্ধটি পাঠালেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কাছে, সাথে একটা চিঠি। সেই চিঠিতে তার অনুরোধটি ছিল অকল্পনীয়। তিনি আইনস্টাইনকে লিখলেন এই প্রবন্ধটি পড়ে তার যদি মনে হয় এটা প্রকাশ করার উপযোগী তাহলে তিনি যেন জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সেটাকে সাইটশ্রিফট ফুয়ার ফিজিক (Zeitschrift Fur Physik) জার্নালে ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেন! যে কোনো হিসেবেই এটা এক ধরনের দুঃসাহস কিন্তু সত্যেন বোস এই দুঃসাহস করতে দ্বিধা করেন নি। তিনি খোলামেলাভাবে লিখলেন, যদিও তিনি আইনস্টাইনের কাছে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত তবু তিনি এটা লিখছেন কারণ সবাই আইনস্টাইনকে তাদের শিক্ষক মনে করে—এবং সে জন্যে সবাই তার ছাত্র।

সত্যেন বোস আইনস্টাইনকে চিঠির শেষে মনে করিয়ে দিলেন, "আমার ঠিক জানা নেই আপনার মনে আছে কী না—কিছুদিন আগে কোলকাতা থেকে একজন আপনার রিলেটিভিটির উপর প্রবন্ধগুলো ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করার অনুমতি চেয়েছিল। আপনি অনুমতি দিয়েছিলেন এবং সেটা অনুবাদ করে বই হিসেবে বের করা হয়ে গেছে এবং আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি যে জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির উপর সেই প্রবন্ধগুলো অনুবাদ করেছি!"

সত্যেন বোস চিঠিতে লিখেন নি—কিন্তু আইনস্টাইনের কাছে প্রবন্ধটি পাঠানোর এবং সেটা অনুবাদ করে জার্নালে ছাপানোর অনুরোধ করার পিছনে আরো একটি কারণ ছিল। তখন সারা পৃথিবীতে সম্ভবত আইনস্টাইনই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি সত্যেন বোসের আবিষ্কারের গুরুত্বটা বুঝতে পারতেন। হলোও তাই, আইনস্টাইন প্রবন্ধটি পাওয়া মাত্র বসে বসে সেটাকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সত্যেন বোসের বলে দেয়া জার্নালে পাঠিয়ে দিলেন। নিচে তিনি শুধুমাত্র একটা ফুটনোট জুড়ে দিয়ে সেখানে লিখলেন, বোসের এই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র এই ফুটনোটের জন্যে বিশ্বখ্যাত

এই পরিসংখ্যান সূত্রটিতে আইনস্টাইনের নাম ঢুকে গেছে—এটাকে কেউ বোস স্ট্যাটিস্টিক্স বলে না—সবাই এটাকে বলে বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স! পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে এরকম উদাহরণ খুব বেশি নেই যেখানে একটি প্রবন্ধ অনুবাদ করার জন্যে একটি সূত্র অনুবাদকের নামেও পরিচিত হতে শুরু করেছে। তবে ব্যাপারটি নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তোলেনি কারণ এখানে অনুবাদক হচ্ছেন স্বয়ং আইনস্টাইন!

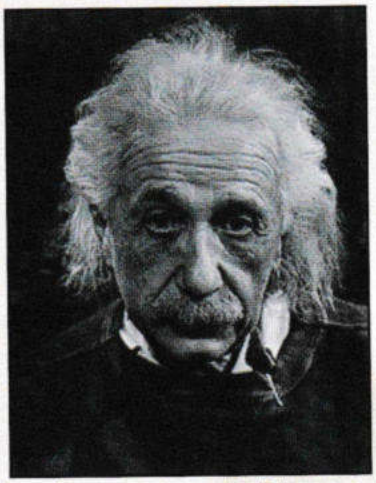

জার্নালে ছাপানোর জন্যে আইনস্টাইন সত্যেন বোসের প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে দিয়েছিলেন

সত্যেন বোসের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আইনস্টাইন নিজেই সেটা নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন এবং সেখান থেকে বের হয়ে এলো জগদ্বিখ্যাত বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেশন নামের একটি নূতন ধারণা! এই ধারণার উপর কাজ করার জন্যে 2001 সালে তিনজন পদার্থবিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে! মজার ব্যাপার হচ্ছে সত্যেন বোস নোবেল পুরস্কার পান নি কিন্তু তার কাজের উপর কাজ করে অনেকেই নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন!

সত্যেন বোস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 1921 সালে রিডার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তখন তার বেতন ছিল মাত্র 400 টাকা (যদিও সে যুগে সেটাকে যথেষ্ট ভালো বেতন হিসেবেই বিবেচনা করা হতো!) দুই বছর অনেক পরিশ্রম করার পর তার বেতন মাত্র একশ টাকা বাড়িয়ে আরো দুই বছরের জন্যে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। সত্যেন বোস ঠিক তখন তার বিখ্যাত বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কাজ করছেন—তখন তার ইচ্ছে হলো ইউরোপে পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের সাথে সময় কাটানোর। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছরের জন্যে ছুটির আবেদন করলেন। তার ছুটি মঞ্জুর হলো। তিনি ইউরোপে গেলেন দুই বছরের জন্যে। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে 1927 সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিলেন।

সত্যেন বোস সুদীর্ঘ 24 বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছেন। তার আগ্রহ ছিল বহুমাত্রিক, বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের নানা ধরনের যন্ত্রপাতিও গড়ে তুলেছিলেন। আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন কার্জন হলের বিভিন্ন কোনায় পুরানো যন্ত্রপাতি পড়ে থাকতে দেখেছি, পুরানো মানুষদের জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছি সেগুলো নাকি সত্যেন বোসের হাতে তৈরি নানা এক্সপেরিমেন্টের অংশ।

সত্যেন বোস তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

অসাধারণ প্রতিভাময় এই মানুষটি দেশ বিভাগের ঠিক আগে আগে কলকাতা ফিরে গিয়েছিলেন। তার কর্মময় জীবনের একটা অংশে তিনি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দায়িত্বও পালন করেছেন। শুধু বিজ্ঞানচর্চা নয় বিজ্ঞানের শিক্ষার জন্যেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। 1974 সালে ফেব্রুয়ারির 4 তারিখ এই কর্মময় মানুষের জীবনাবসান হয়।

আমরা যখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ভবনের সাথে সাথে পদার্থবিজ্ঞান ভবনের নাম করেছিলাম সত্যেন বোস ভবন—তখন সেটা যেন আমরা না করতে পারি সে জন্যে সিলেট শহরের সকল ধর্মান্ধ শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ করে রেখেছিল!

ভাগ্যিস সত্যেন বোস ততদিনে মারা গেছেন—তাকে এই ঘটনাটি নিজের কানে শুনতে হয়নি!

বি:দ্রঃ লেখকের 'আরো একটুখানি বিজ্ঞান' বই থেকে সংগৃহীত।

সাম্প্রতিক চিকিৎসা ব্যবস্থা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ
ডিন, মেডিসিন অনুষদ,
অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৮০ সালের কথা। সবে মাত্র ডাক্তারি পাশ করে ইন্টার্নিশিপ কমপ্লিট করার পর সরকারি চাকরী নিয়ে থানায় পোস্টিং পেলাম। খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম, কারণ আগেই জানতাম, থানায় পোস্টিং হওয়া মানেই নানা রকম প্রতিকূলতা। থাকা খাওয়ার সুবিধা নেই, নিরাপত্তার অভাব, চিকিৎসা ব্যবস্থা, ঔষধ আর সরঞ্জামাদির অপ্রতুলতা তো আছেই। আমরা চিকিৎসকরা "ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার" এর মত জোড়াতালি দিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলাম। হাসপাতালে কি নেই, সেই তালিকা করতে গেলে ফর্দ অনেক দীর্ঘ হবে, তার চেয়ে কি আছে সেই হিসেব রাখাই ভালো। বহিঃবিভাগে নানা রকম রোগী আসে, সবারই চিকিৎসা দিতে হয়। দরিদ্র রুগীর সংখ্যাই বেশী। পাশাপাশি খোঁজ রাখতে হয় ভর্তি থাকা রোগীদেরও।

দুই একদিন না যেতেই বহিঃবিভাগে সকালে রোগী দেখছি, হঠাৎ কয়েকজন লোক আমার কাছে এসে হাজির। তাদের চোখে মুখে অনেক উৎকণ্ঠা। খুব অনুনয় বিনয়ের সাথে অনুরোধ করলেন, দ্রুত তাদের সাথে যেতে হবে, এক মহিলা প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে। ব্যথা উঠেছে অনেক আগেই কিন্তু বাচ্চা আটকে আছে, বের হচ্ছে না। মায়ের অবস্থাও ভালো না। বাচ্চার অবস্থাও ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছে। আরও দেরী হলে পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাবে। আমি নবীন ডাক্তার, তাছাড়া পুরুষ হিসেবে ডেলিভারি করানোটা তখনো সামাজিকভাবে গ্রামে গঞ্জে ততটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও মহিলা ডাক্তার কেউ ছিলো না। তাই ইতস্তত করছিলাম। অনেক অনুরোধের পর মনে অনেকটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর ভয়ভীতি নিয়েই রোগী দেখতে গিয়ে আঁতকে উঠলাম। দেখি, বাচ্চার শরীর বের হয়ে আছে কিন্তু মাথা ভিতরে আটকে আছে। এ অবস্থায় কোনও হাসপাতালে নেয়াও সম্ভব ছিলো না। খুব বিপদে পড়ে গেলাম, কি থেকে কি করবো, বুঝতে পারছিলাম না। শুধু মাথায় একটাই ভাবনা, কিভাবে ডেলিভারিটা করা যায়।হাতে যে এক জোড়া গ্লাভস পরবো, সেই সুযোগ কই? নানা ঝক্কি ঝামেলা করে নারকেল তেল ব্যাবহার করে বাচ্চা বের করে আনলাম। মা ও বাচ্চা দুজনেই আল্লাহর রহমতে বেঁচে গেলো। আমার ডাক্তারি জীবনের প্রথম বড় কোন সার্থকতার দিন সেটি। নবজাতকের স্বজনরা সেদিন আমায় যে কত কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছিলো, তা বলে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু আমি যদি সেদিন সফল না হতাম, তাহলে? হয়তোবা নিশ্চিত ভাবেই জুটতো ধিক্কার, গালাগালি আর লাঞ্ছনা।

কয়েক বছর আগে আমার বর্তমান কর্মস্থলে বসে কাজ করছি। এমন সময় এক ভদ্রলোক খুব সুন্দর এক ছেলেকে নিয়ে হাজির হলেন। আমি চিনতে পারছিলাম না। ছেলেটাকে দেখিয়ে তিনি বললেন, "এই আমার সেই একমাত্র ছেলে, যাকে আপনি সেই ১৯৮০ সালে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিলেন। ছেলেটি ডাক্তার হতে চলেছে। দোয়া করবেন, যেন আপনার মত একজন ডাক্তার হয়ে দেশ ও দশের সেবা করতে পারে।" তাদের চোখের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধার উষ্ণ প্রশ্রবণ আমার কাছে বড় কোন পদকের চেয়ে মোটেও কম মনে হয়নি। আমিও কিছুটা আবেগাপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম। এই দীর্ঘ জীবনে এমন অনেক মুহূর্তের সাক্ষী হতে হয়েছে আমাকে। শুধু আমি নই, সব চিকিৎসককেই কর্মজীবনে কমবেশি এসব ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবেগের কাঁটাগুলো কিছুটা ভোতা হয়ে আসে। আবার কখনো কখনো প্রচ্ছন্ন অহংকারে বুকটাও ফুলে উঠে! মানুষের জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যখন কারো কিছু করার সামর্থ্য থাকে না, ঠিক সেই সময়টাতে আমরা চিকিৎসক হিসেবে আগ বাড়িয়ে যাই।মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সেবা করার যে দারুণ সুযোগ আমাদের দিয়েছেন, সে জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

যে সময়ের ঘটনার কথা বললাম, তখন গ্রাম বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা এমনটাই ছিলো। কঠিন রোগ ব্যধি হলে, একমাত্র আল্লাহ বা নিয়তির উপর ভরসা করা ছাড়া কিছুই করার ছিলো না। গ্রাম্য কবিরাজ, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ, মাজারে-মানতসহ কুচিকিৎসা-অপচিকিৎসা, এসবের উপরই মানুষ নির্ভরশীল ছিলো। এখন অনেক কিছুই বদলে গেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, হাতে হাতে আধুনিক প্রযুক্তির মুঠোফোন, ইন্টারনেট- সব জায়গায় দিন বদলের ছোঁয়া। একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞানের অবিস্মরণীয় উন্নতির সাথে সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে রোগ, রোগ নির্ণয়ের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় ঔষধের আবিষ্কার, এক কথায় সর্বক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, জয় করা গেছে বহু দুরারোগ্য ব্যধিকে। শল্য চিকিৎসায়ও অনেক অগ্রগতি হয়েছে। জিনতত্ত্ব জানবার সাথে সাথে উন্মোচন হয়েছে বহু জটিল রোগের কারণ ও ব্যখ্যা। মানুষের সুস্থ জীবন যাপনের নিশ্চয়তা বাড়াতে নানা ধরণের গবেষণা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

সময়ের সাথে সাধারণ মানুষ,চিকিৎসক আর রোগীদের মূল্যবোধ ও চিন্তাধারাও কি কিছুটা বদলায়নি? এত উন্নতির মাঝেও রোগীদের প্রত্যাশা কি শতভাগ পূর্ণ হয়েছে? প্রায়ই রোগীরা অভিযোগ করেন, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথেই ডাক্তারকে পাওয়া যায় না, তারা মনোযোগ দিয়ে কথা শুনেন না, ভালো করে রোগী দেখেন না, পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন না। রোগী বা তাঁর স্বজনদের প্রত্যাশা হলো, চিকিৎসকের কাছে গেলে বা হাসপাতালে আসলেই যেন তাৎক্ষনিক ডাক্তার পাওয়া যায় এবং চিকিৎসাও শুরু হয়। অনেক সময় নিয়ে, মনোযোগ দিয়ে রোগীকে ভালো করে দেখা, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, চিকিৎসা শুরু হওয়া মাত্রই যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়া যায় ইত্যাদি। হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের আরও অভিযোগ ঔষধ নেই, বিছানাপত্র ও পরীক্ষা নিরীক্ষার যন্ত্রপাতি ঠিক নেই, খাবারের মান ভালো নেই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব, এমনকি ডাক্তার নার্স আসেন না, ভালো করে দেখেন না ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এগুলো রোগীদের আকাঙ্ক্ষিত এবং প্রত্যাশিত। অন্যদিকে চিকিৎসকের কথাই ধরা যাক। নানা সীমাবদ্ধতা আর প্রতিকূলতার কারণে চিকিৎসকেরা এখনও সেবার জন্য নিজেকে পুরোপুরি উজাড় করে দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। তাদেরও যে ভুল ভ্রান্তি, দোষ ত্রুটি, অদক্ষতা বা অবহেলা নেই, তা নয়। রোগী আর তার স্বজনরাও স্বাভাবিক ভাবেই সন্তুষ্ট নন, আস্থা বা ভরসা করতে পারছেন না চিকিৎসকের উপর। নিতান্ত বাধ্য হয়েই চিকিৎসা নিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু কোথায় যেন একটা অপ্রাপ্তির রেশ আর বিশ্বাসের ফারাক। চিকিৎসক সেবা দিচ্ছেন, কিন্তু রোগীর প্রত্যাশা মিটছে না।

দেশে জনসংখ্যা বেশি, তাই রোগীও বেশি। হাসপাতাল গুলোতে রোগীদের অত্যধিক চাপ, গ্রামে-গঞ্জে, উপজেলা এমনকি জেলা সমূহেও প্রয়োজনের তুলনায় ডাক্তার, জনবল এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার প্রচণ্ড অভাব। ফলশ্রুতিতে ডাক্তারগণ, বিশেষ করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ চাপের মধ্যে থাকেন, চিকিৎসা দিতে হিমসিম খান। আবার অসংখ্য রোগী আর দায়িত্বের চাপে পিষ্ট চিকিৎসকও রোগীর কথা সময় নিয়ে শোনার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন। কারণ তিনিও তো মানুষ, ঈশ্বর নন। রোগীর প্রত্যাশার পরে প্রাপ্তি না পেলে শুরু হয় হতাশা। ডাক্তারের প্রতি অবিশ্বাসের আর আস্থাহীনতার শুরুটা এভাবেই। রোগীদের বিশেষ করে গ্রামের অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মানুষের বিশাল একটি অংশ চিকিৎসকের সামর্থ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। অনেকেই মনে করেন,হাসপাতালে ভর্তি সব রোগীই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। তাদের ধারণা চিকিৎসকদের কাছে সর্বরোগের সমাধান আছে। সত্যিকার অর্থে জটিল রোগে আক্রান্ত কিংবা কোন দুর্ঘটনায় দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোন রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয়না। অনেক জটিল রোগী যেমন স্ট্রোক, হৃদরোগী, কিডনি বা লিভার নষ্ট হয়ে গেলে, বণ্ডাড বা অন্যান্য অনেক ক্যান্সার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিরাময় যোগ্য নয়। মুমূর্ষু রোগীদের আই. সি. ইউ. তে ভর্তি করা হয়, সেখানে মৃত্যুর হারও বেশি। শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে চিকিৎসা দেয়া কখনই সম্ভব নয়। মৃত্যু অমোঘ, চিরন্তন। মৃত্যুর হাত থেকে চিকিৎসক কেন, কেউই বাঁচাতে পারবে না। চিকিৎসক শুধু রোগ নিরাময় আর রোগীকে রোগের উপশম দেবার চেষ্টা করতে পারেন। অথচ রোগীরা তা মানতে নারাজ। কেউ মারা গেলে স্বাভাবিকভাবেই আত্মীয় স্বজনরা আবেগ প্রবণ হয়ে চিকিৎসককে লাঞ্ছিত করে বসেন, হাসপাতাল বা ক্লিনিকে শুরু করেন ভাঙচুর, যা একান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত। যেহেতু হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট নেই,তাই বেশিরভাগ চিকিৎসককেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে

চিকিৎসা দিতে হয়। নিরাপত্তার এই সমস্যা শুধু গ্রামেই প্রকট নয়, বরং একই অবস্থা শহরের বড় বড় হাসপাতাল গুলোতেও। আবার অনেকের মানসিকতা হলো,উন্নত ভাল সেবা চাই, কিন্তু টাকা খরচ করতে চাই না। অথচ অন্য অনেক খাতে আমরা ঠিকই টাকা খরচ করি। এসবের কারণে ডাক্তার ও রোগীর মাঝে ভুল বোঝাবুঝি এবং দূরত্ব থেকেই যাচ্ছে।

যদিও রাজধানী বা বড় বড় শহর গুলোতে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কিছু ক্লিনিক বা হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসা সেবা চলছে, তবু দিনবদলের সাথে সাথে স্বাস্থ্যখাত কি সমানভাবে এগুতে পেরেছে? দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সরকারি খাত নিয়ে কথা বললে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোর কথাই সবার আগে আসে। সেখানে সেবা দানের সুযোগ কি খুব বেশী বেড়েছে? এখনও কি অপারশেন থিয়েটার গুলোতে নিয়মিত অপারশেন হচ্ছে? আধুনিক চিকিৎসাসেবা দেয়া কি সম্ভব হচ্ছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে? বাস্তব অবস্থা হলো,নানা কারণেই তা হয়নি। আমাদের দেশে রোগীর সংখ্যা বেশি, চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ও ঔষধপত্র সীমিত, ডাক্তারসহ অন্যান্য লোকবলও সীমিত। ফলে সত্যিকারের সেবা দান আসলেই সম্ভব হচ্ছে না। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোতে এখনও অধিকাংশ চিকিৎসার সুযোগ সুবিধাই অনুপস্থিত। এ অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়নি, তা নয়। হাসপাতাল ভবনের সম্প্রসারণ ও আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু রোগীর চাপও তো বেড়েছে সমান তালে। প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তির পরিমাণ আসলেই কম। হাজারো প্রতিকূলতা ঠেলে অজ পাড়াগাঁয়ের মানুষদের কাছে এখনও উন্নত স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছেনি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখনও পারেনি মেরুদ্রু সোজা করে দাঁড়াতে। তবু আশার কথা, কিছুটা হলেও প্রতিবছর লাখ লাখ রোগী এখান থেকে সেবা পাচ্ছেন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারছেন স্বজনদের কাছে। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি না পাওয়ায় অনেকের মাঝে অসন্তোষ থেকেই যাচ্ছে।

বেশীরভাগ হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোতে নড়বড়ে কিছু চেয়ার টেবিলে বসে চিকিৎসকরা সেবা দেন। নিয়ম কানুনও এখানে চেয়ার টেবিলের মতোই নড়বড়ে। এখনও আগের মতোই "নেই-নেই"এর ছড়াছড়ি। সীমিত বাজেটের বিপরীতে আকাশচুম্বী চাহিদার কাছে আমরা অনেকটাই অসহায়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রশিক্ষিত জনশক্তিও লাগে সমানতালে। সেখানে সীমাবদ্ধতা আরও বেশী। সার্জন নেই,অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট নেই, নার্স নেই, টেকনোলজিস্ট নেই, সুইপার নেই, নিরাপত্তারক্ষী নেই। প্রয়োজনের তুলনায় জনবলও কম। হাসপাতাল অপরিষ্কার থাকছে। প্রয়োজনের তুলনায় ঔষধ পত্রও কম। জরুরী সেবা কার্যক্রমও খুবই সীমিত। সব চলছে জোড়াতালি দিয়ে। সরকারী হাসপাতালে এসেও অধিকাংশ ঔষধ কিনতে হচ্ছে রোগীদের নিজ খরচে। খাবারের মান নিয়েও সমস্যা। চিকিৎসকদেরও প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটছে না। তাদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা নেই, নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। বিশেষ করে মহিলা ডাক্তারদের এগুলো আরও বেশি প্রয়োজন। এতো সীমাবদ্ধতা আর পশ্চাদ পদতা দেখে চিকিৎসকেরাও আগ্রহ খুঁজে পান না গ্রামে থেকে চিকিৎসা সেবা দিতে। এক সময় হতাশ হয়ে কর্মস্থল থেকে ট্রান্সফার নিতে চেষ্টা তদবির শুরু করেন। ফলে নড়বড়ে অবস্থা নড়বড়েই থেকে যায় সবসময়।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব সুবিদিত। চিকিৎসার জন্য সামান্য খরচের সামর্থ্য টুকুও অনেকের নেই। তাই নিরুপায় হয়ে চিকিৎসককে এড়াতে গিয়ে অপচিকিৎসার শিকার হন, দ্বারস্থ হন হাতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজ, ওঝা-বৈদ্য এমনকি ভণ্ড পীরদের কাছে। এই তথাকথিত গ্রাম্য চিকিৎসকেরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এন্টিবায়োটিক বা অপ্রয়োজনীয় ঔষধপত্র লিখে, এটা সেটা ভুলভাল বুঝিয়ে রোগীর কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় মোটা অংকের টাকা। অনেক রোগীর অবস্থা আরও জটিল হয়ে যায়, কখনও চলে যায় নাগালের বাইরে। এই অনিয়মের বিরুদ্ধে কে কথা বলবে? এমনকি আমাদের দেশে একটি কার্যকর রেফারাল সিস্টেম তৈরি হয়নি। ফলে সব রোগীকে যথাযথভাবে চিকিৎসকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে আনা সম্ভব না হলে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই অধগতি ঠেকানো অসম্ভব। জেলাসদর এবং বড় শহরের হাসপাতাল গুলোতে অবশ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেকটা ভালো। সীমাবদ্ধতা আর অনিয়ম থাকলেও বিশাল সংখ্যক রোগী এসব হাসপাতাল থেকে নিয়মিত সেবা পাচ্ছেন। সরকারি খাতে সবচেয়ে ভালো মানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এখানে মূলত চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের প্রাপ্যতা ও সেবার গুণগত মান তুলনামূলক ভাবে বেশি। অনেক ব্যয়বহুল আর জটিল অপারেশন এখানে হচ্ছে প্রায় বিনামূল্যে। যদিও অধিকাংশ

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গুলোতে মোট আসন সংখ্যার চেয়ে রোগী অনেক বেশি থাকে, তাই সীমিত বরাদ্দ থেকেই এতো বেশি রোগীকে সেবা দিতে গিয়ে বেশ হিমশিম খেতে হয়। সম্ভব হয়না কাঙ্ক্ষিত মানরক্ষা করা। অন্যদিকে বেসরকারি খাতে বর্তমানে স্বাস্থ্য খাতের প্রবৃদ্ধি দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে। বিগত কয়েক দশকে বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতের যে পরিবর্তন হয়েছে,তা চোখে পড়ার মতো। আধুনিক সব সুযোগ সুবিধা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে যেসব আধুনিক হাসপাতাল হচ্ছে, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতালের সাথে প্রতিযোগিতা করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন।

অনেক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য বিষয়ক সহস্রাব্দ অর্জনে বাংলাদেশের বেশ অগ্রগতি হয়েছে। দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার নেটওয়ার্ক। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাত্রারও ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো বিশ্বের উন্নয়নশীল অনেক দেশের জন্য মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনবল বৃদ্ধি, অবকাঠামোর উন্নয়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, পোলিও মুক্ত বাংলাদেশ, ওষুধের সরবরাহ বৃদ্ধি, কমিউনিটি ক্লিনিক চালু, শিশু স্বাস্থ্য পরিসেবা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্য পরিসেবা ব্যবস্থা, চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ, মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের জন্য ফ্রি চিকিৎসা ব্যবস্থা, টিকাদানে দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবার উন্নয়নে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, নতুন হাসপাতাল চালু, স্বাস্থ্য খাতে ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রম ইত্যাদি উন্নয়নমূলক অনেক উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছে। চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে যুগান্তকারী। আগে যেসব রোগে ভারত, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, আমেরিকার বিকল্প ছিলোনা,সেখানে এসব রোগের চিকিৎসা হরহামেশা দেশেই হচ্ছে। বিভিন্ন জটিল ও ব্যয়সাধ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা এখন যথেষ্ট কম খরচে হচ্ছে। বিভিন্ন হাসপাতালে অনেক জটিল রোগের চিকিৎসাসহ শত শত অপারেশন সফলভাবে করা হচ্ছে। এমনকি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট, হৃদরোগের বাইপাসসহ হার্টে রিং পরানো, বোনমেরো ট্রান্সপ্লান্ট, নিউরো সার্জারি ইত্যাদি অনেক আধুনিক চিকিৎসা উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশেই হচ্ছে। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, আমাদের দেশেও ভালো মানের এবং ভালো মনের চিকিৎসক অনেক আছেন, যদিও সংখ্যা খুব সীমিত।

কিন্তু এই উন্নয়নের ফাঁকতালে কিছু মুনাফা লোভী ব্যবসায়ী চিকিৎসা সেবার নামে লুটতরাজ আর দুর্নীতি যে করছে না,তা বলার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেভাবে দুর্নীতি বাসা বেঁধে আছে,তা স্বাস্থ্যখাতে থাকবে না, এমনটা আশা করা বাতুলতা। তবে এই দুর্নীতির জাল কিভাবে ছেঁড়া যায়, সেই ব্যাপারে সময়োপযোগী উদ্যোগ নেয়া জরুরী। কিছু কিছু নামীদামী হাসপাতালে চিকিৎসা খরচ এতই আকাশচুম্বী যে, গরীব নিম্নবিত্ত এমনকি অনেক মধ্যবিত্তের পক্ষেও সেখানে সেবা নেয়া অসম্ভব। দেখা যায়, অনেকেই না জেনে নামি দামী হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যান, কিন্তু চিকিৎসা শেষে যখন বিশাল অংকের বিল ধরিয়ে দেয়া হয়, তখন শুরু হয় অসন্তোষ এমনকি ভাংচুর। অনেক রোগীদের অভিযোগ, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার চাইতে চিকিৎসা বাণিজ্যই চলে বেশি। অনেকে ঐসব হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসেন, মনঃক্ষুন্ন হয়ে গালিটা চিকিৎসককেই দেয়া হয়। অথচ চিকিৎসক এজন্য মোটেই দায়ী নয়। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসা যখন হয় পণ্য, তখন তার গুনগত মান হয় নিম্ন।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যথাযথ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য শক্তিশালী ও বাস্তবমুখী কর্মপদ্ধতির অভাব দারুণ ভাবেই অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু এতোসব সীমাবদ্ধতা আর সংকটের মাঝেও বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাত দারুণ সম্ভাবনাময় একটি ক্ষেত্র। সঠিক দিক নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারলে, আন্তর্জাতিক মানের একটি উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। সম্প্রতি একটি জরিপে দেখা গেছে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাংলাদেশ অর্জন করেছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। এখন প্রয়োজন শুধু দুর্নীতি আর অনিয়মের জগদ্দল পাথরকে ধ্বংস করে দেশপ্রেমের আলোকে জাতিকে উজ্জীবিত করে সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে আপোষহীন পথচলা। জ্ঞানবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সঠিক ও সুন্দর পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে আমাদের সবাইকেই। বিশেষ করে আমরা যারা এই মহান পেশার সাথে জড়িত।

মানুষের জন্য বিজ্ঞান

নিজস্ব মেধায় আধুনিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও প্রয়োগ

ডঃ খোন্দকার সিদ্দিক-ই রব্বানী
অনারারী প্রফেসর (প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন)
বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্যোগের ইতিহাস, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে

১৯৭৮ সালে বিসিএসআইআর ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফিজিক্স বিভাগের সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানী ডঃ আবদুস সাত্তার সাইয়েদ এর অশীতিপর বাবা ভাঙা পা নিয়ে পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কাকতালীয়ভাবে ঐ সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে দেখানো হয় কিভাবে আমেরিকার একদল বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় দুরারোগ্য হাড়ের চিকিৎসায় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড সফলভাবে কার্যকরী হয়েছে। দেশে এ ধরণের গবেষণা করা যায় কিনা এ বিষয়ে পঙ্গু হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা আমেরিকা থেকে আসা ডঃ আর জে গার্ষ্ট এর সাথে কথা বলেন ডঃ সাইয়েদ। উত্তরে ডঃ গার্ষ্ট জানান যে এ গবেষণায় পদার্থবিজ্ঞানীদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে, ডাক্তারদের পক্ষে সম্ভব নয়। চির-উদ্যোগী ডঃ সাইয়েদ এ বিষয়ে যতটা সম্ভব খোঁজখবর নিয়ে নিজেরাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে তার সতীর্থ অধ্যাপক মোঃ শামসুল ইসলামকে সাথে নিয়ে উদ্যোগ নেন।

১৯৭৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে একটি পশুর রানের মাংস ও হাড়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড এর পরিমাপ করছেন (বাঁ দিক থেকে) ডঃ মোঃ শামসুল ইসলাম, ডঃ আবদুস সাত্তার সাইয়েদ ও ডঃ সিদ্দিক-ই রব্বানী

এর কিছুদিন আগেই আমি কমনওয়েল্থ বৃত্তির আওতায় যুক্তরাজ্য থেকে ইলেক্ট্রনিকসে পিএইচডি শেষে ঢাকা ফিরি। বিদেশে থাকা অবস্থায় আমি বুঝতে পারি যে পাশ্চাত্যের মানুষের উন্নত জীবনের পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে স্বকীয় প্রযুক্তি-ক্ষমতা। আর স্বকীয় প্রযুক্তি-ক্ষমতা তৈরী না হওয়ায় আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের মান এত পিছিয়ে আছে। দেশের পরিশ্রমী ও খেটে খাওয়া, না-খাওয়া সাধারণ মানুষের অর্থে আমি উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা লাভ করেছি, আমারই তো দায়িত্ব স্বকীয় প্রযুক্তি-ক্ষমতা ব্যবহার করে আমার দেশের মানুষের জীবনের মান উন্নীত করার চেষ্টা করা। বুঝতে পারি, পাশ্চাত্যের ভিন দেশী মানুষের দায়িত্ব সেটি নয়, এটি আমারই দায়িত্ব। তাই বিদেশে চাকুরীর লোভনীয় কিছু প্রস্তাব আর দেশে কোন চাকুরী না থাকা সত্ত্বেও সরাসরি দেশে ফিরে আসি অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সামনে রেখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের তদনীন্তন চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মুহতাশাম হোসেনের বিশেষ আনুকূল্যে বিভাগে একটি ছুটিজনিত সহকারী অধ্যাপক পদে সাময়িক নিয়োগ পেয়ে যাই এবং তার সাথে মিলে সৌর শক্তির প্রযুক্তি উন্নয়নে কাজে লেগে যাই। অধ্যাপক মুহতাশাম হোসেন যদিও নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন, তিনিও বুঝতে পেরেছেলেন যে দেশের মানুষের জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন না করলে বিজ্ঞান দেশের কোন কাজেই আসবে না, তাই তিনিও তার পরবর্তী জীবনে সৌর শক্তির প্রযুক্তিকেই বেছে নেন এবং বাংলাদেশে সৌর শক্তির উন্নয়নে তার অগ্রণী অবদান ইতিহাস হয়ে গেছে।

এদিকে ডঃ সাইয়েদ ও অধ্যাপক ইসলাম এর গবেষণায় ইলেক্ট্রনিকসের পারদর্শিতার প্রয়োজন হয়, তাই অধ্যাপক ইসলাম আমাকে ডাকেন তাদের কাজে কিছু সহায়তা করার জন্য। এভাবে আমরা তিনজন মিলিত হই এবং বাংলাদেশে মেডিকেল ফিজিক্স ও বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গবেষণার একটি সফল সূত্রপাত হয়। আমার দায়িত্ব ছিল একটি নির্দিষ্ট ধরণের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক উত্তেজনা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রনিক সার্কিট তৈরী করা, যা আমি অল্প সময়েই করে ফেলি। বিসিএসআইআর এ ডঃ সাইয়েদ এর দলের জনাব আশরাফ সেটির একটি যথাযথ খোলস ও প্রয়োজনীয় উত্তেজক কয়েল তৈরী করে হাসপাতালের উপযোগী করে তোলেন। পঙ্গু হাসপাতালে ডঃ সালেক তালুকদার ও তার দলের সাথে সম্মিলিতভাবে (পরবর্তীতে ডঃ রুহুল হকও সাথে যুক্ত হন) ১৬ জন রোগীর উপর পরিচালিত এ গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সফলতা আসে। পরবর্তী পর্যায়ে এ প্রযুক্তির কার্যকরণ ভালভাবে বোঝার জন্য ডঃ সাইয়েদ পিজি হাসপাতালে প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ও তার দলকে সম্পৃক্ত করেন। সেখানে অনেকগুলো ইঁদুর একসাথে নিয়ে গবেষণা চালাতে হবে, তাই ৩৬টি ইঁদুরকে একসাথে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক উত্তেজনা দেবার জন্য একটি যন্ত্র ডিজাইন ও তৈরী করি। এ গবেষণায় বেশ ভাল তথ্য পাওয়া যায় এবং কয়েকজন ডাক্তার এর মাধ্যমে এম ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। পাশাপাশি ১৯৮১ সন থেকে অধ্যাপক ইসলামের উদ্যোগে আমরা সংশ্লিষ্ট গবেষণায় বিভাগে এমএস থিসিস দেয়া শুরু করি এবং প্রতি বছর চার পাঁচজন ছাত্র আমার সাথে কাজ করতে থাকে।

১৯৮২ সনের দিকে অধ্যাপক ইসলাম এ গবেষণার উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। সেখানে উপস্থিত শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বি এইচ ব্রাউন অবাক হয়ে জানান যে তাদের বিভাগেও একই কাজ হচ্ছে এবং চাইলে একটি যৌথ উদ্যোগ নেয়া যায়। অধ্যাপক ইসলাম ও অধ্যাপক ব্রাউন এর উদ্যোগে তদনীন্তন ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (বর্তমানে ডিএফআইডি) অর্থায়নে এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় ৩ বছরের জন্য একটি লিংক প্রোগ্রাম চালু হয়। এতে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেন তদনীন্তন বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক হিরন্ময় সেনগুপ্ত। অধ্যাপক ইসলামের সুদূরপ্রসারী চিন্তায় একই সময়ে এ প্রোগ্রামের আর একটি শাখা চালু হয় বৃটেনের বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে, বায়োফিজিক্স বিষয়ে। সেখানকার নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক লুইস জনসন, যার আর এক পরিচয় হচ্ছে তিনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক আবদুস সালামের স্ত্রী। মেডিকেল ফিজিক্স প্রোগ্রামে শেফিল্ডের সাথে যে কয়েকজন বিভিন্ন দিকে গবেষণার জন্য যুক্ত হন, তাতে ছিলেন অধ্যাপক কামরুন নেসা ইসলাম, অধ্যাপক আহমেদ শফি, অধ্যাপক শফী চৌধুরী, অধ্যাপক ফারুক আহমেদ, জনাব সালেহ মোঃ জাহাঙ্গীর এবং আমি। অপর দিকে বায়োফিজিক্স প্রোগ্রামে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত হন অধ্যাপক আহমেদ শফি, অধ্যাপক আসাদুর রহমান এবং অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী। অধ্যাপক ইসলামের সুদূরপ্রসারী ভাবনায় এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৮৩ থেকে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে 'বায়োফিজিক্স এন্ড মেডিকেল ফিজিক্স' নামে একটি তত্ত্বীয় কোর্স চালু হয় যা ২০০৮ পর্যন্ত নিয়মিত চলে এবং এ সময়ে প্রায় ৯০ জন ছাত্র এ বিষয় দুটির উপর মাষ্টার্স থিসিস করে। এর মধ্যে প্রায় ৮০ জনই ছিল আমার তত্ত্বাবধানে, মেডিকেল ফিজিক্স এবং বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে।

১৯৮৫ সালে ঢাকার বারডেমকে সাথে নিয়ে অধ্যাপক ইসলাম বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা থেকে একটি গবেষণা প্রকল্পের জন্য অনুদান জোগাড় করতে সক্ষম হন যেটি হাড়ের যান্ত্রিক অনুনাদের উপর আমাদের একটি মৌলিক গবেষণা করতে সাহায্য করে। এ গবেষণার প্রাথমিক ধারণা দেন অধ্যাপক কামরুন নেসা ইসলাম, ও এতে সম্পৃক্ত ছিলেন তদনীন্তন ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফারুক আহমেদ, তার দুজন সুযোগ্য ছাত্র এবং আমি। আমরা সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তায় এর জন্য একটি সফল যন্ত্র তৈরী করে বেশ কিছু মানুষের উপর পরিমাপ করতে সক্ষম হই।

শেফিল্ডের সাথে যোগাযোগটি আমার জন্য ছিল একটি বড় পাওয়া। আমি নিজ হাতে গবেষণার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করছিলাম। আমার আগ্রহ দেখে শেফিল্ডের বিজ্ঞানীরা নিজেদেরকে উজাড় করে আমাকে শেখায়। আমাদের সফলতার প্রেক্ষিতে শেফিল্ডের সাথে লিংক প্রোগ্রামটি কয়েকধাপে বর্ধিত হয়ে দশ বছর চলে, যার ফলে দেশে একটি সক্ষমতা গড়ে

তুলতে পারি। আমি ধারণা করি যে ইলেকট্রিকাল ও ইলেক্ট্রনিকস প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি দেশে তৈরী করা সম্ভব, তাই যে গবেষণায় এ বিষয়দুটির সম্পৃক্ততা বেশী সেগুলোই আমাদের জন্য উপযুক্ত হবে। যে কোন যন্ত্রকে, বিশেষ করে মানুষের শরীরের স্নায়বিক পরিমাপের জন্য কম্পিউটারের সাথে ইন্টারফেস করার প্রযুক্তিটি আমাকে উৎসাহিত করে। ১৯৮৫ তে শেফিল্ডে আমার দুমাস ভিজিটের সময়টিকে আমি কাজে লাগাই এ প্রযুক্তিটি আয়ত্ত করতে। তাদের একটি পুরোনো 'বিবিসি কম্পিউটার' আমাকে বিনামূল্যে দিয়ে দেয়। সেটি নিয়ে আমি দেশে কাজ করতে থাকি ও কিছু স্নায়বিক পরিমাপ করি। দেশের প্রসিদ্ধ নিউরোলজীর অধ্যাপক এম এ মান্নান এ জন্য অনেক উৎসাহ যুগিয়েছেন, কারণ দেশে তখন এ ধরণের কোন চালু চিকিৎসা যন্ত্র ছিল না। তিনি বিদেশ থেকে অনুদানের মাধ্যমে একটি যন্ত্র এনেছিলেন। যন্ত্রটি ছিল পুরোনো প্রযুক্তির এবং সেটি ব্যবহার করে তারা কোন পরিমাপ করতে পারেন নি। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে ৬ মাসের জন্য শেফিল্ড গিয়ে আমি সেখানকার বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়ে হাসপাতালে ব্যবহারোপযোগী একটি পরিমার্জিত যন্ত্র তৈরী করি যেটি সাধারণতঃ ইএমজি/ইভোক্ ড পোটেনশিয়াল যন্ত্র নামে পরিচিত। এটি দিয়ে স্নায়ুর সঙ্কেত আদান প্রদানের গতি, মস্তিস্কের সঙ্কেত বা 'ইইজি' এবং মস্তিস্কের ইভোক্ ড পোটেনশিয়ালও মাপা যেত। পাশাপাশি সফটওয়্যার পরিবর্তন করে ইসিজিও মাপা যেত। এর পর একটি পুরোনো বিবিসি কম্পিউটার নিজেই কিনে নিয়ে আসি এবং নার্ভ কনডাকশন পরিমাপের সফটওয়্যারটিকে হাসপাতালের উপযোগী করে গড়ে তুলি। এ যন্ত্রটি ব্যবহার করে আমার বাসায় রোগ নির্ণয় সেবা দিতে শুরু করি সেই ১৯৮৮ সাল থেকেই। অধ্যাপক মান্নান এবং নিউরোসার্জারী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রশিদউদ্দীন আহমেদ আমার কাছে রোগী পাঠাতেন এবং আমার পরিমাপের অভিজ্ঞতাকে বাড়িয়ে নিতে তারা অনেক সাহায্য করেছেন ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমার এ প্রচেষ্টা বাংলাদেশে দুটো 'প্রথম' অভিহিত হবার যোগ্যঃ ১) বাংলাদেশে কমপিউটার ভিত্তিক কোন যন্ত্র তৈরীতে, এবং ২) নার্ভ কনডাকশন রোগ নির্ণয়ের জন্য সেবা প্রদানে।

১৯৮৮ সনে তৈরী ডঃ রব্বানীর তৈরী বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটারাইজড ইএমজি/ইভোকড পোটেনশিয়াল/ ইইজি/ ইসিজি যন্ত্র।

পরে দেশের বড় কয়েকটি সরকারী হাসপাতালে স্থানীয়ভাবে এ যন্ত্র তৈরী করে স্থাপন করার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করি, কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও তা সফল হয় নি। ১৯৯২ এর দিকে ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মোহাম্মদ ইব্রাহিম বারডেমে আমাদের যন্ত্র ব্যবহার করে ডায়াবেটিক রোগীদের উপর স্নায়বিক পরীক্ষা চালাবার জন্য একটি সুযোগ করে দেন যেখানে আমরা প্রায় দুবছর কাজ করে অনেক তথ্য সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করি। ১৯৯৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ প্রথম ন্যাশনাল ফেলোশিপ ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রকল্প শুরু করে এবং প্রথম পর্যায়েই আমি তা পাই যা স্নায়বিক পদ্ধতিটি নিয়ে আমাকে আরও কাজ করতে সাহায্য করে। সে সময়ে অধ্যাপক মান্নানের নিউরোলজী ফাউন্ডেশনের আনুকূল্যে সেখানে যন্ত্রটি স্থাপন করে আমরা ছাত্রদেরকে নিয়ে একাধারে গবেষণা ও রোগীদেরকে রোগ-নির্ণয় সেবা দিতে থাকি। এর মূল যন্ত্রটি ১৯৮৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত একটানা ব্যবহার করা হয়েছে, অবশ্য কম্পিউটার ও সফটওয়্যার পরিবর্তন করে। বিদেশী যন্ত্রে এমনটি সম্ভব হত না।

১৯৯২ সালে শেফিল্ডের সাথে যৌথ লিংক প্রোগ্রামটি শেষ হয়। এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত সক্ষমতা নিয়ে নিজের মত করে ভেবেচিন্তে ধীরে সুস্থে কাজ করার সুযোগ পাই তখন। এর ফলে এমন কিছু উদ্ভাবন করতে পারি, যেগুলিকে ছোটখাট আবিষ্কার বলা চলে এবং পরবর্তীতে এ উদ্ভাবনগুলো আমাদেরকে আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিত করে তোলে। আমাদের এ প্রচেষ্টাগুলির সফলতার প্রেক্ষিতে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ ২০০০ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে প্রস্তাব পাঠায় গবেষণার উপর

জোর দিয়ে একটি আলাদা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ সৃষ্টি করার। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালে 'বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি' নামে নতুন একটি পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগ স্থাপিত হয়, এবং প্রথম চেয়ারপার্সন হিসেবে এ বিভাগকে গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে।

নতুন বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ প্রতিষ্ঠা, তার দর্শন ও লক্ষ্য

নতুন গড়া এ বিভাগের আমরা প্রথমেই জোর দিয়েছি পিএইচডি গবেষণার উপর। বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকদের তরফ থেকে বেশ চাপ ছিল প্রথমেই মাষ্টার্স প্রোগ্রাম খোলার জন্য, কারণ তারা বাস্তবতার নিরিখে দেশে পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। এর বিপক্ষে যুক্তি হিসেবে আমি বলেছি যে প্রথমতঃ, এ বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন, মাষ্টার্স চালু করতে গেলে যে প্রয়োজনীয় শিক্ষক লাগবে তা কোথায় পাব? থিসিস কে তত্ত্বাবধান করবে? দ্বিতীয়তঃ, এমএসসিতে এক বছর কাজ করেই এদেরকে চলে যেতে হয়। কোন বিজ্ঞান বিষয়ের গভীরে যাওয়া বা একটি প্রযুক্তিকে চুড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া এত অল্প সময়ে সম্ভব নয়। আমার সাথে এর আগে ৮০ জনের মত এমএসসি ছাত্রের থিসিস করার অভিজ্ঞতায় জানাই যে তাদের গবেষণা প্রচেষ্টা থেকে পাওয়া সব ফলাফল, ধারণা ও অভিজ্ঞতা আমার একার মস্তিষ্কে ধারণ করে পরবর্তীতে নতুন আর একজনকে শিখিয়ে একটু একটু করে এগোতে হচ্ছিল। এভাবে গবেষণাকে ধরে রাখা যাবে না, বেশীদূর এগিয়েও নেয়া যাবে না। যদিও প্রথমদিকে দেশের পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে ছাত্রদের দ্বিধা ছিল, কিন্তু অল্প অপেক্ষার পরই বিপুল সাড়া পড়ে, এমনকি পরবর্তীতে অনেককে ফিরিয়ে দিতে হয়, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী আমি একক তত্ত্বাবধানে ৮ জন এবং যৌথ তত্ত্বাবধানে ১০ জনের বেশী পিএইচডি ও এমফিল ছাত্র একবারে নিতে পারি না। প্রায় চার বছর ধরে এভাবে চালিয়ে বেশ কিছু ছাত্রকে তৈরী করি যারা পরবর্তীতে নেতৃত্ব দিতে পারে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ থেকে আমরা বিভাগে মাষ্টার্স কোর্স চালু করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগে যারা থিসিস করে তাদেরকে প্র্যাকটিকাল ক্লাসের পরীক্ষণ করতে হয় না। এতে এদের মধ্যে একটি দুর্বলতা থেকে যায় আমি লক্ষ্য করেছি। তাই আমাদের বিভাগে মাস্টার্সের সব ছাত্রকেই প্র্যাকটিকাল পরীক্ষণ ও থিসিস দুটোই করতে হয়, এবং তার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক আমরা পেয়ে গেছি আমাদেরই সিনিয়র পিইচডি ছাত্রদের মাধ্যমে, যারা খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করেছে। পরবর্তীতে দেশের স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে আমরা ২০১৫ থেকে আলাদা 'মেডিকেল ফিজিক্স' এবং 'বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং' শাখা চালু করি। মেডিকেল ফিজিক্স শাখাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের রেডিওথেরাপী এবং নিউক্লিয়ার মেডিসিন চিকিৎসার জন্য মানব সম্পদ গড়ে তোলা, কারণ ক্যানসার চিকিৎসায় এ দুটি শাখার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং ইতিমধ্যে বেশ কিছু হাসপাতালে তা চালু হয়েছে। আর বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার প্রয়োজনীয়তা দুটি, প্রথমটি হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য সাধারণ মানুষের কাছে আধুনিক চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য দেশেই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও তৈরী করা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হাসপাতালে যেসব আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে, এসব যন্ত্রপতি কেনার জন্য যাচাই বাছাই করা থেকে স্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যবস্থা করে তা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ তৈরী করা।

গবেষণার ফলাফলকে ছড়িয়ে দেয়া

নতুন গড়া এ বিভাগের সব সময়েই মূল লক্ষ্য ছিল বেশীরভাগ মানুষের কল্যাণ। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি যদি মানুষের উপকারেই না আসে, তাহলে এ গবেষণায় কি লাভ? দেশে যেহেতু এ ধরণের নতুন প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি তৈরী করে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয় করার মত কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান নেই, তাই আমরা নিজেরাই উদ্যোক্তা হয়ে এসব প্রযুক্তির সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কঠিন কাজটিও হাতে নিই, আর তাও কোন আর্থিক বিনিয়োগ ছাড়া। আবার যেসব প্রযুক্তির পণ্য জনগণ নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারবেন, বা তাদের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে জনগণের কাছে প্রযুক্তি পৌঁছে দেয়ারও উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আমরা নিজেরাই। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কেবলমাত্র মেধা, একাগ্রতা ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে আমাদের এ দলটি তার কাজের সফলতার মাধ্যমে আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মোটামুটিভাবে পরিচিত।

আমাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির কিছু নমুনা

পায়ের ছাপের গতিময় ছবির জন্য ডায়নামিক পেডোগ্রাফ

আমাদের উদ্ভাবন ও তৈরী করা কয়েকটি আধুনিক ও জটিল চিকিৎসা যন্ত্র গত প্রায় দু-তিন দশক ধরে দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, প্রতিবেশী দুটি দেশেও ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি নিয়ে উন্নত বিশ্বে গবেষণা শুরু হয়েছে, উন্নত দেশ থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে এসে স্নাতোকোত্তর গবেষণার কাজ করতে শুরু করেছে। অতিরিক্ত হাত পা ঘামার নিরাময়ের জন্য ঘরে বসেই চিকিৎসা নেয়ার জন্য একটি যন্ত্র তৈরী করে আমরা রোগীদেরকে সরাসরি সরবরাহ করে আসছি প্রায় ২০ বছর ধরে। দেশের ফিজিওথেরাপিষ্টরা আমাদের তৈরী 'মাস্ ল এন্ড নার্ভ স্টিমুলেটর' ব্যবহার করে আসছেন, এটিও আমরা দিচ্ছি ১৫ বছরেরও বেশী সময় ধরে। বারডেমে একটি সম্মেলনে আমার বক্তৃতা শুনে পাকিস্তানের করাচীর একজন ডায়াবিটিস এর ডাক্তার আমাকে জিগ্যেস করেন পায়ের চাপের বিন্যাসের ছবি পাওয়ার একটি যন্ত্র কম খরচে বানানো যায় কিনা। ডায়াবেটিক রোগীদের পায়ে স্নায়বিক বৈকল্য থাকায় তারা ব্যথা টের পান না, ফলে অনেক সময় পায়ের নীচে ঘা হয়ে গ্যাংগ্রীনে রূপান্তরিত হয়, তখন পা কেটে ফেলতে হয়। আগে থেকেই পায়ের চাপের বিন্যাসের ছবি পেলে রোগীকে আগে থেকেই সাবধান করে দেয়া যায় বা এ চাপের ছবির উপর নির্ভর করে বিশেষ জুতো তৈরী করে দেয়া যায়। শেফিল্ডে একটি প্রযুক্তি নিয়ে কাজ হচ্ছিল দেখেছিলাম, সেটিকে অনুসরণ করে নিজেদের মত করে বানিয়ে দিলাম ডায়নামিক পেডোগ্রাফ নামের এ যন্ত্রটি, বিদেশী যন্ত্রের তুলনায় এক দশমাংশ খরচে। ২০১০ থেকে করাচীর হাসপাতালে সেটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে সেখানে আরও দুটি, বাংলাদেশে দুটি ও শ্রীলংকায় একটি করে যন্ত্র বানিয়ে দিয়েছি আমরা।

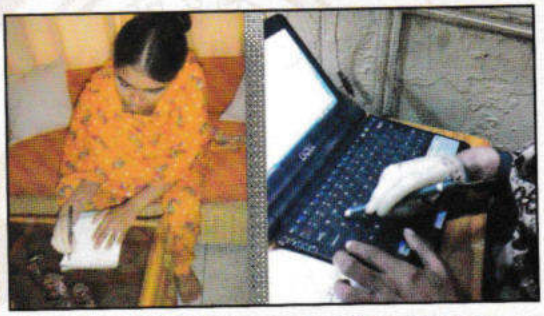

পোষাক প্রদর্শনীর পুতুল বা ম্যানিকিন এর হাত থেকে তৈরী আংশিক কার্যক্ষম কৃত্রিম হাত

ফুটপাথে পড়ে থাকা রঙিন টেপে মোড়া একটি বোমা নিয়ে দরিদ্র একটি শিশু খেলতে গেলে তার হাতটি উড়ে যায়। এখন সে বড় হয়েছে। কম খরচে তাকে কিছুটা কার্যক্ষমতা কি ভাবে দেয়া যায়? আবার দেখতেও যেন আসল হাতের মত লাগে। হঠাৎ করে মাথায় এল পোষাক প্রদর্শনীর পুতুল বা ম্যানিকিনের হাত ব্যবহার করা যায় কিনা। এর একটি হাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে স্প্রিং এর সাহায্যে ফের লাগিয়ে দিলাম। মেয়েটির কাটা হাতে এটি পরিয়ে দিয়ে একটি কলম ধরিয়ে দিলে তাৎক্ষণিক লিখতে পারল কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই। কম্পিউটারেও টাইপ করতে পারল। নিজের মস্তিস্ক থেকেই নিয়ন্ত্রণ করে বুড়ো আঙুলটি যেন খুলতে পারে এজন্য হাতের মাংসপেশী নিয়ন্ত্রিত একটি কৃত্রিম হাত তৈরীতেও আমরা বেশ এগিয়েছি।

নার্ভ কনডাকশন বা স্নায়ু সঙ্কেতের গতিবেগ পরিমাপের গবেষণার সময়ে প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর কিছু সীমাবদ্ধতা আমাদের চোখে পড়ে যার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে আমরা 'ডিস্ট্রিবিউশন অফ এফ-লেটেন্সী (DFL)' নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন স্নায়বিক পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন করি। একটি স্নায়ুর ভিতর কয়েক হাজার স্নায়ুতন্তু বা 'ফাইবার' থাকে, তাদের সঙ্কেতের গতিবেগও ভিন্ন ভিন্ন। এ গতিবেগের বিস্তার বা 'ডিস্ট্রিবিউশন অফ কনডাকশন ভেলোসিটি (DCV)' পরিমাপ অনেক রোগ নির্ণয়ে জরুরী, কিন্তু হাসপাতাল বা ক্লিনিকে এর পরিমাপ করার মত কোন পদ্ধতি আগে আবিষ্কৃত হয় নি। আমাদের উদ্ভাবিত DFL থেকে খুব সহজেই DCV বের করা গেছে, যার জন্য এর গুরুত্ব অনেক। পাশাপাশি আমরা এমন একটি পদ্ধতি খুঁজে বের করেছি যার ফলে হাতে বা পায়ে DFL-এর পরিমাপ করে আমরা খুব সহজেই যথাক্রমে ঘাড়ে ও

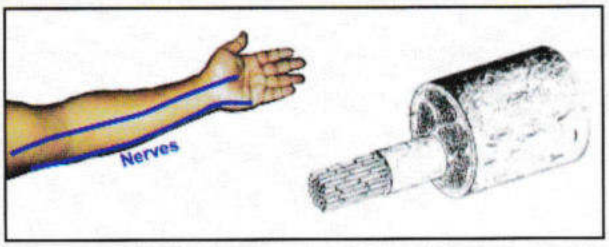

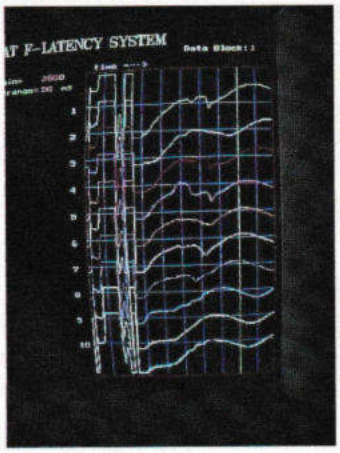

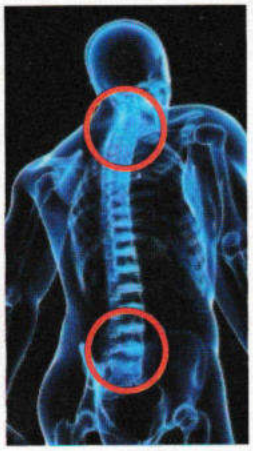

শরীরের এক একটি নার্ভ বা স্নায়ুতে কয়েক হাজার স্নায়ুতন্তু বা ফাইবার থাকে। এদের বিন্যাস বা 'ডিষ্ট্রিবিউশন অফ কনডাকশন ভেলোসিটি (DCV)' নির্ণয়ে আমাদের আবিষ্কৃত 'ডিস্ট্রিবিউশন অফ এফ-লেটেন্সী (DFL) সফল হয়েছে। পাশাপাশি এর ব্যবহারে ঘাড় ও কোমরের ব্যথায় স্নায়ুর সমস্যা আছে কিনা তা সনাক্ত করার জন্য আমরা এর কিছু প্যাটার্ন খুঁজে পেয়েছি যা ৮০% ক্ষেত্রে সঠিক ফলাফল দিয়েছে।

কোমরে স্নায়ুর চাপ আছে কিনা যথেষ্ট নিশ্চয়তার সাথে সনাক্ত করতে পারি। এ অবস্থা নির্ণয়ের জন্য বর্তমানে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা হচ্ছে MRI বা ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং এবং এর পরিমাপের সাথে তুলনায় আমাদের পদ্ধতিটি প্রায় ৮০% ক্ষেত্রে সঠিক রোগ নির্ণয় করেছে। ঘাড়ের ও কোমরের স্পন্ডিলোসিস সাধারণতঃ উপরোক্ত ব্যথার কারণ, আর পৃথিবীতে এ রোগেই সবচেয়ে বেশী মানুষ ভোগে। MRI যন্ত্রটি আকারে বিশাল, আর দামের দিক থেকেও তা আকাশচুম্বী-কোটি কোটি টাকা। আমাদের যন্ত্রটি সম্পূর্ণ বহনযোগ্য করা সম্ভব আর এর খরচও অনেক অনেক কম। তাই আমরা আশাবাদী যে স্নায়বিক রোগ নির্ণয়ে DFL একটি যুগান্তকারী ভুমিকা রাখবে। সিঙ্গাপুরে ২০০৯ সালে এ নিয়ে গবেষণা হয়েছে এবং যুক্তরাজ্যের নটিংহামে DFL নিয়ে ইদানীং একটি পিএইচডি গবেষণাও হয়েছে।

আমাদের উদ্ভাবিত অপর একটি প্রযুক্তির নাম দিয়েছি 'ফোকাস্ ড ইম্পিড্যান্স মেথড (FIM)' ও তার একটি সম্প্রসারিত রূপকে 'পিজিওন হোল ইমেজিং (PHI)'। এ দুটিই বৈদ্যুতিক বাধা বা ইম্পিড্যান্স পরিমাপকে নিয়ে কাজ করে। শরীরের সমস্ত কোষেই বিদ্যুতের বিশেষ বিশেষ ধর্ম রয়েছে, তাই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকারণ ও রোগ নির্ণয়ে বৈদ্যুতিক ইম্পিড্যান্স এর সম্ভাবনা অনেক। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ শরীরের ভিতর চারদিকে ছড়িয়ে যায়, তাই

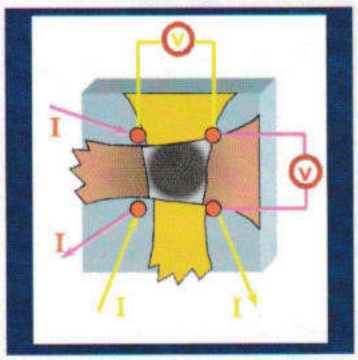

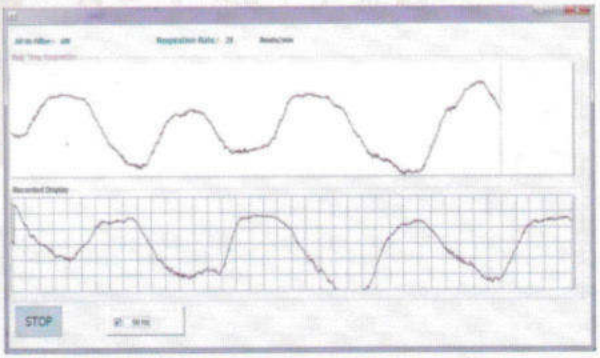

ফোকাস্ড ইমপিড্যান্স পরিমাপের আমাদের আবিষ্কৃত ৩টি ব্যবস্থার একটি (বাঁয়ে), যেখানে ৪টি ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয়েছে; মাঝের গাঢ় রঙের অঞ্চলের পরিমাপ পাচ্ছি এটি দিয়ে। একটি শিশুর বুকে মা ধরেছেন এর জন্য নরম রাবারে তৈরী বিশেষ ইলেকট্রোড (মাঝে)। শিশু কাঁদে নি, আমরা পেয়ে গেছি তার শ্বাস প্রশ্বাসের পরিমাপ (ডানে)।

কোন বিশেষ অঙ্গকে নির্দিষ্ট করে পরিমাপ করা কঠিন। শেফিল্ডের অধ্যাপক ব্রাউন ইলেকট্রিকাল ইম্পিড্যান্স টোমোগ্রাফী নামে একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন গত আশির দশকে, যা এর কিছুটা সমাধান দিয়েছে, কিন্তু পদ্ধতিটি বেশ জটিল ও ব্যয়বহুল। পক্ষান্তরে আমাদের উদ্ভাবিত FIM ও PHI পদ্ধতি দুটো অনেক সহজ ও স্বল্প খরচের। শরীরের এক বা একাধিক অঞ্চলের বৈদ্যুতিক ইম্পিড্যান্সকে আলাদা করে মেপে শরীরের ভিতরের অঙ্গের কার্যকারিতা নির্ণয় করে রোগ নির্ণয়ে এ পদ্ধতিগুলো সাহায্য করতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রও নিজেরাই তৈরী করেছি, যার ফলে তা তৃতীয়

বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যাবে সুলভে। এমনকি শিখিয়ে দিলে সে সব দেশের বিজ্ঞানীরা নিজেরাই তা তৈরী করে নিতে পারবে। FIM ব্যবহার করে আমরা ফুসফুসের অংশবিশেষের কার্যকারিতা, পাকস্থলীর খাদ্য হজমের সময়, ইত্যাদি পরিমাপ করতে পারি। ব্রেষ্ট টিউমার ধরা পড়ার পর তা ক্যানসারযুক্ত কিনা প্রমাণ করার জন্য বর্তমানে শরীরে ফুঁটো করে বায়োপ্সি করতে হয়। FIM ও PHI ব্যবহার করে শরীরের বাইরে থেকেই এ প্রমাণটি করার জন্য আমাদের গবেষণায় সফলতার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। শিশুদের নিউমোনিয়া সনাক্ত করার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের হারের পরিমাপ খুব জরুরী, কিন্তু যন্ত্রপাতি গায়ে লাগালে শিশু কেঁদে ওঠে তাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়। আমাদেরকে একজন বিদেশী ডাক্তার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, বাচ্চাকে না কাঁদিয়ে এর পরিমাপের ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। আমরা নরম রাবারে ইলেকট্রোড লাগিয়ে মায়েদের হাতে লাগিয়ে দিলাম, তারা যার যার বাচ্চার বুকে ধরলেন, বাচ্চা কাঁদল না, শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিমাপ আমরা ঠিকই পেয়ে গেলাম।

যুক্তরাজ্যের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয় এবং নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইদানীং পিএইচডি গবেষণায় FIM ব্যবহার করা হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার কিউং-হী বিশ্ববিদ্যালয়েও FIM ও PHI নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। ১৯৯৮ সালে স্পেনের বার্সিলোনাতে বায়োইম্পিড্যান্সের একটি সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠালে অবাক হয়ে দেখি আমাকে তারা আমন্ত্রিত বক্তা করেছে, আর সেটি ছিল সম্মেলনের ক্লোজিং সেশনের একমাত্র বক্তৃতা। যার সঙ্গে পরিচয় হয় সেই জিজ্ঞেস করে, 'তুমিই বাংলাদেশ থেকে এসেছ?' পিছিয়ে থাকা একটি দেশের একজনের বক্তৃতা অনুষ্ঠানসূচীর ক্লোজিং সেশনে দেখে স্বভাবতঃই সবার বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলাম। উদ্বোধনের সময় কনফারেন্স চেয়ার বললেন যে বায়োইম্পিড্যান্স তৃতীয় বিশ্বের জন্য খুবই উপযোগী একটি প্রযুক্তি এবং তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশে এ নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে তাই তাদের একজনকে ক্লোজিং সেশনের বক্তা রাখা হয়েছে। বক্তৃতা শুরু করতে কিছু কারিগরী সমস্যার কারণে প্রায় বিশ মিনিট দেরী হয়ে যায়, তখনকার ফ্লপি ডিস্ক থেকে অনুষ্ঠান হলের কম্পিউটারে বক্তৃতাটি ঢোকানো যাচ্ছিল না, পরে একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্যে বেশীরভাগই ঢোকানো সম্ভব হয়। ঘন্টাখানেকের বক্তৃতা শেষ হলে 'Bravo-Bravo' বলে তুমুল করতালি। দর্শকদের মধ্য থেকে সামনে এগিয়ে এলেন বায়োফিজিক্সের অগ্রনায়ক, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জনক, অশীতিপর বিজ্ঞানী অধ্যাপক হারম্যান পি শোয়ান ও তার স্ত্রী। তারা বললেন, 'শুরুতে সমস্যার কারণে চলে যেতে চাচ্ছিলাম, এখন মনে হচ্ছে থাকাটা কাজে লেগেছে, চলে গেলে অনেক কিছু মিস করতাম' এ কথাটি আমার জন্য ছিল একটি বড় পাওয়া।

সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা ২০১১ থেকে নার্ভ কনডাকশন ও বায়োইম্পিড্যান্স গবেষণার জন্য গবেষণা অনুদান পেয়ে আসছি। কয়েক বছর পর পর নবায়নের জন্য আমাদের রিপোর্ট কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়, আবার একটি সভায় তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হয়। এদের একজন হচ্ছেন সুইডেনের Linkoping বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ম্যাগনাস উইল্যানডার, যার ৮৫০ এর উপর প্রকাশনা আছে। একদিন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, FIM এর ধারণাটি কার?' উত্তর দিলাম 'আমারই'। তিনি বললেন, 'একশ বছর পরও মানুষ তোমাকে মনে করবে'।

সুইডেনের ছাত্রী এরিকা আমাদের সাথে সোলার পাম্পরাইজার নিয়ে গবেষণা করছে (বাঁয়ে)। ঢাকার একটি বস্তিতে আমাদের যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে (ডানে)।

আমাদের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হচ্ছে সূর্যের কিরণে খুব অল্প খরচে, এবং সহজ প্রযুক্তিতে পানিকে জীবাণুমুক্ত করে পানের জন্য নিরাপদ করা। এখন এটি বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত যে ডায়রিয়ার জীবাণু ধ্বংস করতে হলে পানিকে ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফোটানোর প্রয়োজন নেই, এর থেকে কম অর্থাৎ, ৬০ বা ৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানিকে কিছুক্ষণ রাখতে পারলেই হল, যাকে বলা হয় পাস্তুরাইজেশন। আমরা খড়, বাঁশের ডালা, কালো রং, স্বচ্ছ পলিথিন ব্যাগ ও শীট ব্যবহার করে একটি সৌর-পাস্তুরাইজেশন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছি যেটি 'গ্রীন হাউস এফেক্ট' ব্যবহার করে ৫ লিটার পানিকে উল্লিখিত তাপমাত্রায় সহজেই নিয়ে যেতে পারে মাত্র দু ঘন্টার রোদে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, গ্রামের মানুষ নিজেরাই তৈরী করতে পারবেন এ যন্ত্রটি, মাত্র কয়েকশত টাকায়। দিনে দুবার ব্যবহার করে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ করে নিতে পারবেন। অপর একটি সহজ ব্যবহারযোগ্য ডিজাইনে আমরা ব্যবহার করেছি প্যাকিং এর কাজে ব্যবহার করা পলিস্টাইরিন ফোম, কর্কশীট নামে যা বাংলাদেশে বেশী পরিচিত। একটু খরচ বেশী পড়লেও এতে প্রায় দ্বিগুণ পানিকে একই সময়ে পানের জন্য নিরাপদ করা যায়। নদ-নদী, খাল-বিল-পুকুরের পানিকে এ ভাবে জীবাণুমুক্ত করলে আর্সেনিকের ক্ষতি থেকেও বাঁচা যাবে কারণ এসব পানিতে আর্সেনিক নেই, আর্সেনিক থাকে মাটির নীচে গভীরে, নলকূপের পানিতে। আর বন্যার সময়ে বন্যার পানিকেই ছেঁকে নিয়ে এভাবে পাস্তুরিত করে পান করা যায়। সারা পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ তৃতীয় বিশ্বের গ্রামে বাস করে যারা এখনও নিরাপদ পানি পাচ্ছে না। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধান করে নিতে পারবেন, সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক মুহাম্মদ ইব্রাহিমের পরিচালিত একটি সংগঠন আমাদের এ পদ্ধতিটি বরিশালের বেদেদেরকে শিখিয়ে দেন। পরে দেখা গেছে প্রায় ৩০০ বেদে পরিবার ২০০২ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত এ পদ্ধতির যন্ত্র নিজেরাই তৈরী করে ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীতে সরকার তাদের জন্য কিছু টিউবওয়েল গেঁড়ে দিলে তারা এটি ছেড়ে দেন। ঢাকা শহরে দুটি বস্তিতেও উন্নত কিছু যন্ত্র দেয়া হয়েছিল, দেখা গেছে তারা সবাই নিয়মিত এটি ব্যবহার করতেন। সুদূর সুইডেন থেকেও একজন ছাত্রী এখানে এসে তার এম এস ডিগ্রীর জন্য আমাদের এ পদ্ধতির উপর গবেষণা করেছে এবং এ পদ্ধতিকে বিশ্বের অন্যান্য কাছাকাছি প্রযুক্তির তুলনায় বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মতামত দিয়েছে, কারণ গ্রামীণ ব্যবহারকারীরা নিজেরাই এটি বানাতে পারবে, কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে গবেষণাগারের দেয়ালের বাইরে নেয়ার উদ্যোগ

আমাদের ভাবনা আসে, গবেষণাগারে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি যদি মানুষের উপকারেই না আসে, তাহলে এ গবেষণায় কি লাভ? দেশে যেহেতু এ ধরণের নতুন প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি তৈরী করে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয় করার মত কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান নেই, সেহেতু আমরা নিজেরাই উদ্যোক্তা হয়ে এসব প্রযুক্তির সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কঠিন কাজটিও হাতে নিই, আর তাও কোন আর্থিক বিনিয়োগ ছাড়া। এখান থেকে লাভের অঙ্ক কেউ ব্যক্তিগতভাবে নিতে পারবে না, এভাবেই নিবন্ধিত হয়েছে ব্যবস্থাটি। আবার যেসব প্রযুক্তির পণ্য জনগণ নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারবেন, বা তাদের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে জনগণের কাছে প্রযুক্তি পৌঁছে দেয়ারও উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং দুটিতেই কিছু সফলতা এসেছে।

গ্রামের মানুষের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ-কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ভিত্তিক টেলিমেডিসিন

বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বভূক্ত দেশে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষই বাস করে গ্রামে এবং আর্থ-সামাজিক কারণে গ্রাম পর্যায়ে যথাযথ প্রশিক্ষিত ডাক্তারকে ধরে রাখা সম্ভব নয়, আগামী পঞ্চাশ বছরেও তা হবে কিনা সন্দেহ। তাই গ্রামের বেশীরভাগ মানুষ চিকিৎসা না নিয়েই রোগে ভোগেন, অথবা হাতুড়ে ডাক্তার বা ওষুধের দোকানের বিক্রেতার কাছ থেকেই চিকিৎসা পরামর্শ নিয়ে ওষুধ নিয়ে থাকেন। এর ফলে ভুল চিকিৎসা, অপ-চিকিৎসা হয়ে অনেক সময়েই রোগ জটিল হয়ে যায়, এমনকি মৃত্যু ডেকে আনে। এছাড়া এর ফলে স্টেরয়েড এবং অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার হচ্ছে যা সারা পৃথিবীর ভবিষ্যাতের জন্য এক আতঙ্ক নিয়ে এসেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কঠিন সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান হচ্ছে আধুনিক কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে টেলিমেডিসিন বা 'দূর থেকে চিকিৎসা'। এ পদ্ধতিতে

ডাক্তার শহরেই থাকছেন, আর গ্রামীণ কেন্দ্রে সামান্য প্রশিক্ষিত একজন অপারেটরের মাধ্যমে রোগী ইন্টারনেটের ভিডিও সুবিধার মাধ্যমে সরাসরি ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারেন। এর উন্নত একটি পর্যায় হল যেখানে রোগীর কিছু রোগ নির্ণয় তথ্য, যেমন স্টেথোস্কোপের সাহায্যে হৃদপিন্ড ও ফুসফুসের শব্দ, ইসিজি ইত্যাদির তথ্য সরাসরি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডাক্তারের কাছে পৌঁছে যায়। তাছাড়া রোগীর নিবন্ধন, ডাক্তারের সাথে সংযোগ, ডাক্তার কর্তৃক প্রেসক্রিপশন তৈরী, সবই একীভূত সফটওয়্যারের সাহায্যে করা যায় ও সব তথ্য ইন্টারনেট ভিত্তিক স্মৃতি ভান্ডারে সঞ্চিত থাকে। আমরা নিজস্ব পদ্ধিতিতে এ উন্নত টেলিমেডিসিনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করে গ্রামীণ পর্যায়ে অনেকগুলো কেন্দ্রের মাধ্যমে জনগণকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার ব্যবস্থা করেছি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিয়ে। প্রথমে মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তিটির পরীক্ষায় আর্থিক ও সাংগঠনিক সহায়তা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন (a2i)' প্রোগ্রাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে ইদানীং এ উদ্যোগের নামকরণ হয়েছে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিমেডিসিন প্রোগ্রাম (DUTP)'। ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গী নয়, বরঞ্চ মানুষের সেবাকে সবার সামনে রেখে সেটিকে ধরে রাখার উপায় হিসেবে ন্যূনতম আয় করার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এ সেবা। ১৭ জন গ্রামীণ উদ্যোক্তার মাধ্যমে গত ১৬ মাসে প্রায় ৫০০০ এর উপর চিকিৎসা-পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে চিকিৎসা নেয়া রোগীদের শতকরা ৭৫ ভাগই হচ্ছেন বৃদ্ধ, শিশু ও মহিলা। হয়ত আমাদের টেলিমেডিসিন কেন্দ্রগুলো সেখানে না থাকলে এদের অনেকেরই কোন চিকিৎসা নেয়া হতো না। ইদানীং জাতীয়ভাবে 'ব্র্যাক-মন্থন পুরস্কার-২০১৬' পেয়েছি এ কাজের জন্য। এরপর ভারতে অনুষ্ঠিত 'মন্থন-সাউথ এশিয়া পুরস্কার-২০১৬' এ ফাইনালিস্ট হিসেবে সনদ পেয়েছি আমরা।

আমাদের উন্নত টেলিমেডিসিন প্রযুক্তির মৌলিক ধারণাচিত্র

কম্পিউটারের পরিবর্তে মোবাইল স্মার্টফোনের মাধ্যমে বর্তমানে আমরা টেলিমেডিসিন প্রযুক্তি উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছি যেন একজন টেলিমেডিসিন অপারেটর মানুষের বাড়ীতে গিয়েই তার সাথে শহরের ডাক্তারের সংযোগ করে দিতে পারেন ও প্রয়োজনীয় শারীরিক মাপজোক করে তার তথ্য পাঠিয়ে দিতে পারেন। এজন্য আমরা ২০১৫ সালে অষ্ট্রেলিয়া ভিত্তিক 'ইনফরমেশন সোসাইটি ইনোভেশন ফান্ড- এশিয়া (ISIF-Asia)' থেকে ভাল একটি অনুদান পেয়েছি। এ প্রযুক্তির উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, এবং সেক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বে আমরা এগিয়ে আছি। আশা করতে পারি আমাদের এ প্রযুক্তি অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়বে।

সাহায্যের হাত

প্রাচীন প্রবচন, 'ফল পাকলে সুবাস এমনিতেই ছড়াবে'-এর উপর অগাধ বিশ্বাস আমাদের। তাই নিজেদের উদ্যোগেই প্রথমে এগিয়েছি। বিভিন্ন সময়ে সরকারের বিজ্ঞান ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদেরকে অনুদান দিয়েছে। কিছু সফলতার পরে অন্যান্য সাহায্যের হাতও এগিয়ে আসে। দুটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান - ফার্ম ফ্রেশ এবং বেক্সিমকো ফার্মা - তাদের সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে আমাদেরকে কিছু অনুদান দিয়েছে। নিরাপদ পানের পানির প্রযুক্তিটি ছড়িয়ে দেবার জন্য শিক্ষা

মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০১১ সনে ইউনেস্কো থেকে একবার সাহায্য পাওয়া গেছে। আগেই বলা হয়েছে যুক্তরাজ্যের সাহায্যে ১৯৮৩ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত শেফিল্ডের সাথে অ্যাকাডেমিক লিংক প্রোগ্রামটি কি ভাবে আমাদের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছে। আর ইদানীং সবচেয়ে বড় অর্থ সাহায্য আসে সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সাইন্স প্রোগ্রাম থেকে, যা আমরা গত ২০১১ থেকে নিয়মিত পেয়ে আসছি, যার মাধ্যমে আমাদের সব গবেষণা ছাত্র ও ফেলোদেরকে জীবন চালাবার মত বৃত্তি দিতে পারছি। আমাদের উদ্ভাবিত টেলিমেডিসিন প্রযুক্তির মাঠ পরীক্ষণের জন্য ২০১৫-১৬ সালে প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রোগ্রামের আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা বিশেষ কাজে এসেছে। প্রযুক্তিটি পিসি থেকে মোবাইল ফোন ভিত্তিক করে গড়ে তোলার জন্য অষ্ট্রেলিয়া ভিত্তিক 'ইনফরমেশন সোসাইটি ইনোভেশন ফান্ড-এশিয়া' থেকে আর্থিক অনুদান পাওয়া গেছে একই সময়ে। ইদানীং দরিদ্র রোগীদেরকে টেলিমেডিসিন প্রোগ্রামের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ ও ঔষধ দেবার জন্য একটি সাহায্য তহবিল করেছি, এতেও সহৃদয় ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের এডওয়ার্ড এম কেনেডী সেন্টারের অনুদানে মোবাইল ফোনে করা প্রযুক্তিটি মাঠ পরীক্ষণের জন্য ইদানীং কাজ শুরু হয়েছে।

সামনে চলার ভাবনা

জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের যে পথ চলা শুরু হয়েছে তা এখন তৃতীয় বিশ্বে নেতৃত্ব দেয়ার পর্যায়ে চলে গেছে। তৃতীয় বিশ্বে খুব কম দল আছে যারা এ ধরণের স্বপ্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে নিজস্ব প্রযুক্তির ক্ষমতাকে এতটা এগিয়ে নিতে পেরেছে। ইসিজি যন্ত্র ও এক্স-রে যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে একশত বছরেরও আগে, অথচ তৃতীয় বিশ্বে বাস করা পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ আজও এ দুটি জরুরী যন্ত্রের সেবা থেকে বঞ্চিত। এটি মানুষ জাতির সামগ্রিক ব্যর্থতা, আর এর মূল কারণ হচ্ছে পেটেন্টের মাধ্যমে প্রযুক্তি লুকিয়ে রেখে বিশাল মুনাফা করা, যে ব্যবস্থা করে পাশ্চাত্য আজ পৃথিবীতে বিশাল অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, পৃথিবীর প্রায় ৭৪০ কোটি মানুষের প্রায় ৬০০ কোটিই আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা-বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। পাশ্চাত্যের তৈরী এ ব্যর্থ ব্যবস্থার একমাত্র সমাধান হল প্রতিটি দেশে জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি নিজেরা উদ্ভাবন ও তৈরী করে স্বল্প মুনাফায় যার যার দেশের জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া। এজন্য আমরা আমাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির কোনো পেটেন্ট করছি না, বরঞ্চ তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদেরকে হাতে কলমে শিখিয়ে দেব যেন তারা তাদের দেশেই যন্ত্রগুলো বানিয়ে তাদের দেশের মানুষকে সেবা দিতে পারে। এজন্য আমরা স্থাপন করেছি International Centre for Technology Equalisation (ICTEq)। যদি পৃথিবীর বঞ্চিত মানুষদের জীবন আমাদের প্রচেষ্টায় কিছুটা হলেও উন্নত হয়, তবে আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল মনে করব।

গণিতের শাখায় শাখায় আত্মীয়তা

ড. সুব্রত মজুমদার
অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা স্কুলে যে জ্যামিতি শিখি তাকে ইউক্লিডের জ্যামিতি বা ইউক্লিডীয় জ্যামিতি বলা হয়। ইউক্লিড,পিথাগোরাস, এ্যাপোলোনিয়াস, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ অসাধারণ প্রতিভাবান গণিতবিদ্‌দের আবিষ্কারে গণিতের এই সুন্দর সৌধের সৃষ্টি। শুরুতে আমি এই জ্যামিতির তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

১) প্রাচীন কাল থেকে জানা আছে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিতে সসীম সংখ্যক সমতলীয় পৃষ্ঠ-বিশিষ্ট মোট পাঁচ রকম স্বতন্ত্র ঘন আকার (solids) আছে। এদের Platonic Solids বলা হয়। এদের পরিচয়:

ক) Tetrahedron-এর পৃষ্ঠতলগুলি (surfaces) ত্রিভুজাকৃতি (triangular) যার সংখ্যা ৪, সীমান্ত রেখার (edges) সংখ্যা ৬ এবং শীর্ষবিন্দুর (vertices) সংখ্যা ৪;

খ) Cube-এর পৃষ্ঠতলগুলি বর্গাকৃতি যার সংখ্যা ৬, সীমান্তরেখা সংখ্যা ১২, শীর্ষবিন্দু সংখ্যা ৪ৎ;

গ) Octahedron-এর পৃষ্ঠতলগুলি ত্রিভুজাকৃতি এবং তাদের সংখ্যা ৮, সীমান্তরেখা সংখ্যা ১২ এবং শীর্ষবিন্দু সংখ্যা ৬;

ঘ) Dodecahedron-এর পৃষ্ঠতলগুলি পঞ্চভুজাকৃতি (pentagonal) এবং তাদের সংখ্যা ১২, সীমান্তরেখা সংখ্যা ৩০ এবং শীর্ষবিন্দু সংখ্যা ২০;

ঙ) Icosahedron-এর পৃষ্ঠতল ত্রিভুজাকৃতি যাদের সংখ্যা ২০, সীমান্তরেখা সংখ্যা ৩০, শীর্ষবিন্দু সংখ্যা ১২।

২) প্রাচীন গ্রীক জ্যামিতির কম্পাস-রুলার পদ্ধতিতে অঙ্কণ সম্পর্কিত দু'টি সমস্যা দুই-আড়াই হাজার বছর ধরে গণিতবিদ্‌দের শ্রেষ্ঠ মেধাকে পরাস্ত করে রেখেছিল:

ক) প্রদত্ত যে কোন কোণকে সমত্রিখন্ডিত করা;

খ) প্রদত্ত যে কোন ঘনক (cube)-এর দ্বিগুণ আয়তন বিশিষ্ট একটি ঘনক আঁকা।

৩) সমান্তরলতা সম্পর্কিত স্বতঃসিদ্ধ (Axiom): প্রত্যেক সরলরেখার বহিঃস্থ কোন বিন্দুর মধ্য দিয়ে একটি এবং কেবলমাত্র একটি সমান্তরাল সরলরেখা বিদ্যমান। [এই স্বতঃসিদ্ধটি একটি অপ্রমাণিত উপপাদ্য হিসাবে বিবেচিত হ'ত। দেড়শ' দু'শ' বছর আগে প্রমাণিত হয়েছে, যে এটি একটি অপ্রমাণযোগ্য বিবৃতি এবং বিদ্যমান কোন উপপাদ্যের সঙ্গে এর বিরোধ নেই। তাই, এটি একটি নির্দোষ স্বতঃসিদ্ধ।]

(ক), (খ) ও (গ)- কে অবলম্বন ক'রে আমরা একদিকে যেমন গণিতের কয়েকটি স্বতন্ত্র শাখার গভীরে অন্তর্লীন রহস্যময় পারস্পরিক যোগসূত্রের পরিচয় বা আভাস পাব, অন্যদিকে তেমনি নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ গণিত-শাখার আবিষ্কারের সন্ধান পাব। এটিই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সংশ্লিষ্ট গণিতবিদ্‌দের ও ঐ আবিষ্কারগুলির বিষয়ে কিছু ঘরোয়া ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ক)- এ যে পাঁচ রকম Platonic Solid-এর কথা বলা হয়েছে, আমরা দেখব, তাদের প্রত্যেকের জন্য নীচের সূত্রটি সত্য:

সূত্র	পৃষ্ঠতল সংখ্যা − সীমান্তরেখা সংখ্যা + শীর্ষবিন্দু সংখ্যা= ২	(A)
(১)	এর ক্ষেত্রে (A)-এর রূপ	৪-৬+৪=২
(২)	এর ক্ষেত্রে (A)-এর রূপ	৬-১২+৮=২
(৩)	এর ক্ষেত্রে (A)-এর রূপ	৮-১২+৬=২
(৪)	এর ক্ষেত্রে (A)-এর রূপ	১২-৩০+২০=২
(৬)	এর ক্ষেত্রে (A)-এর রূপ	২০-৩০+১২=২

শুধু Platonic Solids - ই নয়, সসীম সংখ্যক সমতলীয় বহুভুজ দিয়ে বেষ্টিত বা আবদ্ধ যে কোন ত্রিমাত্রিক অঞ্চলের (Polyhedron) জন্যও (অ) সূত্রটি সত্য। Switzerland-এর মহামহিম গণিতজ্ঞ অয়লার (Euler) ১৭৩৬ সালে এই সূত্র আবিষ্কার করেন ও প্রমাণ করেন। Euler (১৭০৭-১৭৮৩) বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞদের অন্যতম। (ক)-তে বর্ণিত ঘনবস্তু বা আকারগুলি জ্যামিতির দৃষ্টিকোণ থেকে পরস্পর স্বতন্ত্র। তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ২ সংখ্যাটির আবির্ভাব রহস্যজনক। এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব হয়েছে আরেক অসাধারণ গণিত-প্রতিভা পোয়াঁকারের (Poincaré) নতুন তত্ত্বের মাধ্যমে যা Topology ও Algebraic Topology নামে দুটি গণিত শাখার জন্ম দিয়েছে, অন্য একটি গণিত শাখায় তাঁর গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে। ফরাসী গণিতবিদ পোয়াঁকারে (১৮৫৪-১৯১২) বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিতের প্রায় প্রত্যেক শাখায় অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করেন এবং এর প্রত্যেকটিতে বহু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে শাখাগুলিকে সমৃদ্ধ করেন। গণিতজ্ঞদের মধ্যে তাঁকে The Last Universalist বলা হয়।

Topology'র মূল বিষয় হচ্ছে Continuous Transformation। জ্যামিতির কোন আকার (form)-কে যদি ক্রমাগত সামান্য সামান্য পরিবর্তন করে এমনভাবে অন্য আকারে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে এই প্রক্রিয়ায় কোন অংশ ছিন্ন না হয় এবং একাধিক ছিন্ন অংশ জোড়া না লাগে, তাহলে Topology'র দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাম ও দ্বিতীয় আকার দুটি সমতুল্য হবে। Platonic Solids গুলি Topology'র দৃষ্টিকোণ থেকে পরস্পর সমতুল্য। তাদের মধ্যে এই মিলের কারণে ২ সংখ্যাটি সব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। Topology'র সঙ্গে সম্পৃক্ত Algebraic Topology শাখাটির প্রশাখা Homology Theory'র প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি এই ২ সংখ্যাটি।

Polyhedron-এর ক্ষেত্রে ২ সংখ্যাটিকে আগে Euler- সংখ্যা বা Euler characteristic বলা হ'ত। এখন একে Euler-Poincaré characteristic বলা হয়।

খ)-এ জ্যামিতির অঙ্কণ সমস্যা দুটি দু'হাজার বছর ধরে গণিতের শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের পরাস্ত করে রেখেছিল। প্রায় দু'শ' বছর আগে এক বিস্ময়কর ফরাসী গণিত প্রতিভা গালোয়া (Galois)'র (১৮১১- ১৮৩২) বহুপদী সমীকরণের সমাধান যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কিত এক বৈপ্লবিক আবিষ্কারের মাধ্যমে জ্যামিতির সমস্যা দুটির অঙ্কণ-অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। গালোয়া এবং নরওয়ের যুবক গণিতবিদ আবেল (Abel) স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ করেন যে পাঁচ এবং পাঁচের বেশী মাত্রার সাধারণ (General) বহুপদী সমীকরণ চিরাচরিত বীজগাণিতিক পদ্ধতিতে (অর্থাৎ - যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ও বর্গমূল, ঘনমূল ইত্যাদি মূলের সাহায্যে) সমাধান করা সম্ভব নয়। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সম্ভব, Galois সেই সম্বন্ধে গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। Galois মাত্র ২১ বছর বয়সে এবং Abel মাত্র ২৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

ক) ও খ) থেকে সহজে বুঝতে পারছি যে, সাধারণ দৃষ্টিতে যেটি গতানুগতিক জ্যামিতির সমস্যা বলে মনে হয়, তার সঙ্গে অন্য কত গণিত শাখার যোগ রয়েছে, এবং এই সব শাখার সম্মিলিত সহযোগিতায় সমস্যার যথার্থ প্রকৃতি জানতে হয় ও সমাধানের পথ বের করতে হয়।

গ)-এর সম্বন্ধে যখন জানা গেল যে এটি স্বতঃসিদ্ধ মাত্র, উপপাদ্য নয়, তখন এর বিকল্প দুটি স্বতঃসিদ্ধ বিবেচনা করা যায়: একটিতে কোন রেখার বহিঃস্থ কোন বিন্দু দিয়ে রেখার সমান্তরাল কোন রেখা নেই, দ্বিতীয়টিতে একাধিক সমান্তরাল রেখা বিদ্যমান। ইউক্লিডীয় দ্বিমাত্রিক (সমতলভিত্তিক) জ্যামিতির জায়গায় প্রসিদ্ধ জার্মান গণিতজ্ঞ রীমান (Riemann)-এর Riemannian Geometry-তে প্রম স্বতঃসিদ্ধটি সত্য, আর হাঙ্গেরীয় গণিতজ্ঞ Bolyai এবং রাশিয়ান গণিতজ্ঞ Lobachevski'র হাতে স্বতন্ত্র ও পরস্পর নির্ভরতাহীন ভাবে সৃষ্ট Hyperbolic Geometry-তে দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধটি সত্য। রীমানের জ্যামিতিতে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের চেয়ে বড়, হাইপারবোলিক জ্যামিতিতে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের চেয়ে ছোট। দ্বিমাত্রিক হাইপারবলিক জ্যামিতিতে একটি ত্রিভুজের উদাহরণ আছে, যার কোণ তিনটির পরিমাপ $\frac{\pi}{২}, \frac{\pi}{৮}, \frac{\pi}{৮}$। তাই এদের যোগফল $\frac{৩}{৪}\pi < \pi$ | ([১], পৃ. ৮০)।

শেষোক্ত দুই গণিতজ্ঞ Hyperbolic Geometry আবিষ্কার করলেও, তাঁদের জানা ছিল না যে অতিবিখ্যাত জার্মান গণিতবিদ্ Gauss তাঁদের অনেক আগেই এই জ্যামিতির পত্তন করেন। অবশ্য তিনি তাঁর এই আবিষ্কার ছাপাননি- তবে তিনি ওঁদের দেখিয়েছিলেন, অনেক পুরোনো কাগজে তাঁর বাড়িতে তাঁর লেখা ঐ সব আবিষ্কারের বিবরণ। Gauss-এর এমন কীর্তি অনেক ছিল। Elliptic Function নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার জন্ম ও অগ্রগতি Abel ও Jacobi'র হাতে

হয়– Abel-এর মৃত্যুর পর Jacobi Gauss-কে এইসব আবিষ্কার দেখালে, Gauss বহু পুরাতন কাগজে করা তাঁর নিজের আবিষ্কৃত এই একই কাজ Jacobi-কে দেখালেন। তাঁর এই আবিষ্কার Abel ও Jacobi'র জন্মের আগেই করা হয়েছে। গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy) ও Numerical Analysis-এ বিশাল কীর্তি রচনা করে গ্রহাণুপুঞ্জের (Asteroids) এর বৃহত্তম খন্ডটির (Ceres) গতিপথ নির্ণয় করে টেলিস্কোপের সাহায্যে এটিকে দেখার দুরূহ কাজে বেশ কয়েক বছর ব্যস্ত থাকায় Gauss-এর অনেক এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক আবিষ্কার তখন ছাপানো সম্ভব হয়নি।

ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে তলের বক্রতা-বিষয়ে Gauss-এর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও আবিষ্কারই Riemann-এর জ্যামিতি রচনার ভিত্তি। wewfboe শাখায় প্রকাশিত, অপ্রকাশিত অসংখ্য অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার Gauss-কে মানবজাতির চেয়েও উন্নততর কোন species-এর সদস্য হিসেবে বিবেচনা করতে প্রণোদিত করেছে তাঁর কোন কোন গুণ-মুগ্ধ প্রতিভাবান গণিতজ্ঞদের।

ওপরে দু'জন বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ গালোয়া ও পোয়াঁকারের কথা বলা হয়েছে। তাঁদের কীর্তির মধ্য দিয়ে কীভাবে গণিতের বহু শাখার উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলব।

বহুপদী সমীকরণের সমাধান -যোগ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে গালোয়া একটি নতুন গণিত শাখা Group Theory-র জন্ম দেন। সমীকরণের বীজগুলির পরস্পরের বিনিময়-পর্যালোচনা সূত্রে এটি ঘটে। এখানে প্রাপ্ত গ্রুপগুলি রূপান্তর-ধর্মী।

নিজের Avmboe দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর আশঙ্কা সম্বন্ধে তিনি প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন ব'লে গালোয়া মৃত্যুর আগের দিন বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ Cauchy-কে চিঠি লিখে তাঁর আবিষ্কার ও তত্ত্বের বিষয়ে অবহিত করেন। এই আবিষ্কারের মর্মোদ্ধার ও প্রকাশনা ঘটতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগে। এর ফলশ্রুতিতে পরে Cauchy এবং বৃটিশ গণিতজ্ঞ Cauchy এর সার্থক প্রচেষ্টায় Group এর ধারণা ও ধর্ম নিয়ে গাণিতিক চর্চা ও গবেষণা শুরু হয়। Cauchyy-কে লেখা চিঠিটি থেকে পরে ফরাসী গণিতজ্ঞ Jordan রূপান্তর-গ্রুপ সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্যের ভান্ডার এর সন্ধান পান। তাঁর কাছ থেকে রূপান্তর গ্রুপের বিষয় শিখে তরুণ জার্মান গণিত-প্রতিভা Felix Klein (ক্লাইন) এবং হাঙ্গেরীয় গণিতবিদ্ Sophus Lie (লী) যথাক্রমে জ্যামিতির রূপান্তর এবং সান্তরজ সমীকরণ (Differential Equation)-এর প্রসঙ্গে এই গ্রুপতত্ত্ব প্রয়োগ করে গণিতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নতুন বিষয় আবিস্কার করতে সফল হন। ক্লাইনের হাতে দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির গ্রুপতত্ত্বভিত্তিক বর্গীকরণ (Classification)-মূলক বিখ্যাত Uniformisation Theorem-এর জন্ম হয়। অন্যদিকে Lie-এর কীর্তি হিসাবে Lie Group নামে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ শাখার সৃষ্টি হয়, পদার্থবিদ্যায় যার গুরুত্ব ও ব্যবহার প্রতুল। অবশ্য Uniformisation Theorem টি পোয়াঁকারেও আবিষ্কার করেন। ১৮৮১ সালে খনিবিদ্যা সংক্রান্ত একটি কাজে বনের মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ তাঁর মাথায় এই আবিষ্কারটি আসে। খনি-বিজ্ঞানে পোয়াঁকারে পটু ছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে:

ক্লাইন ১৮৮২ সালের গধু মাসে Gottingen থেকে উত্তর সাগর তীরে একটি স্বাস্থ্যকর জায়গায় বেড়াতে যান। তাঁর Asthma ছিল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সময় ঐ জায়গায় মেঘলা ও বৃষ্টিযুক্ত আবহাওয়া ছিল। ফলে রাতে ক্লাইনের শ্বাসকষ্ট হয় এবং তিনি ঘুমাতে পারলেন না। অগত্যা তিনি গণিত চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। এই সময় Uniformisation Theorem তাঁর মাথায় আসে এবং তিনি এটি প্রমাণ করতে সক্ষম হন। জ্যামিতি ও গ্রুপতত্ত্বের মিথস্ক্রিয়ালব্ধ এই আবিষ্কারে মুগ্ধ হ'য়ে পরের দিনই তিনি তিনজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞকে এই আবিষ্কারের বিষয়ে অবহিত করেন। এঁদের মধ্যে পোয়াঁকারেও ছিলেন। ক্লাইনের আবিষ্কারের কথা জেনে, একজন চিঠির উত্তরে খুব বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করলেন, আরেকজন এটি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। আর পোয়াঁকারে জানালেন যে, উনি এটি আগেই আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

এইভাবে Klein-Poincaré Uniformisation Theorem এর জন্ম হল।

এবারে পোয়াঁকারের টপোলজি আবিষ্কারের বিষয়ে বলবো। এখানেও একটি মজার কাহিনী আছে। সুইডেনের রাজা Oscar বৈজ্ঞানিকদের কাছে জানতে চাইলেন, গতিবিশ্ব হিসাবে সৌরজগৎ (Solar system) সুস্থিত না দুঃস্থিত (Stable or Unstable)। পোয়াঁকারে গবেষণা করে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। তাতে stability সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি, কিন্তু এতে নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের ও মাধ্যাকর্ষণের প্রাসঙ্গিক সান্তরজ সমীকরণগুলি সমাধানযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও তাদের সমাধান সম্পর্কে অনেক আলোকপাত করার ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে, পোয়াঁকারে Oscar পুরস্কার পেলেন। তাঁর এই গাণিতিক

পদ্ধতি পরবর্তী গণিতজ্ঞদের আরো পরিণত (developed) ও বর্ধিত (extended) হয়ে Dynamical Systems নামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নতুন গণিত শাখা নামে পরিচিত হয়েছে। এরই প্রশাখা হিসাবে Chaos Theory এবং Fractal Theory'র জন্ম হয়েছে। অন্যদিকে উপরোক্ত গাণিতিক কর্মকান্ডের মধ্য থেকেই বিশুদ্ধ গণিতের Topology নামের বিখ্যাত শাখাটির উৎপত্তি হ'ল। Algebraic Topology'রও সূত্রপাত এখানে। পোয়াঁকারে Topology'কে Number Theory, Complex Analysis, Mechanics, Mathematical Physics, এইসব নানান শাখায় ব্যবহার করেন।

এই প্রবন্ধের উপসংহারে গণিত বিশ্বের সর্বকালীন বিস্ময়-প্রতিভা ভারতীয় গণিতজ্ঞ রামানুজনের একটি বিখ্যাত অনুমান 'Tau Conjecture'-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখা শেষ করছি। Number Theory সংক্রান্ত এই Conjecture (অনুমান) প্রমাণ ক'রে বেলজিয়ামের গণিতবিদ Deligne ১৯৭৪ সালে International Mathematical Union-এর Fields Medal অর্জন করেন। এর প্রমাণে তিনি Algebraic Geometry'র গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ঐশ্বর্য ব্যবহার করেছিলেন।

গণিতের শাখায় শাখায় নিবিড় আত্মীয়তার কিছুটা পরিচয় মিলল কি?

তথ্যপঞ্জী

1. David Mumford, Caroline Series, David Wright, Indra's Pearls: The Vision of Felix Klein, Cambridge University Press, 2002.
2. Ian Stewart, Does God Play dice: The New Mathematics of Chaos, Penguin Books, 1990.
3. G.F. Simmons, Differential Equations with Applications and Historical Notes, Tata McGraw Hill, 1996.
4. Robert Kanigel, THE MAN WHO KNEW INFINITY, A Life of the Genius Ramanujan ABACUS, 1991.

আমাদের চ্যালেঞ্জ প্রিয় তরুণসম্প্রদায়

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
অধ্যাপক
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

বিগত ১৬/১৭ বছর বাংলাদেশে যে সকল উন্নয়ন অনুকূল সংস্কৃতির সূচনা হয়েছে তার মধ্যে নানা বিষয়ে অলিম্পিয়াড এবং প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই আমরা জানতে পারলাম আমাদের ছেলেমেয়েরা দুর্বল একটি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য থেকে বের হয়ে আসলেও তারা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে। ১৪/১৫ বছর আগে শুরু হওয়া গণিত অলিম্পিয়াড থেকে ভাবাই যায় নি এত দ্রুত আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের সুকঠিন আসর থেকে আমাদের ছাত্ররা এত দ্রুত পদক অর্জন করতে পারবে। এখন তো পদক পাওয়া ডাল ভাত, আমাদের আগ্রহ এখন পদকের শ্রেয়তর রং, যার জন্য আমাদের ছাত্রর গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সামান্য উদ্যোগকে পুঁজি করে গণিতের চর্চায় নিজেদেরকে নিবেদন করছে, প্রিয় মাতৃভূমির ভগ্ন ভাবমূর্তিকে শ্রেয়তর রূপ দান করছে।

যে দেশটি পৃথিবীর এক সহস্রাংশ ভূখণ্ডে ২৪ সহস্রাংশ মানুষের অন্ন, বাসস্থান, চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে সেই দেশ আর যাই হোক দরিদ্র হতে পারে না। এই ভূমি রত্নগর্ভা। মহা পরাধীন ভারতের অধিকাংশ বিশ্বমানের বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছে আমাদের এই ভূখণ্ডে। তবে আমাদের সেই শ্রেষ্ঠত্ব আমরা সম্ভবত ভুলতে বসেছি। গোয়া শহরের ইন্সটিটিটউট অব ওশেনোগ্রাফীর মূল ভবনের বাহিরে নির্ভোগ গান্ধিজীর অর্ধনগ্ন প্রতিকৃতির পিছনে টাঙানো ছবির দশ জন বিজ্ঞানীর চার জনই বাংলাদেশের মাটির, যারা সীমিত সম্পদ দিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা করেছিলেন। গোটা এশিয়া তো নোবেল পুরস্কার দেখেছে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুবাদে, জাপান, কোরিয়া, চীন কিংবা অন্য কোন দেশের নাগরিকের সুবাদে নয়। দুই দুইবার স্বাধীনতা অর্জনের পথে সম্ভবত আমরা আমাদের মেধাভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ভুলেই গেছি। অথচ একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানভিত্তিক সমাজে এবং বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কিংবা উন্নয়নের সাফল্য প্রাকৃতিক সম্পদ নয় বরং মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর নির্ভর করবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই মানবসম্পদই উন্নয়নের অভাবে এখন আমাদের দেশের বুকে জগদ্দল পাথরের মত বসে আছে। এর পরও আমাদের তরুণসম্প্রদায়ের অর্জন অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির মত আধুনিকতম প্রযুক্তি ঘিরে ।

১৯৯৮ সালে এসিএম প্রতিযোগিতায় সুমন, সুষম ও সৈকতের প্রথম অংশগ্রহণেই বিখ্যাত স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ২৪তম স্থান দখল কিংবা তার দুই বছর পরে ২০০০ সালে ৬০টি শ্রেষ্ঠ দলের প্রতিযোগিতায় এম আই টি, হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড, বার্কলেকে পিছনে ফেলে মুস্তাক, পাপ্পানা ও ফেরদৌসের দলের একাদশ স্থান দখল কিন্তু আমাদের তরুণদের আধুনিকতম তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষতায় শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ।

আমরা সবাই জানি সীমিত সম্পদ, দুর্বল গবেষণাগার ও যোগ্য শিক্ষকের অভাবে আমাদের স্কুল কলেজে ছাত্রদের প্রোগ্রামিং শেখা হয়েই ওঠেনা। এর মধ্যে ২০০৫ সালের এসিএম এর এশিয়া অঞ্চলের ঢাকা সাইট প্রতিযোগিতায় নটরডেম কলেজের নাফি, খোবাইব এবং রাজশাহীর শান্তকে দিয়ে তৈরি দল আন-অফিসিয়ালি সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলো। ড্যাটা স্ট্রাকচার, এলগরিদম, প্রোগ্রামিং ভাষার কোন কোর্স না করেই এই দলটি সবাইকে অবাক করে দিয়ে বুয়েটসহ দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল দলকে পিছনে ফেলেছিল। এটা স্বপ্নেও চিন্তা করা যায় না। কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েরা তা বাস্তবে করতে পারে এবং তা সীমিত সম্পদ ব্যবহার করেই ঢাকা সিটি কলেজ থেকে পাশ করা মোহাম্মদ আবীরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের জন্য ২০০৯ সালে বুল্গেরিয়ার প্লভদিভ শহরে রওয়ানা হলো। ভুতের গলিতে বাস করা আবীর যখন প্লভদিভ শহরে যেয়ে সকল প্রতিযোগীর সঙ্গে অত্যন্ত

স্বাভাবিকভাবে কথা বলছিল তখন আমার বুক একবিঘত বড় হয়ে গেছে। শুধু যে আবীরই তাদের চিনতো তা নয় ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা ছেলেমেয়েরা বাংলাদেশের ভুতের গলিতে থাকা আবীরের বন্ধু যারা তার কম্পিউটার দক্ষতাকে সমীহও করে। উপমহাদেশ থেকে সর্বমোট ৮ জন প্রতিযোগীর চার জন ভারতের, তিনজন শ্রীলঙ্কার আর বাংলাদেশের সবেধন নীলমণি আবীর, যাকে একসপ্তাহ এক থাকার দুঃসহ যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়েছে। সেই প্রতিযোগিতায় সারা উপমহাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশের আবীরুল ইসলাম ছিনিয়ে এনেছে রৌপ্য পদক। এটাও কি ভাবা যায় সিটি কলেজের এই ছেলেটি ঐরকম আসরে গিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবে? আমাদের তরুণদের শেখাতে হয় না, তাদের একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার সামনে শুধু দাঁড় করিয়ে দিতে হয়। তখন তারা একেকজন আবীরুল ইসলাম হয়ে যেতে পারে। কয়েকদিন আগে এশিয়া প্যাসিফিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড থেকে আমাদের চট্টগ্রামের ধনঞ্জয় একটি রৌপ্য পদক ছিনিয়ে আনলো। এইচ এস সি পরীক্ষার চাপ তাকে দুর্বল করতে পারে নি। অবশ্যি ধনঞ্জয়কে প্রোগ্রামিং ভাষা শিখতে কোন শিক্ষকের কাছেও যেতে হয় নি। ২০১২ সালে ধনঞ্জয় এবং বৃষ্টি ইতালি থেকে ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে এসেছে; বৃষ্টি হয়েছে মেয়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিখ্যাত এম আই টি কোনরকম ভর্তিপরীক্ষা ছাড়াই তাকে ভর্তি করেছে। এখন আমাদের এরকম অনেক ছাত্র রয়েছে যারা গণিত অলিম্পিয়াড কিংবা ইনফরমেটিক্স বা পদার্থ বিজ্ঞানের অলিম্পিয়াড করে নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়ন করছে।

১৯৯৯ সালের ঘটনা- আমরা আই আইটি কানপুরে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছি। প্রতিযোগিতার আগের দিন আই বি এম ভারতের কর্ণধার বক্তৃতায় বলেছিলেন, আজ আমরা বিশ্বসুন্দরী হলাম আগামীকাল প্রমাণ করবো মেধায়ও আমরা শ্রেষ্ঠ। পরের দিনের প্রতিযোগিতার ফল হলো, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দল চ্যাম্পিয়ন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দল রানার আপ-পুরস্কার বিতরণী সভা শোক সভার মত লাগছিল। তার পরের বছরও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দল সেখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

শুরু হয়েছে ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড - প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। আমরা জানি স্কুল-কলেজ লেভেলে প্রোগ্রামিংয়ের শিক্ষা দেয়ার মত ভৌত অবকাঠামো কিংবা দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে দেশ জুড়ে। এরই মধ্যে ২০১৬ সালের আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে রাশিয়া থেকে আমাদের নবম শ্রেণির ছাত্র রুবাব এবং রুহান দুটি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে এসেছে। তাসমীম এবং নির্ঝর দুর্ভাগ্যবশত সামান্য কয়েক নম্বরের জন্য বঞ্চিত হয়েছে পদক থেকে। তাদের সকলের ভাল ফলাফলে আমরা ইংল্যান্ড এবং জার্মানির স্কোরকে টপকে গিয়েছি। এখন কিন্তু দেশে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য আয়োজিত প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতাসমূহে তারা শীর্ষেই থাকছে।

২০১৫ এবং ২০১৬ সালে আগের বছরগুলোর মতই আমাদের ছেলেমেয়েরা ভারতের তুলনায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। ২০১৫ সালে এসিএম এর বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ভারত থেকে ৭টি এবং বাংলাদেশ থেকে দুইটি দল অংশগ্রহণ করেছিল। সেই প্রতিযোগিতায় আমাদের জাহাঙ্গীরনগর এবং শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দল দুটি ছিল সবার উপরে। এবার থাইল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দল উপমহাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সফটওয়ার রপ্তানি খাত থেকে ভারতের আয় হল বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার মিলিয়ন শব্দটি আছে বলে আমরা তার সমান অংক দাবি করতে পারি। অথচ মাত্র সাতগুণ ছোট এই দেশের আয় হওয়া উচিত ছিল ১৪ বিলিয়ন ডলার। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আমাদের যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন তাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে আমাদের পারফরম্যান্স এতো দুর্বল কেন। আমাদের সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তথ্যপ্রযুক্তিকে নানাভাবে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা। এর মধ্যেও আমরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাচ্ছি না কেন। তথ্যপ্রযুক্তি মত সর্বজনিন প্রযুক্তির ব্যবহারে সীমিত সম্পদে আমাদের দেশ হয়ে উঠতে পারে একটি সম্পদশালী জাতি, যেমনটি হয়েছে জাপান ও কোরিয়া।

বাংলাদেশের তরুণেরা ঐতিহ্যগতভাবেই অন্তত দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে মেধাবী। এই অসাধারণ মেধাবী ছাত্রদের শেখার জন্য পর্যাপ্ত সামগ্রী দেওয়ারও প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন চ্যালেঞ্জিং সমস্যা যা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দিতে পারছে না। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করার জন্য চাই বিশ্বমানের শিক্ষা। যেকোন বিষয়ে উৎকর্ষ অর্জনের

ব্যয়সাশ্রয়ী পদ্ধতি হল প্রতিযোগিতা। আমাদের ছেলেমেয়েরা ৫ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত লাফাতে পারে, অথচ জিপিএ ৫ পাওয়ার জন্য দুই ফুট পর্যন্ত লাফাতে পারলেই হলো। এই দুই ফুট লাফানো জিপিএ ৫ এর মূল্যায়ন ব্যবস্থা তাদের সামর্থ্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারছে না। দীর্ঘদিন এই ব্যবস্থা চালু থাকলে আমাদের ছেলেমেয়েদের সুপ্ত প্রতিভা আর কখনো জেগে উঠবে না। আমাদের এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন যা আমাদের ছাত্রদের মেধাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। এই মেধা এমনই উঁচু মানের যে কঠিন প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য ড্যাটাস্ট্রাকচার আর এলগরিদমের ক্লাস করতে হয় না। আমরা জানি আমাদের সব ছেলেমেয়ে একই বিষয়ে হয়তো ব্যুৎপত্তি অর্জন করবে না তবে সবাইকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, তাদের সামর্থ্যকে প্রসারিত করতে হবে কারণ ২০ বছর বয়সের পর আর তা প্রসারিত হবে না। আণ্ডারগ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে থাকাকালীন সময়ে আমাদের ছাত্ররা যে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা করতে পারে তার কিছু উদাহরণ www.csebuet.org এ ভিজিট করলে পাওয়া যাবে। সুতরাং এই তরুণদের সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহের কিছু নেই, সন্দেহ হল এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আমাদের যোগ্যতা নিয়ে যা তাদের মেধাকে অধিকতর শাণিত করতে পারে, এমন একটি উদ্দীপনামূলক পরিবেশ তৈরি, প্রণোদনার ব্যবস্থা যা তাদের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে। এমন দিনের আগমনের জন্য আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

আমাদের কৃষিঃ প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা

ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
অধ্যাপক, জেনেটিক্স এ্যান্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং বিভাগ
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

গত শতাব্দীর ষাটের দশকেও আমাদের বড় রকম খাদ্য ঘাটতি ছিল। উদুর পূর্তির জন্য সে সময়ও বিদেশ থেকে আনতে হয়েছে প্রতিবছরই ২০-৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য। জনসংখ্যা বাড়ছিল কিন্তু বাড়ছিলনা ফসলের ফলন। সনাতন ফসল, ফসলের সনাতন জাত আর সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতির মধ্যে আটকে ছিল আমাদের ফসল কৃষি। মৎস চাষও তখন এদেশে শুরু হয়নি সেভাবে। প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে মৎস আহরণই ছিল মৎস সংগ্রহের একমাত্র উৎস। এমনকি আমাদের গৃহপালিত পশুগুলো ছিল স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত ব্রিড বা নানা রকম স্থানীয় প্রকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন পশু বা পল্ট্রি শিল্প তখনও গড়ে উঠেনি। আমাদের খাদ্যে খাদ্য উপাদানের প্রায় সব ক'টিতে ঘাটতি ছিল। খাদ্যের সংস্থান করাই কষ্টকর ছিল বলে পুষ্টি নিয়ে আমাদের ভাবনা ছিলনা তেমন করে। এরকম হতাশ করা যে কৃষি, সে কৃষির দিনে দিনে যে উল্লম্ফন ঘটেছে সেটি এক ধারাবাহিক সাফল্যেরই গল্প। এর মধ্যে দিয়েই আমাদের কৃষির যা কিছু প্রাপ্তি। আর এ প্রাপ্তির পেছনে কাজ করেছেন আমাদের কৃষক, কৃষি গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী এবং সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি এবং এর বাস্তবায়ন।

আমাদের দানাদারশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ঘটনা শুরু হয় ষাটের দশকে ইরি বিজ্ঞানীদের উদ্ভবিত খর্বাকৃতির ধানের জাতকে অবলম্বন করে। অতঃপর কখনো সেসব জাত বা ইরি লাইন থেকে সরাসরি আবার কখনো ইরি লাইনের সাথে আমাদের সনাতন জাতের সংকরায়ন করে এদেশে উদ্ভাবন করা হয়েছে খর্বাকৃতির আধা-খর্বাকৃতির নানা রকম ধান জাত। এসব জাতের আবাদ করতে গিয়ে যুক্ত হয়েছে রাসায়নিক সার, কীটপতঙ্গ দমনের জন্য কীটনাশক আর সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি প্রয়োগ। বিশ শতকে এসে বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন জলমগ্নতা সহনশীল, লবনাক্ততা সহনশীল এবং খরা সহনশীল ধান জাত। ধীরে ধীরে দেশের সকল কৃষি প্রতিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের উপযোগী বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। একই ভাবে ষাটের দশকে এদেশে প্রবর্তন করা হয়েছে CYMMIT থেকে খর্বাকৃতির গমের আধুনিক জাত। সেখান থেকে প্রবর্তিত গম জাত বা লাইন ব্যবহার করে আমাদের দেশে উদ্ভাবন করা হয়েছে নানা রকম গম জাত। শুরু হয়েছে এদেশে আধুনিক গম জাতের আবাদ। সাম্প্রতিককালে এসে এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভুট্টার আবাদও। ভুট্টার হাইব্রিড জাত আমদানি, দেশে নতুন নতুন ভুট্টার জাত উদ্ভবন ও এদের দ্রুত প্রসার ভুট্টার উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য রকম বৃদ্ধি করেছে। ফলে অনিবার্যভাবে দেশে বেড়েছে দানা শস্যের উৎপাদন।

কেবলতো ফসলের নতুন জাতের ব্যবহার নয়, পাশাপাশি এদের মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকায়নও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৫-১৬ সালে চাল, গম ও ভুট্টার মোট উৎপাদন হয়েছে ৩৮৮.৭৫ লক্ষ মে.টন। এর মধ্যে চাল ৩৪৭.৬১ লক্ষ মে.টন, গম ১৩.৫৫ লক্ষ মে.টন ও ভুট্টা উৎপাদন হয়েছে ২৭.৫৯ লক্ষ মে.টন। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৪.৫৭ লক্ষ মে.টন বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রযুক্তির প্রসার ও প্রযুক্তি প্রয়োগের কারণেই অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে দানা শস্যের উৎপাদন।

উচ্চফলনশীল জাতের জন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি খাদ্য আর বাড়তির জন্য যত্ন। বাড়তি খাদ্য হিসেবে ফসল উৎপাদনে শুরু হয়েছে সারের ব্যবহার। পাশাপাশি সুষম সার ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিপুল ভর্তুকি তথা উৎপাদন সহায়তা হিসেবে ইউরিয়া ও নন ইউরিয়া সারের দাম দফায় দফায় কমিয়ে কৃষকের আওতার মধ্যে নির্ধারণ করাও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। তার সাথে রয়েছে ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থিত সেচের পানির সুসমন্বিত ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়টিও।

কীটপতঙ্গ আর রোগজীবাণুর হাত থেকে ফসলকে রক্ষার জন্য শুরু হয়েছে কীটনাশক এবং বালাইনাশকের ব্যবহার। আগাছার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য শুরু হয়েছে আগাছানাশকের ব্যবহারও। ইতোমধ্যে চাষাবাদে যুক্ত হয়েছে নানা রকম আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি। সবকিছু মিলে তবে বাড়িয়েছে ফসলের ফলন। এসব হলো দেশে খাদ্য শস্য বৃদ্ধির।

ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্যের অন্যতম উৎস হলো সবজি ও নানা রকম ফলমূল। হাইব্রিড সবজির চাষ আমাদের সবজি উৎপাদনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শুরুতে বিদেশ থেকে সবজির হাইব্রিড জাত আনা হলেও এখন এদেশে প্রাইভেট বীজ কোম্পানীগুলো সবজির হাইব্রিড বীজ উৎপাদন শুরু করেছে। সারাবছর ধরে এখন বাজারে হরেক রকম সবজি পাওয়া যাচ্ছে। দিবস দৈর্ঘ্য নিরপেক্ষ সবজির জাত এখন সারাবছরই আবাদ করা হচ্ছে। ফলে বাজারে যেকোন সময় লাউ, কুমড়া ইত্যাদি সবজি পাওয়া যাচ্ছে। মানসম্মত সবজি-বীজ সুলভ হওয়ায় সবজি চাষ ও এর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে কুল, পেয়ারা, স্ট্রবেরী সহ অনেক ফলের আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাল্টা, লেবু, আম ও লিচুর আবাদ যেমন সমতল ভূমিতে বিস্তার লাভ করেছে তেমনি তা পাহাড়ি এলাকায়ও বিস্তৃত হয়েছে। ফলে দেশে ফলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে দেশে ফলের উৎপাদন হয়েছিল ১০৩.৪১ লক্ষ মে.টন যা ২০১৪-১৫ সালে এসে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০৬.০৮ লক্ষ মে. টন। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে উৎপাদিত সবজির পরিমাণ ছিল ১৯৩.৯৭ লক্ষ মে. টন আর ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২১০.৪১ লক্ষ মে. টনে।

আমাদের দেশে আলুর ফলনও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যরকম। সনাতন আলু জাত কেবল নয় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা সত্তরটিরও অধিক গোলআলু জাত অবমুক্ত করেছেন আবাদের জন্য। আলু চাষের বিস্তৃতিও ঘটেছে ব্যাপক। এখন এর উৎপাদন ২০১৪-১৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৯৪.৭৪ লক্ষ মে. টনে। দেশে ডাল, তেল ফসল ও মশলার উৎপাদনও খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছুতে সময় লাগবে আরো। শস্য বহুমুখীকরণের কারণে দেশে ২০১১-১২ সালে যেখানে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় শস্যের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৬.৬৫, ৮.৪৪ ও ২৯.৬৫ লক্ষ মে. টন সেখানে উৎপাদন প্রতিটি শ্রেণির ফসলের ক্ষেত্রে ২০১৫-১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১০.০৫, ১০.৫০ এবং ৩১.২৯ লক্ষ মে. টনে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিদিন আমাদের আবাদি জমি কমছে আর প্রতি দিন বাড়ছে মানুষ। এরকম একটি দ্বান্দিক অবস্থায় থেকেও প্রতিবছরই আমাদের বাড়াতে হচ্ছে ফসলের ফলন ও মোট উৎপাদন যা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এসবের সাথে এসে যুক্ত হয়েছে জলাবদ্ধতা, খরা, লবনাক্ততাসহ নানা রকম বৈরি পরিবেশ। তাছাড়া কৃষির উপর বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন আর উষ্ণতা বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাবতো রয়েছেই। রয়েছে ফসলের নানারকম কীটপতঙ্গ ও রোগজীবাণুর আক্রমণ। মাঠে দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন কীটপতঙ্গ এবং রোগজীবানু এরকম নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যেও প্রতিবছর বাড়াতে হচ্ছে ফসলের উৎপাদন।

বৈরি পরিবেশ উপযোগী ফসলের প্রজাতি ও জাত বাছাই করার পাশাপাশি বৈরি পরিবেশ সহনশীল জাত উদ্ভাবন আমাদের আজকের ও আগামী দিনের এক বড় চাহিদা। এতো কেবল একটি ফসলের জাত নয়, নয় একটি নির্দিষ্ট বৈরি পরিবেশও। উপরন্তু বৈরি পরিবেশের মাত্রাও যে একই থেকে যাচ্ছে সবসময় তাওতো নয়। ধান বিজ্ঞানীরা ধানের লবণ সহিষ্ণু কয়েকটি জাত উদ্ভাবন করেছেন দক্ষিণাঞ্চলের ব্যাপক এলাকার লবণাক্ত অঞ্চলের জন্য। তবে তাতেই সব কূল রক্ষা করা যাচ্ছেনা। বাড়ছে লবণাক্ত এলাকার পরিমাণ, দিনে দিনে নতুন জমি লবণাক্ততার শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে আবার বাড়ছে লবণাক্ত জমির লবণাক্ততার মাত্রাও। আগে যেখানে লবণাক্ততার মাত্রা ছিল ৭-৮ ডেসিসিমেন একই স্থানে তা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১১-১২ ডেসিসিমেনে। ফলে ৭-৮ ডেসিসিমেনের জন্য উদ্ভাবিত জাত ১১-১২ ডেসিসিমেনে সে রকম সুবিধা করতে পারছেনা। সে কারণে নতুন টার্গেট নিয়ে চলছে অধিক লবণ সহিষ্ণু ধান জাত উদ্ভাবনের গবেষণা।

কেবল ধান আমাদের পুষ্টির সকল চাহিদা মেটাবে তা ভাবার কোন কারণ নেই। লবণাক্ত এলাকায় জন্মাতে হবে গম, ভুট্টা কিংবা আলুও। সেসব এলাকার জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজন লবণসহিষ্ণু নানা রকম শাক সবজি, ফলমূল, ডাল, তেল বা

মশলা জাতীয় ফসলের জাতও। সুষম খাবারের ভাবনা থেকেই ভাবতে হবে সব রকম ফসল ফলানোর কথাই, তাহলে পরে ধানের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলেরও লবণাক্তসহিষ্ণু জাত বাছাই ও উদ্ভাবন করতে হবে। উদ্ভাবন করতে হবে খরা ও অন্যান্য বৈরি পরিবেশ উপযোগী বিভিন্ন ফসলের জাতও।

বাংলাদেশ নিম্ন ভূমির দেশ। নানারকম নদ-নদী, খাল-বিল আর মুক্ত জলাশয় এ দেশকে জালের মত বিস্তার করে আছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে অনেক নদ-নদী এদের নাব্যতা হারালেও দেশের মধ্যভাগ, পূর্বভাগ ও দক্ষিণভাগে এখনো প্রচুর জলাশয় রয়েছে। তাছাড়া মৎস চাষের জন্য খনন করা হয়েছে অসংখ্য পুকুর। নীচু এলাকায় বাঁধ নির্মাণ করে তৈরি হয়েছে পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষের সুযোগ। তাছাড়া এখন অনেক প্রাকৃতিক জলাশয়েও করা হচ্ছে মাছ চাষ। তার উপর রয়েছে আমাদের প্রাকৃতিক জলাশয়ে বেড়েবর্তে ওঠা আমাদের দেশী জাতের মাছ।

আমাদের মৎস বিজ্ঞানীরা মূলত চারটি কাজ করেছেন। এক, তাঁরা মা মাছ থেকে ডিম আহরণ করে রেণু পোনা তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। এখন সে কারণে কৈ, শিং, মাগুড়, সরপুটি, পাবদাসহ বহু মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। দুই, বিদেশ থেকে চাষ উপযোগী মাছ প্রবর্তন করে তা থেকে সবচেয়ে উৎপাদনশীল মাছকে বাছাই করে তার উৎপাদন পদ্ধতি তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তেলাপিয়া, নাইলোটিকা, সিলভারকার্প, গ্রাসকার্প ইত্যাদি মাছ চাষ বহুলাংশে বেড়েছে। তিন, মৎস বিজ্ঞানীগণ মাছের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ন ঘটিয়ে নতুন নতুন হাইব্রিড মাছ উদ্ভাবন করেছেন। চার, বিজ্ঞানীগণ নানারকম জলাশয় উপযোগী মাছ চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। আমাদের মাছ চাষীগণদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মাছ চাষে আগ্রহী করে তুলেছে মৎস বিভাগ। বদ্ধ জলাশয়ে মৎস চাষ নিবিড়করণের কারণে আমাদের চাষের মাছের উৎপাদন বেড়েছে যথেষ্ট। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে যেখানে চাষকৃত মাছের উৎপাদন ছিল ১৮.৬০ লক্ষ মে.টন তা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এসে বেড়েছে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে যেখানে মাছের উৎপাদন ছিল ২৭.০১ লক্ষ মে.টন, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট মৎস উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টনে।

তাছাড়া জলাশয় সরকারের ব্যবস্থাপনায় কার্যকর কিছু পদক্ষেপও মাছ চাষে বিরাট সাফল্য এনেছে। এ কাজটি দক্ষতার সাথে করতে পেড়েছে মৎস বিভাগ। এবারকার ইলিশ প্রাপ্তির বিষয়টি মৎস বিভাগের সে ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। তাছাড়া উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎসচাষীসহ সকল ষ্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভূক্ত করে মৎস বিভাগ সমন্বিত মৎস চাষ কার্যক্রম চালু করেছে। ফলে দেশি মাছের ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক স্থানেই। এ কারণেই মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ৯.৬১ লক্ষ মে.টন হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বেড়েছে শতকরা ২০ ভাগ।

মাছ চাষ সম্প্রসারণের সুযোগ এদেশে এখনো রয়েছে। মাছের পোনা ও মাছ চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ বৃদ্ধি করা গেলে বাড়বে মাছ চাষ এবং মাছের মোট উৎপাদন অবশ্যই। দেশের সকল এলাকায় অবস্থিত জলাশয় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও মৎস চাষকে উৎসাহিত করে মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। তাছাড়া নতুন নতুন মৎস জাত উদ্ভাবন ও মৎস উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও এদের আধুনিকায়ন এর ক্ষেত্রে আরো সাফল্য বয়ে আনবে বলে মনে করার কারণ রয়েছে। আমাদের সামুদ্রিক অঞ্চল ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে পারলে বাড়বে আমাদের সামুদ্রিক প্রাকৃতিক মৎস আহরণও। উপরন্তু বিশাল এক সমুদ্রাঞ্চল আমরা লাভ করেছি মায়ানমারের কাছ থেকে। সেখানে কেবল মাছ নয় অন্যান্য ভক্ষণযোগ্য জলজ প্রাণিও রয়েছে। সঠিকভাবে এ বিশাল সামুদ্রিক জলজ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা মৎস উৎপাদনে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ তিন চার দশক আগেও ছিল বেশ সনাতন ধরনের। কৃষকের বাড়িতে কিছু দেশি হাঁস মুরগি লালন, ছাগল-ভেঁড়া আর দেশি জাতের গরু বা মহিষ পালন ছিল আমাদের পশুপালনের অবস্থা। আমাদের খোলা মাঠে চড়তো ছাগল, ভেঁড়া, গরু বা মহিষ। আগে বাড়তি কোন খাবারের জোগান খুব একটা দেওয়া হতোনা আমাদের গৃহপালিত পশুদের। এ রকম সনাতনী পশুপালন পদ্ধতির বিরাট পরিবর্তন এসেছে এদেশে এখন। দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে

গাছ নিয়ে জানা অজানা নানা কথা

ডঃ মিহির লাল সাহা
অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পানির অপর নাম যেমন প্রাণ তেমনি গাছের অপর নামও প্রাণ বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। এই মানুষই আদিমকালে পাহাড়ের গুহায় কিংবা বনে-জঙ্গলে বাস করত। সেই বন-জঙ্গল থেকেই আবার খাদ্য আহরণ করতে হত। সভ্যতা এবং বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান থেকে জেনেছি যে সূর্যই সকল শক্তির উৎস। এ কথাটি আমরা যেমন জানি, তেমনি এটাও জানতে হবে এবং মানতে হবে যে সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়েই গাছ তার সবুজ রঞ্জক পদার্থ ক্লোরোফিলের সাহায্যে নিজের জন্য এবং মানুষসহ সকল প্রাণীর জন্য খাদ্য তৈরি করে। আর একারণেই আমরা পৃথিবীতে বেঁচে আছি, মানব সভ্যতা টিকে আছে এবং থাকবে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও সালোকসংশ্লেষণ নামক জীবজগতের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারে না বিধায় এই বিক্রিয়াটির জন্য গাছের উপর সদাসর্বদা নির্ভর করতে হয়। তাহলে আমরা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করি যে গাছ আমাদের প্রাণ কারণ সে আমাদের খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। গাছ থেকে আমরা খাদ্য পেলাম, সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য আর কোনো অভাব বোধহয় থাকলো না। আসলে এ কথাটি কী ঠিক? না, সম্পূর্ণভাবে ঠিক নয়। আমরা বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণ করি কারণ এ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে থাকি। আমরা কীভাবে শক্তি পাই তার ব্যাখ্যা এখন জানার চেষ্টা করি। খাদ্য থেকে শক্তি পেতে হলে সালোকসংশ্লেষণের মত আরও একটি জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়ার দরকার হয় যার নাম শ্বসন। এটা হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন। তারপরও একটু ব্যাখ্যা করি। সকল জীবে শ্বসন ঘটে, আমাদেরও ঘটে। এই শ্বসনে অক্সিজেন একান্তভাবে অপরিহার্য। আর এই অক্সিজেন আমরা বাতাস থেকে পেয়ে থাকি। বাতাস কোথা থেকে এই অক্সিজেন পায়, সেটিই জিজ্ঞাস্য। ঐ যে বললাম, পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়া সালোকসংশ্লেষণ যা একমাত্র সবুজ রঞ্জক পদার্থধারী উদ্ভিদই করতে পারে। সেই বিক্রিয়া থেকেই উপজাত হিসেবে অক্সিজেন বায়ুমন্ডলে এসে থাকে। তাহলে দেখুন তো, গাছ কীভাবে আমাদেরকে নিঃস্বার্থ ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে! তাই আসুন আমরা সকলে একসুরে বলি, গাছের অপর নাম জীবন; হ্যাঁ, গাছ আমাদের জীবন। সৃষ্টির সেই আদিমকাল থেকেই আমাদের চারপাশে গাছ আছে এবং পক্ষান্তরে গাছের চারপাশে আমরা আছি। গাছ যেমন নিঃস্বার্থভাবে আমাদের ভালোবাসে তেমনি আমাদেরও নিজস্বার্থেই গাছকে ভালোবাসা উচিত। তাই নয় কী? আসুন সেই উপলব্ধিতেই আমরা সবাই গাছকে ভালোবাসি, গাছের প্রতি যত্নবান হই। গাছের প্রতি সেই ভালোবাসা আর বিজ্ঞান জাদুঘরকে ঘিরেই আমার আজকের এই লেখাটি। আশা করি লেখাটি উপভোগ্য হবে।

পৃথিবীতে অনেক ধরনের গাছ আছে। একটি লেখার মধ্যে সব ধরনের গাছকে উপস্থাপন করতে হয়তো পারব না, তবে বিজ্ঞান জাদুঘরকে ঘিরে যে গাছগুলোর কথা আসা উচিত সেগুলোকে আনার চেষ্টা করব। আমাদের দেশের জাতীয় গাছের নাম কী বলুন তো? বলতে পারবেন? হয়তো কেউ পারবেন আবার কেউ নাও পারতে পারেন। যারা পারবেন না তাদের হয়েই আমি বলে দিচ্ছি। জাতীয় বৃক্ষের নাম হলো আম গাছ। যার বৈজ্ঞানিক নাম *Mangifera indica*। এই নামটি দেখে বোঝা গেল কিনা জানি না যে গাছটির উৎপত্তিস্থল কোথায়। হ্যাঁ, এই গাছটির উৎপত্তিস্থল এই ভারতীয় উপমহাদেশে। এখানে একটা কথা বলে সবার দ্বিধা বা সংকোচ দূর করতে চাই, তা হলো গাছ ও বৃক্ষ আভিধানিক অর্থে একই বলে আমরা অনেকে মনে করি। তবে বড় গাছগুলোকেই আমরা সাধারণত বৃক্ষ বলে থাকি। ছোট গাছগুলোকে আকার আকৃতির উপর ভিত্তি করে বীরুৎ এবং গুল্ম বলে থাকি। যে গাছগুলো খুব ছোট তাদেরকে বীরুৎ, মাঝারি আকৃতির গাছকে গুল্ম এবং বড় গাছকে সাধারণত বৃক্ষ বলে থাকি। আবার আয়ুষ্কালের উপর ভিত্তি করে কখনো একবর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী বলে থাকি। এ থেকে বোঝা গেল যে কোনো কোনো গাছ এক বছর বাঁচে যেমন ধান, আবার কোনো কোনো

গাছ বহুবছর বাঁচে যেমন আমগাছ। অর্থাৎ আমগাছ একটি বহুবর্ষী গাছ। এরকম বহুবছর ধরে কালের সাক্ষী হয়ে আমাদের দেশে এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে, ঢাকা থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার হরিণমারি ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামে, একটি আমগাছ বেঁচে আছে। সেই আমগাছটির বয়স নাকি প্রায় ২০০ বছর! গাছটি ১৪ শতাংশ জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। আমগাছ এত বিস্তৃত জায়গা জুড়ে থাকতে পারে এটা না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। গাছটিতে ৮ টি প্রধান শাখা বা কান্ড এবং ৩৫ টির মত প্রশাখা আছে। একটু ভাবুন তো ব্যাপারটি কী? সত্যাসত্য প্রমাণ করা কিছুটা কঠিন হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি দেখার সময় এসেছে বলে উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসেবে আমি মনে করি। এই ঐতিহাসিক গাছটিকে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন বিজ্ঞান জাদুঘরকেই নিতে হবে এবং আশা করি নিতে উদ্যোগী হবেন।

আমগাছকে ঘিরে আমাদের কিছু ইতিহাসের কথা বলতে চাই। ১৭৫৭ সালের কথা। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের সাথে ঔপনিবেশিক আগ্রাসন শক্তির সেই ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধের কথা, যে যুদ্ধের ফলে আমাদের স্বাধীনতা হারাতে হয়। আর সেই যুদ্ধটি হয়েছিল পলাশীর আম্রকাননে অর্থাৎ আমবাগানে। সেই ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তান আমলে ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সাথেও জড়িয়ে রয়েছে আমাদের জাতীয় এই গাছটি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন শুরু হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেইটের সেই আমতলা থেকেই। সর্বশেষে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথেও রয়ে গেছে আমাদের জাতীয় এ গাছের স্মৃতি। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আমতলায় গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার এবং ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে। সেই ঐতিহাসিক স্থানটি বর্তমানে মুজিবনগর নামে পরিচিত। দেখুন তো, আম গাছকে ঘিরে আমাদের কত ইতিহাস জড়িত! এটি উপলব্ধি করেই বোধকরি আমাদের সরকার আমগাছকে জাতীয় বৃক্ষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং সরকার যথার্থই করেছেন।

আপনারা হয়তো খনার নাম শুনেছেন। খনা ছিলেন একজন প্রকৃতি বিশেষজ্ঞ। প্রকৃতি, কৃষি এবং গাছকে ঘিরে তাঁর অসংখ্য উক্তি আছে যা খনার বচন নামে পরিচিত। এ প্রজন্মের অনেকেই হয়তো খনার বচন কী তা জানেন না। আমরা ছোট বেলায় বাবা-মায়ের কাছে অনেক খনার বচন শুনেছি। আমগাছকে ঘিরেও একটি খনার বচন আছে। বচনটি হলো, "পুষে কুশি, মাঘে বোল; ফাল্গুনে গুটি, চৈত্রে কাটিকুটি; বোশেখে জড়ায় আঁটি, জ্যৈষ্ঠে দুধের বাটি; আষাঢ়ে আদাড়ে আঁটি আর শ্রাবণে বাজায় বাঁশি।" এ বচন থেকে আমরা আমের জীবনচক্র অতি সহজে বুঝতে পারি অর্থাৎ আমের মুকুল আসে পৌষ মাসে, মাঘ মাসে প্রস্ফুটিত ফুলে রূপান্তরিত হয়, পরাগায়ন এবং নিষেকের পরে ফাল্গুনে আম গুটিতে পরিণত হয়। চৈত্র মাসে গ্রীষ্মের খরতাপে কাঁচা আম খেতে কার না ভালো লাগে! সেকারণেই খনা চৈত্র মাসকে কাটিকুটির মাস হিসেবে কাঁচা আম খাওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। আমরাও ছোটবেলায় মেলা থেকে ছোট চাকু কিনতাম কাঁচা আম খাওয়ার জন্য। এখন তো ঢাকা শহরে ফেরিওয়ালা বা ভাসমান দোকানী কাঁচা আম কেটে বিক্রি করে। যুগের কী পরিবর্তন! বৈশাখ মাসে গুটি আম পরিপক্কতার দিকে এগিয়ে যায় অর্থাৎ আমের মধ্যকার বীজটি শক্ত হতে থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম দিয়ে দুধভাত এক সময় খুব জনপ্রিয় ছিল বলে খনা জ্যৈষ্ঠ মাসকে দুধের বাটির মধ্যে পাকা আমকে বুঝিয়েছেন। এখন আর সেইভাবে আম-দুধ-ভাত আর খাওয়া হয় না, হয় কী? আম খাওয়া হলে আমের আঁটি বা বীজ রান্নাঘরের পাশের জায়গা, যা কিনা আদাড় হিসেবে পরিচিত, সেখানে ফেলা হয়। আর শ্রাবণ মাসে সেই বীজ থেকে আমের চারাগাছ হয় এবং গ্রামের ছেলেমেয়েরা সেই চারাগাছ উঠিয়ে অঙ্কুরিত গাছের দুটি বীজপত্রের মাঝে গাছের পাতা দিয়ে বাঁশি বাজাত, আমিও বাজিয়েছি। সেদিনের সেই আনন্দের কথা এখনও মনে পড়ে। ভাবুন তো, খনা পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া শুধুমাত্র প্রকৃতিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেই কী সুন্দরভাবে আমের জীবনচক্র বুঝিয়ে গেছেন। ধন্যবাদ দিই খনার সেই পর্যবেক্ষণ শক্তিকে। আম আমরা বিভিন্নভাবে খেয়ে থাকি যেমন, কাঁচা আম বা পাকা আম। গ্রাম বাংলায় কাঁচা আম ফালি ফালি করে কেটে রোদে শুকিয়ে আমচুর তৈরি করে কাঁচা আম সংরক্ষণ করা হত। আবার পাকা আমের নির্যাস থালা বা অন্য কোনো পাত্রে ঢেলে রোদে শুকিয়ে পাকা আমের নির্যাস সংরক্ষণের পদ্ধতি বহুল প্রচলিত। এখন আধুনিক যুগে নানভাবে আমের নির্যাস সংরক্ষণ করা হয় এবং ব্যবহার করা হয়। আমচুর এবং আমসত্ব অনেকের কাছেই খুব প্রিয় খাদ্য এই ভেবে যে, অন্য মৌসুমেও আমের স্বাদ পাওয়া যাবে। আমের আচার তৈরি করেও কাঁচা আম সংরক্ষণ করা হয়।

আমাদের দেশের একটি অতি পরিচিত এবং জনপ্রিয় খাবার হলো খিচুড়ি আর খিচুড়ির সাথে আমের আচার কে না পছন্দ করে বলুন? আপনিও করেন, আমিও করি। ভ্যানিলার মত এখন ম্যাংগো আইসক্রিম বাজারে এসেছে। তবে বর্তমান আধুনিকতার দৌরাত্ম্যের মধ্যেও এখনও আমচুর এবং আমসত্ব অনেকের কাছে প্রিয়। আমসত্বকে নিয়ে কবিগুরুর কবিতার একটু অংশ উদ্ধৃত করতে চাই তা হলো, "আমসত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলি দলি; সন্দেশ মাখিয়া দেই তাতে, হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিকে নিস্তব্ধ, পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।" কবিগুরুর কবিতার চরণে সেকালে আমসত্বের স্বাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং তিনি যে আমসত্ব খুব পছন্দ করতেন তা বুঝতে খুব বেশি কষ্ট হয় না।

বাংলাদেশ জীববৈচিত্রের দেশ। এদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কত না গুরত্বপূর্ণ গাছ। এরকম আরো একটি গাছের কথা এখন বলবো। গাছটি হলো বটগাছ যার বৈজ্ঞানিক নাম *Ficus benghalensis*। শহরে এর আধিক্য না থাকলেও গ্রামে-গঞ্জে এখনও বেশ বটগাছ দেখা যায়। আমের মতই বটগাছেরও উৎপত্তিস্থল এই ভারতীয় উপমহাদেশে। আমাদের দেশে ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার সুঁইতলা-মল্লিকপুরে একটি ঐতিহাসিক বটগাছ আছে। পৃথিবীতে যে কয়েকটি বৃহৎ এবং বর্ষীয় বটগাছ আছে তার মধ্যে সুঁইতলা-মল্লিকপুরের বটগাছটি অন্যতম। সামাজিক বনবিভাগ-এর তথ্যানুসারে কালিগঞ্জ উপজেলার বেথুলি গ্রামে (মল্লিকপুর-সুঁইতলা) প্রায় ২৫০-৩০০ বছর আগে স্থানীয় কুমারের কুয়ার দেয়ালে এই গাছটি জন্মেছিল। সুঁইতলা-মল্লিকপুরের মূল বটগাছটি মারা গেছে। তবে মূল বটগাছটি মারা গেলেও এখন ৪৫ টি ভিন্ন ভিন্ন গাছে প্রায় ২.০৮ একর জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে এই বটগাছটি। আশা করি এই বটগাছটির বিষয়টিও বিজ্ঞান জাদুঘর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন। কুয়ার দেয়াল থেকে জন্ম হলেও তার ব্যাপ্তির কথা বুঝতে অসুবিধা হয় নি আশা করি।

বটগাছটি বড় হলেও এর ফল কিন্তু আমের মত বড় নয়। এই ছোট ফলের মধ্যেই থাকে অসংখ্য ছোট ছোট বীজ। বটগাছের ছোট্ট বীজের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তীব্র শক্তি বা ক্ষমতা। সেই শক্তি বা ক্ষমতা দিয়েই সে অনেক কঠিন কাজকে সহজ করে নিতে পারে। দেখুন না, বটগাছ কত প্রতিকূল পরিবেশে, অনাদরে, অযত্নে কত ভালোভাবে জন্মাতে পারে। পুরনো দালানকোঠার ইটের ফাঁকে এমনকি সিমেন্টের ঢালাই দেয়া ছাদেও কঠিন পরিবেশে কত স্বচ্ছন্দে বেড়ে ওঠে বটগাছ। এই বটগাছকে ঘিরেই একদিনের কথা বলি। আমাদের জীববিজ্ঞান অনুষদের মাননীয় ডিন এবং আমি একটি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুষদের ডিন মহোদয়ের অফিসে গিয়েছি, অফিসটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে, দশম তলায় অবস্থিত। পরীক্ষা শেষে ডিন মহোদয় ওয়াশরুমে গেলেন। ওয়াশরুম থেকে বের হওয়ার সময় তিনি আমাকে ডাক দিলেন কোনো একটা জিনিস দেখাবেন বলে। আমি একটু অবাকই হলাম এইভেবে যে ওয়াশরুমে আবার কী দেখাবেন তিনি। কৌতূহল ভরে এগিয়ে গেলাম। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছাদের দিকে তাকাতে বললেন। আমি তাকালাম। তিনি বললেন, ঐ দেখ ছাদের উপর একটি ছোট্ট বটগাছ। গাছটি দেখে মনে হবে আজকাল ছাদের উপর যেমন বাগান করা হয় তেমনি বোধহয় কেউ ঐ বটগাছটি লাগিয়ে রেখেছে। সত্যি অবাক হওয়ার মত। ভাবুন তো, কী কঠিন পরিবেশে গাছটি বেঁচে আছে! এমনিভাবেই অনেক গাছপালা পাহাড়ের বুকে বেঁচে আছে এবং থাকবে স্বচ্ছন্দে। বটগাছ আবার কখনো পরগাছা হয়ে অন্য গাছের উপর জন্মায়। পরগাছা হয়ে জন্ম নিয়ে সে তার আশ্রয়দাতাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে এককভাবে বেঁচে থাকে। একই অঙ্গে এতরূপ, যা কিনা সচরাচর অন্য গাছে দেখা যায় না। বিচিত্র প্রকৃতির এই বটগাছ। বটগাছের নিকট আত্মীয় হলো অশ্বত্থ গাছ *(Ficus religiosa)*। আপনি জানেন কোনটি বটগাছ আর কোনটি অশ্বত্থগাছ? বটগাছ আর অশ্বত্থগাছ খুব সহজেই চিনতে পারবেন পাতা দেখে। বটগাছের পাতা বেশ পুরু, অনেকটা চামড়ার মত এবং পাতার কিনারা অনেকটা গোলাকার ও মসৃণ। অন্যদিকে অশ্বত্থগাছের পাতা বটের তুলনায় পাতলা এবং পাতার কিনারাটি বেশ সূঁচালো। আশা করি, এরপর বট আর অশ্বত্থ গাছ চিনতে কেউ ভুল করবেন না। বট আর অশ্বত্থ গাছ গ্রামের লোকজন ও পথচারীদের কাছে অনেকটা প্রাকৃতিক ছাতা এবং হাট বা মেলার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

বটগাছকে ঘিরে আমাদের অনেক ইতিহাস আছে যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা। এখানেই উত্তোলিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা। এই বটগাছকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের সূতিকাগার বলা হয়ে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে হানাদার বাহিনী প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে নির্মমভাবে সেই ঐতিহাসিক বটগাছকে ধ্বংস করে ফেলে। এখন আপনারা যে বটগাছটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে দেখতে পান এটি কিন্তু সেই বটগাছটি নয়। স্বাধীনতার উত্তরকালে প্রাক্তন মার্কিন সিনেটর জন এফ কেনেডি বাংলাদেশ ভ্রমণকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটগাছের গুরুত্ব উপলব্ধি করে অপসারিত বটগাছটির স্থলে একটি স্মারক বট গাছের চারা রোপণ করেন, যেটি বর্তমানে কলাভবনের বটতলার বটগাছ হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত। এরপর আসি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বটগাছের কথায়। আপনারা সকলেই জানেন এবং উপভোগ করেন এদেশের একমাত্র সর্বজনীন উৎসব পহেলা বৈশাখের উৎসব। যার শুরু রমনার বটমূলে। প্রতি বছর এই রমনা বটমূলে নববর্ষে ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে শুরু হয় ছায়ানট কর্তৃক পরিচালিত এক মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠান, যা আপামর জনতা মনভরে উপভোগ করতে ভোর না হতেই ছুটে যায় ঐতিহাসিকে সেই রমনার বটমূলে। এটি এখন ইতিহাসের অংশ। বাংলা একাডেমি চত্বরেও তেমনি একটি বটগাছ আছে যার বেদিমূলে বাংলা একাডেমি ভিত্তিক অনেক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই ঐতিহাসিক গাছগুলোকে বিজ্ঞান জাদুঘর সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে পারে।

এরপর আসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আর একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কথায়। সেটি হলো চারুকলা অনুষদ। এটি বাংলাদেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের একটি নিউক্লিয়াস। এখানে এখন পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব, বসন্ত উৎসব জাঁকজমকের সাথে পালিত হয়। চারুকলা চত্বরে একটি বেশ বড় এবং বয়সী বকুল গাছ *(Mimusops elengi)* আছে। এই বকুল গাছটি তার শাখা-প্রশাখা আর সবুজ পাতা দিয়ে গ্রীষ্মকালে বেশ বড় একটা অংশকে ছায়া দিয়ে ঢেকে রাখে। এই গাছ এবং এর ছায়া-সুশীতল নির্মল বাতাসকে কেন্দ্র করেই চারুকলা অনুষদের সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যারা আমার এই লেখাটি পড়ছেন তারা কী সকলে বকুলগাছ দেখেছেন বা চেনেন? বকুলগাছ না চিনলেও বকুলফুল নিশ্চয়ই সকলে চেনেন এ ফুলের মালাকে ঘিরে। এ ফুলের একটি মিষ্টি গন্ধ আছে যা মানুষের মনে ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে। সেকারণেই প্রিয়জনকে ফুলের মালা উপহার দেয়ার কথা ভাবলেই গ্রীষ্মকালে বকুল ফুলের মালার বিষয়টি মাথায় চলে আসে। ঢাকাতে বিভিন্ন জনসমাগমস্থলে ছোট ছোট পথশিশুরা এই ফুলের মালা বিক্রি করে থাকে। এখন হয়তো বুঝতে পেরেছেন কোন ফুলটির কথা বলছি। যারা চারুকলায় গিয়েছেন তারা নিশ্চয়ই পুরো এলাকাটি ঘুরে দেখেছেন। যারা এখনো দেখেন নি, তাদের বলছি একদিন নিশ্চয়ই সময় করে যাবেন। দেখবেন, এখানে পরিকল্পনায় অপরিকল্পনায় কত জানা অজানা গাছ চারুকলাঅনুষদের প্রকৃতিকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে রেখেছে। দেখলে ভালো লাগবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

আমাদের দেশের জাতীয় ফুলের নাম কী বলুন তো? বিব্রত না করে বলে দিই, শাপলা। শাপলা একটি জলজ উদ্ভিদ। এতক্ষণ যে তিনটি গাছের কথা বলে এসেছি তারা সকলে নির্ভেজাল স্থলজ উদ্ভিদ। এদেশে এত ফুল থাকতে শাপলা কেন জাতীয় ফুল এ প্রশ্ন করতেই পারেন। এর উত্তর নিশ্চয় যারা জাতীয় ফুল নির্বাচন করেছেন তাঁদের জানা। আমি উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসেবে এর যথার্থতার জন্য বলতে পারি যে আমাদের দেশে প্রচুর জলাভূমি আছে যেখানে যত্নে-অযত্নে শাপলা জন্মে থাকে। যারা বিল বা হাওড় দেখেছেন তারা অবশ্যই আমার সাথে একমত হবেন যে হ্যাঁ, শাপলাকে জাতীয় ফুল হিসেবে নির্বাচন যথার্থ। এদেশ সাধারণত তিন রঙের (সাদা, লাল ও নীল) শাপলা আছে তার মধ্যে সাদা শাপলাটি আমাদের জাতীয় ফুল *(Nymphaea pubescens)*। জলাভূমিতে যখন বিভিন্ন রঙের শাপলা ফুটে থাকে তখন যেন প্রকৃত বাংলাদেশের ছবি ভেসে ওঠে। গ্রাম বাংলার হাওড় বা বিলের মধ্য দিয়ে নৌপথে চলাচলের সময় নৌকার দুপাশে শাপলা দেখা যায়। শাপলা ফুলের পাতার উপর কখনো কখনো নানা রঙের ব্যাঙ দেখতে পাবেন, এটি যেন শাপলার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেয়। শাপলা ফুল যেমন দর্শণীয় তেমনি শাপলা ফুলের কান্ড অনেকের কাছেই একটি প্রিয় সবজি। আমি নিজেও শাপলা খুব পছন্দ করি। আমার শৈশব কেটেছে গ্রামে। আমি আমার গ্রামটিকে দারুণভাবে উপভোগ করেছি প্রতিটি পরতে পরতে। শরতে শাপলা ফুল এবং এর সবজি আমার নিত্যদিনের সঙ্গী ছিল। আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে মাগুরা-যশোর হাইওয়ের দুধারে বর্ষার পানিতে এবং ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে শরতের আগমনে শাপলা ফুলে ভরে

যেত সব জলাধার। শাপলা ফুল যেখানে জন্মায় সেখানে নাকি সাপ থাকে। এটি একটি প্রবাদের মত ছিল। তাই অনেকে শাপলা তুলতে ভয় পেত, আমিও একটু একটু পেতাম। তাই মায়ের অনুরোধে অনেক সময় ভয়ে ভয়ে শাপলা তুলে আনতাম সবজি খাওয়ার জন্য। কখনো কখনো শাপলা ফুল দিয়ে বিনা সুতায় মালা গেঁথে গলায় পরতাম। বিনা সুতায় মালা এটা আবার কী? ভাবছেন বিনা সুতায় আবার মালা হয় নাকি? হ্যাঁ, সত্যিই হয়। যদি কেউ এই ফুল দিয়ে বিনা সুতায় মালা তৈরি করতে চান তাহলে শাপলা তুলে বৃন্তসহ ফুল আমার কাছে নিয়ে আসবেন, শিখিয়ে দিব এ কথা দিলাম। শাপলা ফুল পরিপক্ক হলে তাকে ঢ্যাপ বলে। ঢ্যাপের মধ্যে যে বীজ থাকে তা থেকে খই হয় এটা কী জানেন? এটি ঢ্যাপের খই বলে পরিচিত। এগুলো এখন অনেকটা হারিয়ে যেতে বসেছে। শাপলা গাছের নীচের অংশ যেটি পানির নীচে মাটিতে আবদ্ধ থেকে গাছকে মাটির সাথে আবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে এবং মাটি থেকে গাছের প্রয়োজনীয় পানি ও খনিজ পুষ্টি সরবরাহে সাহায্য করে থাকে। গাছের এ অংশকে আমরা মূল হিসেবে জানি। শাপলার ক্ষেত্রে মূল পরিবর্তিত হয়ে রাইজোমে পরিণত হয় যা শালুক নামে পরিচিত। সেটিও গ্রামে খাদ্য হিসেবে পরিচিত। এ থেকে বোঝা গেল শাপলার সবকিছুই আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী।

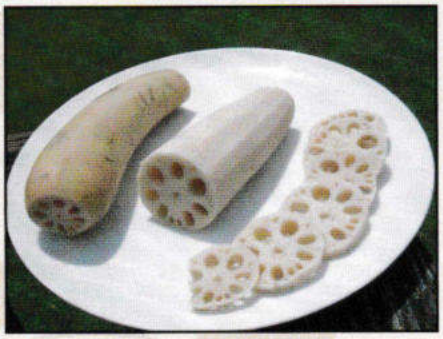

চিত্রে: পদ্মের রাইজোম বা রেনকন

শাপলার নিকট আত্মীয় হলো পদ্মফুল *(Nelumbo nucifera)*। এটি একটি বহুবর্ষী জলজ উদ্ভিদ এবং ভারতের জাতীয় ফুল। এর বীজ বহুদিন ভালো থাকে এবং সফল অঙ্কুরোদ্গমের মাধ্যমে নতুন পদ্মফুলের চারা সৃষ্টি করতে পারে। শোনা যায়, প্রায় ১,৩০০ বছর পুরনো উত্তর-পূর্ব চীনের লেকের কাদামাটির নিচে পড়ে থাকা পদ্মের বীজ থেকেও নতুন পদ্মগাছ হয়েছে। পানি এবং যত্নের অভাবে এটিও এখন আমাদের দেশ থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলে এখন খুব একটা পদ্মফুল দেখা যায় না। আমি যে গ্রামে বড় হয়েছি তার পাশের গ্রামেই একটি বিল ছিল সেখানে প্রচুর পদ্মফুল ফুটত। প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের বিলের সৌন্দর্য সত্যি অপরূপ। এখন সেই গুড়পাগলা বিলে পদ্মফুলের আর কোনো চিহ্নই নেই। পদ্মফুলের পাতা বেশ বড় এবং অনেকটা থালার মত দেখতে। হেমন্তে পদ্ম পাতার উপর পড়ে থাকা শিশির বিন্দু যেন মুক্তার মত দেখায়। প্লাস্টিকের যুগের পূর্বে পদ্মফুলের পাতা থালার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এটিও আমার বিশ্বাস অনেকেই জানেন না। গ্রামের হাটে বা মেলায় আমরা যখন রসগোল্লা কিনতাম তখন মিষ্টির দোকানি সেগুলোকে পদ্মপাতায় মুড়ে দিতেন। প্লাস্টিকের যুগে এগুলো সব হারিয়ে গেছে। শাপলার মত পদ্মফুল পরিপক্ক হলে যেটি হয় তার নাম হলো পদ্মচাক। অর্থাৎ ঢ্যাপ আর পদ্মচাক চাচাতো ভাই। পদ্মচাক আবার কী ধরনের নাম? পদ্মচাক নামকরণ হয়েছে এর আকৃতি থেকে। এটি দেখতে অনেকটা মৌচাকের মত আর পদ্মফুল থেকে হয়েছে বলেই এর নাম পদ্মচাক। পদ্মচাকের মধ্যে থাকে ভক্ষণযোগ্য শাঁসালো বীজ যা আমরা ছোট বেলায় খেয়েছি। এ লেখাটি যখন লিখছি তখন কিছু সময়ের জন্য আমার পাশে ছিল একাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়া আমার মেয়েটি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঢ্যাপ বা পদ্মচাক চেনো? জানবে না জেনেই কেন যেন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করলো। তার উত্তর ছিল চিনিনা। আসলে চিনবে কেমন করে সে তো ঢাকা শহরে বড় হয়েছে আর আমিও তাকে কখনো ঢ্যাপ বা পদ্মচাক চিনিয়ে দিইনি। ঢাকা শহরে এটি খুব একটা দেখা যায় না। এটি আমারই ব্যর্থতা, এই ব্যর্থতার দায় আমাকেই নিতে হবে এবং নিলাম। যদি কখনো সুযোগ আসে তখন অবশ্যই তাকে চিনিয়ে দেব। শাপলার মত পদ্মফুলের রূপান্তরিত মূল বা রাইজোম যে ভক্ষণযোগ্য সেটি আমার জানা ছিল না। আমাদের দেশে এটিকে খেতে অন্তত আমি কখনো দেখিনি বা শুনিনি। এটি জানলাম জাপানে গিয়ে। জাপানে এটি রেনকন নামে পরিচিত। আমি পিএইচডি ডিগ্রি লাভের জন্য ১৯৯৪ সালে প্রথম জাপানে যাই। তখনই প্রথমবারের মত পদ্মের রাইজোমের টেম্পুরা (ফ্রাই) খাই যা 'রেনকন' হিসেবে জাপানে পরিচিত। রাইজোমের পাতলা স্লাইস করে টেম্পুরা পাউডার (অনেকটা বেসনের মত) দিয়ে ডুবো তেলে ভেজে রেনকনের টেম্পুরা তৈরি করা হয়। তখন এটি কোন গাছের অংশ তা জানতাম না। এরপর ২০০৪ সালে যখন পোষ্ট ডক্টোরাল গবেষণায় পুনরায় জাপানে যাই তখন এটি কোন গাছের অংশ জানার চেষ্টা করি এবং অবশেষে জানতে পারি এটি পদ্মফুলের মূলের

পরিবর্তিত অংশ। এটি জানার পর বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে পদ্মফুলের রূপান্তরিত মূল এত সুস্বাদু খাদ্য হতে পারে। জাপানে বেড়াতে গেলে এর স্বাদ নিতে কেউ ভুলবেন না যেন। আশা করি খেলে ঠকবেন না।

জাতীয় বৃক্ষ ও জাতীয় ফুল সম্বন্ধে তো কিছুটা বলা হলো। এখন যদি জাতীয় ফল সম্বন্ধে কিছু না বলি তাহলে কি ঠিক হবে? তাই এখন আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠাল *(Artocarpus heterophyllus)* সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আমাদের দেশে আমগাছের মত কাঁঠালগাছও সব এলাকায় পাওয়া যায়। তবে ঢাকার আশেপাশের এলাকা গাজীপুর, কাপাসিয়া, নরসিংদীতে প্রচুর কাঁঠাল হয় বলে আমার ধারণা। আপনারা সকলে কাঁঠালগাছ না দেখলেও কাঁঠাল সকলেই দেখেছেন বা পাকা কাঁঠাল খেয়েছেন। পাকা কাঁঠালের কথা বললাম কারণ কাঁচা কাঁঠালের স্বাদ অনেকেই গ্রহণ করেননি। কাঁচা কাঁঠালকে আমরা ইঁচড় হিসেবে খেয়ে থাকি। সত্যি কথা বলতে আমি পাকা কাঁঠাল থেকে কাঁচা কাঁঠাল খেতেই বেশি পছন্দ করি। পৃথিবীতে যে কয়েকটি বড় ফল দেখা যায় তার মধ্যে কাঁঠাল অন্যতম। এটি একটি যৌগিক ফল। কাঁঠালের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ফলটি গাছের কাণ্ড থেকেই বেশি হয়ে থাকে। জাতীয় ফুল শাপলার মত এই গাছটিও আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। এর সব কিছুই কোনো না কোনো কাজে ব্যবহারযোগ্য। যেমন কাঁচা কাঁঠাল এবং পাকা কাঁঠালের বীজ সবজি হিসেবে এবং পাকা কাঁঠাল ফল হিসেবে একটি উপাদেয় খাদ্য। এটিতো গেল মানুষের খাবারের কথা। এবার বলি এর পাতার কথা যা কিনা ছাগলের প্রিয় খাদ্য। আপনারা লক্ষ্য করেছেন কোরবানির ঈদে পশুর হাটের পাশেই কাঁঠালের পাতা বিক্রি হতে। অর্থাৎ কাঁঠাল গাছের পাতা, ফল ও বীজ আমাদের নিত্যদিনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে। এবার আসি কাঁঠাল গাছের কাঠের কথায়। পরিপক্ক কাঁঠাল গাছের কাঠও একটি ভালো মানের কাঠ। তাইতো গ্রামের লোকজন এ গাছের কাঠ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করে থাকে। এতক্ষণে আমাদের জাতীয় বৃক্ষ এবং অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ সম্পর্কিত কিছু জানা অজানা তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে পেরেছি বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

চিত্রে: রুটিফল

আমাদের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের বোটানিক্যাল গার্ডেনে কাঁঠালের এক আত্মীয় আছে যেটি শ্রীলংকা থেকে এসেছে। কাঁঠালের এই আত্মীয়টির নাম হলো রুটিফল বা ব্রেডফ্রুট *(Artocarpus altilis)*। এই ফলটির নাম এমন কেন হলো নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে? হ্যাঁ বলছি, এই ফলটি অনেকটা কাঁঠালের মত। তবে আকারে একটু ছোট, গোলাকৃতি এবং কাঁঠালের মত ততটা কাঁটাযুক্ত নয়। এই ফলটি সাধারণত সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আবার এটিকে রুটির মতও খাওয়া যায় বলে অনেকে এটিকে রুটির বিকল্প হিসেবে দেখে থাকেন। রুটির মত খেতে হলে সবুজ ফলটিকে খোসা ছাড়িয়ে ছুরি দিয়ে গোল স্লাইস করে উনুনে, তাওয়ায় বা ফ্রাই প্যানে বসিয়ে রুটির মত ভেজে খাওয়া যায়। রুটির মত খাওয়া হয় বলেই একে রুটিফল বলে। এই লেখার পাঠকদের অনেকেই এ নামটি প্রথম শুনছেন বলে আমার ধারণা। গাছটি দেখতে চাইলে আমাদের গার্ডেনে এসে দেখতে পারেন।

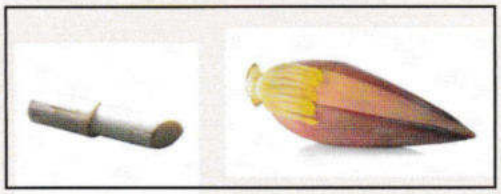
চিত্রে: কলার থোড়

চিত্রে: কলার মোচা

এবার আসি আমাদের দেশে আর একটি বহুল পরিচিত গাছের কথায়। সে গাছটি হলো কলাগাছ *(Musa sp.)*। কলা সকলেই চেনেন। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রজাতির কলাগাছ আছে। আমরা সাধারণত দুধরনের কলা চিনি। একটি সবজি *(Cooking banana)* হিসেবে আর অন্যটি ফল *(Fruit banana)* হিসেবে। কলা আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারি সবজি ও ফল। সবজি হিসেবে পরিচিত কলাকে কাঁচাকলা এবং ফল হিসেবে ব্যবহৃত কলাকে পাকাকলা বলা হয়। কাঁচা অথবা পাকাকলা অনেক প্রকারের আছে। যেমন নরসিংদী এলাকার সাগরকলা খুবই সুস্বাদু। সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় কাঁচা অথবা পাকাকলা থাকা একান্ত

বাঞ্ছনীয়। কলাগাছের মোচা (কলার কাঁদির অগ্রভাগের অংশ) এবং থোড় (কলাগাছে কলা আসার পর গাছের কাণ্ডের ভিতরের অংশ) সবজি হিসেবে খাওয়া হয় এবং অনেকের কাছে এগুলো অত্যন্ত প্রিয় খাবার। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলে কলার মোচা ও থোড় নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে। এলাকা ভেদে আমি যেটিকে থোড় বললাম সেটিকে মোচা তদ্রুপ মোচাকে থোড় বলা হয়। কলা, থোড় এবং মোচায় প্রচুর খনিজ লবণ বিশেষ করে লৌহ জাতীয় পদার্থ থাকে যা মানুষকে রক্ত শূন্যতা থেকে রক্ষা করে। কলাগাছের আরও একটি ব্যবহারের কথা আমাদের অনেকের অজানা। সেটি হলো কলাপাতার ব্যবহার। কলাপাতা এক সময় থালার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হত। আমি আমার শৈশবে গ্রামে বড় কোনো অনুষ্ঠানে যেমন, বিবাহ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত অতিথি আপ্যায়নে থালার বিকল্প হিসেবে কলাপাতা ব্যবহার করতে দেখেছি। এখনকার প্লাস্টিকের থালার মতই এটিও থালা হিসেবে ব্যবহৃত হত। এটি একবার ব্যবহার করে ফেলে দেয়া হত যা ছিল পরিবেশবান্ধব। অর্থাৎ ফেলে দেওয়া পাতা জৈব অবক্ষয়ের মাধ্যমে দ্রুত মাটিতে মিশে যেত। ফলে পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকত। অন্যদিকে এখনকার প্লাস্টিকের থালার জৈব অবক্ষয় হয় না। ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

কলাগাছের আরও একটা ব্যবহার আছে যা হয়তো অনেকের অজানা। কলাগাছ দিয়ে ভেলা তৈরির সত্যি গল্প শোনাতে চাই। বর্ষাকালে কলাগাছের ভেলা আমরা নিজ হাতে বানিয়েছি এবং খুব মজা করে ভেলায় চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। সেসব দিন যে কত মজার ছিল, তার সবটুকু বোধহয় এ লেখার মাঝে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। আপনারা বেহুলা-লক্ষীন্দরের গল্প হয়তো জানেন। সেই গল্পে বেহুলার স্বামী সাপের দংশনে মারা যায়। বেহুলাও প্রতিজ্ঞা করে তার স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলবে। তাই সে তার স্বামীকে কলার ভেলায় শুইয়ে নদীতে দিনের পর দিন ভেসে বেড়িয়েছে এবং অবশেষে স্বামীকে বাঁচিয়েও তুলেছে। হয়তো সেই বিশ্বাসে গ্রামের লোকজন এখনও সাপে কাটা মানুষকে ভেলায় শুইয়ে ভাসিয়ে দেয় এই আশায় যে সে হয়তো লক্ষীন্দরের মত বেঁচেও যেতে পারে। আরও একটা ভেলায় ভাসানোর সত্যি গল্প না বললে খুব অন্যায় করা হবে। সে গল্প হলো বাউল সম্রাট লালনের গল্প। প্রাচীনকালে বসন্ত হলে মানুষ খুব ভয় পেয়ে যেত। বসন্তে আক্রান্ত রোগীর সেবা থেকে সাধারণ মানুষ এমনকি ডাক্তারও দূরে থাকত। সেই বসন্তের কারণে অনেক সময় গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তখন বসন্ত ছিল এক ভয়াবহ রোগ। সেই ভয়ের কারণেই বসন্তে আক্রান্ত রোগীকে কখনো কখনো নদীতে ভাসিয়ে দেয়ারও প্রচলন ছিল। এমনটি হয়েছিল বাউল সম্রাট লালনের বেলায়। লালনের বসন্ত হলে তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। ভাগ্যের জোরে লালন বেঁচে যান এবং পুনর্জীবন লাভ করেন। তিনি সেই পুনর্জীবন লাভ করে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বুকে কুঠারাঘাত হেনে মানবধর্মকে মানুষের মাঝে গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আপনারা জানেন লালনের কোনো ধর্ম নেই। তার কারণ হলো বসন্তে আক্রান্ত হওয়া, কলার ভেলায় ভেসে যাওয়া, মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া এবং পুনর্জীবন লাভের পর এক সঙ্গীতগুরুর সান্নিধ্যে আসা। সে গল্প না হয় আর একদিন করা যাবে। আজ কলার ভেলার মধ্যেই রয়ে গেলাম।

"তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সবগাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে", রবীন্দ্রনাথের 'তালগাছ' নামক কবিতার চরণ থেকে সাহিত্যে গাছের ব্যবহার বোঝা গেল। কবিগুরু তাঁর অনেক কবিতায় এদেশের অনেক গাছকে ব্যবহার করেছেন। তাল *(Borassus flabellifer)*, খেজুর *(Phoenix sylvestris)*, পাম জাতীয় গাছ আমাদের দেশের ঐতিহ্য। বিশেষ করে বৃহত্তর যশোর জেলায় খেজুর গাছের আধিক্য লক্ষণীয়। তালগাছ ও খেজুর গাছ থেকে রস পাওয়া যায়। আমরা সকলেই কম বেশি খেজুরের রস খেয়েছি বলে আমার বিশ্বাস। এ দুটি গাছের রসের উৎসস্থল এবং সময়কাল ভিন্ন। তালের রস সাধারণত গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায়। তালের রস হয় তালগাছের ফুলের মঞ্জরী থেকে আর খেজুরের রস আসে কান্ডের শীর্ষভাগে মুকুটস্বরূপ পাতার ঠিক নিচে আংশিক কর্তিত কান্ড থেকে। আমরা জানি গাছ তার জৈবিক প্রক্রিয়ায় ভাস্কুলার বান্ডলের সাহায্যে পানি, খনিজ লবণ এবং খাদ্য পরিবহণ করে থাকে। ভাস্কুলার বান্ডল দুধরনের টিস্যু দিয়ে গঠিত যথা জাইলেম এবং ফ্লোয়েম। জাইলেমের কাজ হলো মাটিস্থ পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে পাতায় পৌঁছে দেয়া। অন্যদিকে ফ্লোয়েম পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য গাছের সব জায়গায় পৌঁছে দেয়। যেসব ব্যক্তি গাছের রস আহরণের সাথে যুক্ত তাঁদেরকে বলে গাছি। এরা বিজ্ঞানী না হলেও বিজ্ঞানীর মতই তাঁদের দর্শন। সেকারণে তাঁরা জানেন কীভাবে খেজুরগাছ থেকে রস আহরণ করতে হয়। সেই দর্শনেই তাঁরা খেজুর গাছের রস আহরণের জন্য শীতকালকে নির্বাচন করেন। কারণ এই শুষ্ক মৌসুমে মাটি থেকে গাছের পানি শোষণ কম হয়। ফলে কান্ডের শীর্ষভাগে খুব সাবধানে ফ্লোয়েমের খাদ্য পরিবহন নালী

কেটে রস আহরণ করা সম্ভব হয়। একজন দক্ষ গাছি তার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে গাছ কেটে রস আহরণ করে থাকে। ফলে দক্ষ গাছির আহরিত রসের স্বাদ অপূর্ব। বিজ্ঞানের আলোকে এর ব্যাখা হলো, একজন দক্ষ গাছি গাছ কাটার সময় শুধু ফ্লোয়েমের অংশেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারে অন্যদিকে অদক্ষ গাছি ফ্লোয়েমের সাথে সাথে কিছুটা জাইলেম কেটে ফেলে। ফলে অদক্ষ গাছির আহরিত রস তেমন স্বাদের হয় না। রসের স্বাদেই গাছির দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। খেজুরের রস থেকে তৈরী গুড় এদেশে খুবই জনপ্রিয়। বিশেষ করে নলেন গুড় আর চিতৈ পিঠা একটি জনপ্রিয় খাবার। গুড়ের পায়েস এবং ইদানিং কালের গুড়ের সন্দেশের স্বাদের কথা কেউ ভুলতে পারবে না। উদ্ভিদবিজ্ঞানের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের কলকাতা থেকে কয়েকজন বিজ্ঞানী আমাদের বিভাগে এসেছিলেন। চায়ের টেবিলে এ নিয়ে কথা হচ্ছিল। তাঁরা জানালেন কলকাতায় খেজুরের গুড়ের ব্যবহারের কথা, যেটি আমার জানা ছিল না। কলকাতায় নাকি আইসক্রিমে খেজুরের গুড় ব্যবহার করা হচ্ছে এর মিষ্টি স্বাদ এবং ফ্লেভারের জন্য। আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে আমাদের দেশের এখন একটি জনপ্রিয় আইসক্রিম হলো ম্যাংগো ফ্লেভারের আইসক্রিম। আশা করি আমাদের দেশেও একদিন গুড়ের আইসক্রিম দেখা যাবে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই ব্যাপারটি নিয়ে ভাববেন। সেই আশায়ই রইলাম। পাকা খেজুর খাওয়া যায় এবং পাকা খেজুরে কাঁদির কথা পল্লীকবি জসীমউদ্দিনের কবিতায়ও উদ্ধৃত হয়েছে। আমাদের দেশের খেজুর আর আরব দেশের খেজুরের প্রকরণ এবং স্বাদও ভিন্ন। আমাদের দেশের খেজুর ফল তেমন মাংসালো নয়। অন্যদিকে আরব দেশের খেজুর খুবই মাংসালো। খেজুর অনেকটা সম্পূর্ণ খাদ্য। এখানে সবধরনের খাদ্য উপাদান বিদ্যমান বলেই মরুবাসিন্দাদের জন্য এটি একটি উত্তম খাদ্য। একারণে রোজার মাসে ইফতারে এর ব্যবহার সর্বাধিক। খেজুর ছাড়া ইফতার অনেকটা অকল্পনীয়। আমাদের দেশে খেজুরগাছ অনেকটা অনাদরেই এখানে সেখানে জন্মায় বলে এটিকে চাষ করা অনেকটা সহজ।

আমাদের দেশে অনেক গ্রামেই নদী নেই। সেসব গ্রামে সাধারণত গোসলের জন্য পুকুর ব্যবহার করা হয়। আমাদের গ্রামেও নদী নেই তবে খাল আছে। আমরা প্রতিদিন পুকুরে গোসল করতাম। পুকুরে ওঠানামার জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘাট ব্যবহার করা হতো। সে ঘাটে ওঠানামার জন্য খেজুরের গাছ আর বাঁশ ব্যবহার করে গাছের সিঁড়ি তৈরি করা হতো। আমি যে কথাগুলো বলছি তা কিন্তু একদম সত্যি কথা। একটুও মিথ্যা নয়। আমি নিজেও খেজুর গাছ দিয়ে ঘাট বানিয়েছি। এত উপকারি গাছকে আসুন না আমরা যত্ন করি। খেজুর গাছ শাখা-প্রশাখাবিহীন বিধায় এ গাছগুলো বেশি জায়গা নিয়ে বিস্তৃত হয় না। সেকারণে এগ্রোফরেস্ট্রি বিষয়টি অনুধাবন করে ক্ষেতের আইলে বা গ্রামের রাস্তার দুধারে এগুলোকে পরিকল্পিতভাবে লাগাতে গ্রামবাসীকে উৎসাহিত করতে পারেন।

আগেই বলেছি, খেজুরের রস শীতকালে হলেও তালের রস হয় গ্রীষ্মকালে। তালের রস আর খেজুরের রসের রং এবং স্বাদও ভিন্ন। তালের রস আবার 'তাড়ি' হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। অথচ খেজুরের রস কখনই তাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। এর কারণ কী বলতে পারেন? যাদের অনুজীব এবং ফার্মেন্টশন সম্বন্ধে ধারণা আছে তারা তাড়ির রহস্যটা নিশ্চয়ই জানেন। যারা অবগত নন তারা হয়তো আজ জেনে যাবেন এই লেখাটি পড়ে। আগেই বলেছি তালের রস হয় গ্রীষ্মকালে যখন তাপমাত্রা অনুজীব বিশেষ করে ঈস্ট জাতীয় ছত্রাকের জন্মানোর জন্য এক উত্তম সময়। ইস্ট তালের রসের শর্করা জাতীয় খাদ্য খেতে খুব পছন্দ করে। গাছি যখন হাঁড়িতে গাছ থেকে রস আহরণ করে তখন বাতাস থেকে ইস্ট জাতীয় অনুজীব সেই রসে প্রবেশ করে এবং সারারাত ভরে রসের শর্করা খায় এবং ফার্মেন্টশন প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল উৎপন্ন করে। সেই সামান্য পরিমাণ তালের রসই 'তাড়ি' নামে পরিচিত। এটাকে আবার আমরা পান্তাভাতের সাথেও কিছুটা তুলনা করতে পারি। কারণ পান্তাভাতেও ফার্মেন্টশন প্রক্রিয়ায় কিছুটা অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। তালের রস খাওয়া হলো। এখন তালগাছের ফলের কথায় আসি। তাল আমরা সাধারণত তিনভাবে খেয়ে থাকি। কাঁচা তালের শাঁস গ্রীষ্মকালের একটি অতি প্রিয় খাবার। অন্যদিকে পাকা তালের নির্যাসও একটি উপাদেয় খাদ্য। পাকা তাল দিয়ে তৈরি পিঠাও অনেকের কাছে প্রিয়। ভাদ্র মাসে সাধারণত তাল পাকে। এসময় খুব গরম পড়ে। সেকারণে অনেকে বলে থাকেন তাল পাকানো গরম। পাকা তাল খাওয়ার পর ফেলে দেয়া বীজ থেকে অঙ্কুরিত তালের বীজের শাঁসও খাওয়া যায়। আমি ছোট বেলায় অনেক তালের শাঁস খেয়েছি। এটি অনেকটা নারকেলের শাঁসের মত। আপনারা নারকেলের শাঁসকে এখন অনেকেই ঢাকা শহরে ভ্যানে বিক্রি হতে দেখেছেন।

তালগাছের আরও একটি ব্যবহার আছে যা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। বর্ষাকালে তালগাছ দিয়ে নৌকা বানিয়ে গ্রামের লোকজন যাতায়াতের এক অন্যতম বাহন হিসেবে ব্যবহার করত। একে ডোঙা নৌকা বলে। আমি নিজেও এই ডোঙা নৌকায় চড়েছি। একটি গাছ দিয়েই একটি ডোঙা নৌকা তৈরি হয় বলে ডোঙ্গা নৌকায় ওঠানামার সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় নইলে ডোঙাটি ডুবে যেতে পারে। প্রাচীনকালে বর্ষার সময় এদেশের গ্রাম বাংলা চারিদিক পানিতে থৈথৈ করত। বিল এলাকায় সেই থৈথৈ পানিতে আমন ধান বিস্তৃত থাকত, যে দৃশ্য এখন আর দেখা যায় না। আমরা সেসব দৃশ্য মনভরে উপভোগ করেছি। কৃষকেরা সেই ধানের মধ্য দিয়ে মাঠের ধান বা শাপলা তুলতে ডোঙা নৌকা প্রতিদিন ব্যবহার করত। জেলেরাও অনেক সময় এই ডোঙা নৌকাকে মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করত। তালের ডোঙা এখন আর ব্যবহার হয় কিনা আমি জানি না।

কখনো কি ভেবেছেন তালের পাতা কাগজের বিকল্প হতে পারে? হ্যাঁ, আমার জীবনে দেখেছি। আমার হাতের লেখা শেখা শুরু হয়েছিল তালের পাতায়। তালপাতা ছিল কাগজ আর কলম হিসেবে ছিল বাশের কঞ্চি। আমার বাবা প্রথমে তালপাতায় মোটা সুচ বা ভোমর জাতীয় জিনিস দিয়ে বাংলা ও ইংরেজি অক্ষরগুলো কেটে লিখে দিতেন আর আমি সেই অক্ষরগুলোর উপর দিয়ে হাত ঘুরাতাম। হাঁড়ির কালি পানিতে গুলিয়ে কালি তৈরি করে নিতাম বা সুলেখা কোম্পানির কালির দোয়াতে চুবিয়ে কঞ্চির কলম দিয়ে তালপাতার উপর লিখতাম। কারণ হিসেবে বাবা বলেছিলেন তালপাতায় লিখলে নাকি হাতের লেখা ভালো হয়। হয়তো সেকারণেই আমার হাতের লেখা মোটামুটি ভালো বলে সকলে বলে থাকে। তালের পাতা দিয়ে হাতপাখা তৈরি হয় এবং গ্রামে এর ব্যবহার চোখে পড়ার মত।

তাল ও খেজুর নিয়ে তো অনেক কথাই বললাম। এবার তালের আর এক বুনো আত্মীয়ের গল্প বলি। তালের এই বুনো আত্মীয়টি হলো তালিপাম *(Corypha taliera)*। এটি আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও গর্বের সাথে মিশে আছে। এই তালিপাম পৃথিবীতে একমাত্র বন্য অবস্থায় আমাদের এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছিল। একটু ভাবুনতো বিষয়টি। আমরা এ ধরনের গাছ নিয়ে সত্যিই গর্বিত। গাছটি অনেকটা শতবর্ষী। শতবর্ষ পর মাত্র একবার ফুল দেয়। আর ফুল দিয়ে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে বিদায় নেয়। আমাদের বিদায় দিতেও কষ্ট হয়েছিল। সেই তালিপাম গাছটি মারা যাওয়ার সময় যে বীজ রেখে গিয়েছিল তার থেকে আমরা বেশ কিছু চারা তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছি। আমদের বিভাগের বাগানে এবং বিশ্ববিদ্যালয় আরবরিকালচার সেন্টারে এর কয়েকটি চারাগাছ সংরক্ষিত আছে। মন চাইলে দেখে যেতে পারেন কার্জন হল এলাকা এসে। আশা করি দেখবেন।

এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। আপনারা সকলেই বাদাম খেয়েছেন এ বিশ্বাস আমার আছে। বাদামকে ইংরেজিতে গ্রাউন্ড নাট বা পি নাট *(Arachis hypogaea)* বলে। শুষ্ক ফলকে সাধারণত নাট বলে। তাহলে বাদাম কেন গ্রাউন্ড নাট নামে পরিচিত? আপনারা লজ্জাবতী গাছের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন, যে গাছে লজ্জা আছে অর্থাৎ পাতা ছুঁলে লজ্জা পেয়ে পাতা নুইয়ে পড়ে। বাদামের লজ্জার কথা কেউ কি জানেন? সকলে হয়তো জানেন না। যারা জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে লিখছি। আপনারা নিশ্চয়ই এটা জানেন বাদাম মাটির নিচে হয়। তাহলে আমরা যে বাদাম খেয়ে থাকি সেটা কি ফল না মূল? চট করে বলে ফেলবেন এটা মূল কারণ বাদামের খোসায় যে অনেক সময় মাটি লেগে থাকতে দেখা যায়। আসলে বাদাম ফল। কারণ আমরা ফলটি ভেঙে তার শাঁসালো বীজগুলো খেয়ে থাকি। এখানেই বাদামের লজ্জার ব্যাপারটি রয়ে গেছে। বাদামের গাছে ফুল হয়। সাধারণ নিয়মেই ফুল থেকে ফল ও বীজ হয়। বাদাম একটি উভলিঙ্গ ফুল অর্থাৎ এর স্ত্রীকেশর এবং পুংকেশর একই ফুলে বিদ্যমান। ফুল সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বেই পরাগায়ণ এবং নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এটি একটি বিশেষ ধরণের বৈশিষ্ট্য। এই বিশেষ ধরণের বৈশিষ্টক্যকে ক্লিয়োশটোগ্যামী বলে। নিষেকক্রিয়ার সাথে সাথে বাদামের লজ্জার উদ্রেক হয়। সেই লজ্জা নিবারণ করতেই নিষেকিত ফুলটি ধীরে ধীরে মাটির নিচের দিকে ধাবিত হয় এবং এক পেগ বলে। এক পর্যায় পেগটি মাটির নিচে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায় এবং নাটে পরিণত হয়। মাটির নিচে হয় বলেই একে গ্রাউন্ড নাট বলে। মাটির নিচে যেতে না পারলে নিষেকিত ফুলটি কখনই নাটে পরিণত হয় না।

চিত্রে: ফুল, ফলসহ বাদাম গাছ

একারণে বাদামের ক্ষেতের মাটি বেলে-দোআঁশ মাটি হলে বাদাম ভালো হয়। আমাদের দেশে সাধারণত চর এলাকায় বাদাম ভালো হয়। এথেকে বোঝা গেল শুধু লজ্জাবতীরই লজ্জা থাকে না বাদামেরও লজ্জা আছে। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আমরা ছোট-বড় সকলেই কোনো না কোনো সময় বাদাম খেয়েছি। ঘরে অথবা খেলার মাঠে গ্যালারিতে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডার সময় বা বিকেলে পার্কে বসে পরিবারের সাথে আমরা বাদাম খেতে খুব পছন্দ করি। তাই বাদাম আমাদের কাছে অনেকটা নিত্যদিনের খাদ্যের মত। আমরা যারা একটু বয়স্ক তারা যে কোনো খাবার খেতে গেলেই দুবার ভাবি এতে কোলেস্টেরল আছে কিনা। বাদামের কথা বলতে গিয়ে আবার কোলেস্টেরল কেন? এ যেন ধান ভানতে শিবের গীত। আমরা জানি কোলেস্টেরল শরীরের জন্য ভালো নয়। এটা যেমন সত্য তেমনি কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে এটিও সমান সত্য। আসলে কোলেস্টেরল দুধরনের। যথাঃ খারাপ কোলেস্টেরল এবং ভালো কোলেস্টেরল। শরীর সুস্থ রাখার জন্য প্রতিদিন কিছু পরিমাণ ভালো কোলেস্টেরল গ্রহণ করা উচিত। সেজন্যই আমাদের প্রতিদিন কিছুটা হলেও বাদাম খাওয়া উচিত। কারণ বাদামে আছে ভালো কোলেস্টেরল। তাই আসুন আমরা প্রতিদিন কিছুটা হলেও বাদাম খাওয়ার অভ্যাস করি এবং সুস্থ থাকি।

যারা এ লেখার সম্মানিত পাঠক, আশা করি তারা এ লেখার মাঝেই খুঁজে পাবেন গাছকে নিয়ে অনেক জানা অজানা তথ্য। একবিংশ শতাব্দীতেও গাছের প্রতি আমাদের ভালোবাসার অন্ত নেই। সেই ভালোবাসা থেকেই আজকে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। বর্তমান বিশ্বে জীববৈচিত্র এবং জলবায়ু প্রতিনিয়তই চায়ের টেবিলে বা গোলটেবিল বৈঠকে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিশ্বকে আমরা কেমন দেখতে চাই বা কেমন রেখে যেতে চাই তা আমরা সকলে মিলে চিন্তাভাবনা করি কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারছি না। এর অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম হলো নগরায়ণ, দূষণ, আরাম-আয়েশ এবং কৃত্রিমতা। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় আমরা সর্বদা খুঁজি কিন্তু অনেকটা গোলক ধাঁধার মত খুঁজতে গিয়ে আবার হারিয়ে ফেলি। আমাদের এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে নগরায়ণের সাথে সাথে বনায়নের কথা পাশাপাশি ভাবতেই হবে। অপ্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। হারিয়ে যাওয়া গাছগুলোকে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে আনতে হবে। আসুন আমরা সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যেন আমরা কেউ বিনা প্রয়োজনে গাছ না কাটি। যদি নিতান্ত কাটতেই হয় তাহলে তার পরিবর্তে একাধিক গাছ লাগাতে হবে। আজকাল সামাজিক বনায়ন, পারিবারিক বনায়ন প্রভৃতি বনায়নের মাধ্যমে প্রকৃতির সবুজায়ন আন্দোলনে আপামর জনতা সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করছে। এদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। সামাজিক বনায়ন বা পারিবারিক বনায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই পরামর্শ থাকবে যেন একই ধরনের গাছ না লাগিয়ে মিশ্র ধরনের গাছ যেমন ফলজ, বনজ এবং ঔষধি গাছ লাগানোর কথাটি মাথায় রাখতে হবে। গাছের সাথে পাখিসহ অন্যান্য প্রাণীর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং গাছ এবং সকল প্রাণীর কথা মাথায় রেখে জীববৈচিত্রকে টিকিয়ে রাখতে হবে। গাছ থাকলে মানুষ থাকবে এটি যেমন সত্য তেমনি গাছ থাকলে অন্যান্য সকল প্রাণী থাকবে এটাও বাস্তব সত্য। আমরা সকলেই এই পৃথিবীর সন্তান। পৃথিবী তার সকল সন্তান-সন্ততি নিয়ে বাঁচতে চায়। আমরাও এই পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বাঁচতে চাই। আসুন আমরা আমাদের এই পৃথিবীকে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ হই। আমার এই ছোট্ট লেখনী হয়তো অনেক জানা-অজানা তথ্য দিয়ে আপনাদেরকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে সাহায্য করবে। কিছুটা সাহায্য হলেই আমি আমার লেখার সাফল্য খুঁজে পাব। এটিই আমার লেখাকে আরও উৎসাহিত করবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস। ভবিষ্যতে হয়তো আবার কখনো কোথাও দেখা হবে এই প্রত্যাশা রইল।

সংখ্যার জগতে উকিঝুঁকি

ড. মুনিবুর রহমান চৌধুরী
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গণিত কথাটি এসেছে গণনা থেকে। গণনার জন্য 1, 2, 3, 4, 5, ... সংখ্যাগুলির উদ্ভব হয়েছে। এদের স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত দশগুণোত্তর বা দশমিক পদ্ধতিতে 0 (শূন্য) সহ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এই দশটি সংখ্যার মাধ্যমে সকল সংখ্যাকে লেখা হয়। সংখ্যা লেখার পদ্ধতিকে সংখ্যাপাতন বলা হয়। দশমিক পদ্ধতিতে 9 এর পরবর্তী সংখ্যা দশকে 10 রূপে লেখা হয়। এই পদ্ধতির সঙ্গে আমরা আবাল্য পরিচিত বলে, এর মাহাত্ম্য হয়তো আমরা উপলব্ধি করি না। রোমান সংখ্যাপাতন পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করলেই আমরা দশমিক পদ্ধতির সুবিধা ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারব। এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে আমরা বিশেষ দুই ধরণের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব।

1 এর চেয়ে বড় যে সংখ্যা শুধুমাত্র 1 এবং ঐ সংখ্যাটি দ্বারা (নিঃশেষে) বিভাজ্য, তাকে মৌলিক সংখ্যা বলা হয়। প্রথম মৌলিক সংখ্যাটি হচ্ছে 2; এটি একমাত্র জোড় মৌলিক সংখ্যা।

50 এর অনূর্ধ্ব মৌলিক সংখ্যাগুলি হচ্ছে 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. প্রশ্ন জাগে, মৌলিক সংখ্যার শেষ আছে কী? উত্তর যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে একে একে নতুন নতুন মৌলিক সংখ্যা বের করে এই প্রশ্নের মীমাংসা কখনই করা যাবে না। কেননা মানুষ যতই নতুন নতুন মৌলিক সংখ্যা বের করুক না কেন, তাদের সংখ্যা কখনই অন্তহীন হতে পারবে না। অতএব ঐ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হলে, তার মীমাংসা যুক্তির সাহায্যেই করতে হবে। এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রাচীনকালের গণিতবিদ ইউক্লিডের *Elements* নামক মহাগ্রন্থে পাওয়া যায়। ইউক্লিড দেখিয়েছেন, মৌলিক সংখ্যার শেষ নাই। কিন্তু 'শেষ নাই' কথাটি তিনি সতর্কভাবে পরিহার করেছেন। তিনি বলেছেন, Prime numbers are more than any assigned multitude of prime numbers.

(Proposition 20, Book IX)

অর্থাৎ, যতগুলি মৌলিক সংখ্যাই জানা থাকুক না কেন, তার বাইরেও মৌলিক সংখ্যা থেকে যাবে। ইউক্লিডের প্রমাণ আজও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তিনি ধরে নিলেন, এক বা একাধিক মৌলিক সংখ্যা $p_1, p_2, ..., p_r$ জানা আছে বা দেওয়া আছে। তিনি এই মৌলিক সংখ্যাগুলির গুণফলের সঙ্গে 1 যোগ করে নতুন একটি সংখ্যা a গঠন করলেন :

$$a = p_1 p_2 \ldots p_r + 1.$$

এই সংখ্যাটি মৌলিক হলে তখনই আমরা নতুন একটি মৌলিক সংখ্যা পেয়ে গেলাম। যেমন,

$p_1 = 2, p_2 = 3$ নিয়ে আমরা পাই $a = 2 \times 3 + 1 = 7$, যা মৌলিক সংখ্যা। a মৌলিক সংখ্যা না হলে তার অন্তত একটি ভাজক (উৎপাদক) মৌলিক সংখ্যা হবে। কেননা, 1 এর চেয়ে বড় যে- কোন অমৌলিক সংখ্যার 1 ভিন্ন ক্ষুদ্রতম ভাজক স্বভাবতই মৌলিক সংখ্যা হবে। যেমন $p_1 = 3$,

$p_2 = 5$ নিয়ে পাই $a = 3 \times 5 + 1 = 16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$ যাকে সংক্ষেপে 2^4 রূপে লেখা হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমরা একটিমাত্র নতুন মৌলিক সংখ্যা 2 পেলাম। আবার $p_1 = 3, p_2 = 7$ নিয়ে পাই।

$a = 3 \times 7 + 1 = 22 = 2 \times 11$; এক্ষেত্রে আমরা দুইটি নতুন মৌলিক সংখ্যা 2, 11 পেলাম। এভাবেই প্রমাণিত হল যে, মৌলিক সংখ্যার শেষ নাই।

শুধু তাই নয়; যে সমান্তর প্রগমণের প্রথম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d-এর 1 ভিন্ন কোন সাধারণ (কমন) ভাজক নাই, সেরূপ প্রত্যেকটি সমান্তর প্রগমণের অসংখ্য পদ মৌলিক সংখ্যা হবে। সমান্তর প্রগমণ বলতে $a, a + d, a + 2d, a + 3d, \ldots$ ধরনের সংখ্যা পরম্পরাকে বোঝায়। এই সমান্তর প্রগমণের n-তম পদ হবে $a + (n - 1)\, d$; $k > 1$ যদি a এবং d-এর সাধারণ ভাজক হয়, তাহলে উক্ত প্রগমণের প্রত্যেকটি পদ k দ্বারা বিভাজ্য হবে; তখন উক্ত সমান্তর প্রগমণের কোন পদই মৌলিক সংখ্যা হবে না। সুতরাং a এবং d-এর গ.সা.গু. (গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক) 1 হওয়া উক্ত সমান্তর প্রগমণের কোন পদ মৌলিক সংখ্যা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত। চমকপ্রদ ব্যাপার এই যে, এই শর্ত পর্যাপ্তও বটে। প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তরের গ.সা.গু. 1, এরূপ প্রত্যেকটি সমান্তর প্রগমণের অসংখ্য পদ মৌলিক সংখ্যা হবে। এই অতি আশ্চর্যজনক ফল ফরাসী বংশোদ্ভূত গণিতবিদ দিরিশলে (P. G. L. Dirichlet, 1804–1859) প্রমাণ করেন। এই ফল প্রমাণের জন্য তাঁকে নতুন হাতিয়ার অর্থাৎ গাণিতিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করতে হয়।

কিছু কিছু সংখ্যা আছে যাদের প্রকৃত ভাজকগুলির যোগফল সংখ্যাটির সমান। এখানে প্রকৃত ভাজক বলতে সংখ্যাটি বাদে 1 সহ সংখ্যাটির অন্য সকল ভাজককে বোঝানো হয়েছে। এরূপ প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে 6, কেননা 6-এর প্রকৃত ভাজকগুলি হচ্ছে 1, 2, 3 এবং $6 = 1 + 2 + 3$. এরূপ সংখ্যাকে নিখুঁত সংখ্যা (perfect number) বলা হয়। এর পরের নিখুঁত সংখ্যা 28, কেননা 28-এর প্রকৃত ভাজকগুলি হচ্ছে 1, 2, 4, 7, 14 এবং $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$. নিখুঁত সংখ্যা সম্পর্কে ইউক্লিডের মহাগ্রন্থে নিচের ফল প্রমাণিত হয়েছে।

মনি করি p এমন একটি মৌলিক সংখ্যা যেন 2^p-1 সংখ্যাটিও মৌলিক সংখ্যা। তাহলে $N = 2^{p-1}(2^p-1)$ একটি নিখুঁত সংখ্যা।

(Proposition 36, Book IX)

$p = 2$, $p = 3$ নিয়ে আমরা যথাক্রমে পাই, $N = 6$, $N = 28$; p-এর পরবর্তী (মৌলিক) মান $p = 5$ এর জন্যও 2^p-1 সংখ্যাটি মৌলিক হয়; সুতরাং $N = 2^4 \times 31 = 16 \times 31 = 496$ পরবর্তী নিখুঁত সংখ্যা। 28-এর পরবর্তী নিখুঁত সংখ্যাটি বের করার দায়িত্ব সুপ্রিয় পাঠকের হাতে ন্যস্ত করছি।

2^p-1 ধরনের সংখ্যাকে (যেখানে p নিজেই মৌলিক সংখ্যা) মারসেন (Mersenne, 1588–1648) সংখ্যা বলা হয়। পেশায় ধর্মযাজক মারসেন ছিলেন সৌখিন গণিতবিদ। আরেক সৌখিন গণিতবিদ (পেশায় বিচারক) ফার্মা (Pierre de Fermat, 1607–1666)-কে লেখা এক চিঠিতে তিনি দাবি করেন যে $p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257$ মৌলিক সংখ্যাগুলির সংশ্লিষ্ট মারসেন সংখ্যাগুলি সবই মৌলিক সংখ্যা হবে; 257 এর অনূর্ধ্ব অপর চুয়াল্লিশটি মৌলিক সংখ্যার সংশ্লিষ্ট মারসেন সংখ্যাগুলি সবই অমৌলিক সংখ্যা হবে। কালের নিরিখে দেখা গেছে যে, মারসেনের দাবি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মারসেনের দাবি বহুলাংশে সঠিক। খুব বড় কোন সংখ্যা মৌলিক কি-না তার প্রমাণ সহজসাধ্য নয়; গণিতবিদেরা এজন্য নানা ধরণের কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। ১৮৭৬ সালে ফরাসি গণিতবিদ লুকা (E. Lucas, 1842–1891) প্রমাণ করেন যে, মারসেন সংখ্যা

$$2^{127} - 1 = 170141183460469231731687303715884105727$$

মৌলিক সংখ্যা। পরবর্তী ৭৫ বছর পর্যন্ত এটাই ছিল মানুষের জানা বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা। কম্পিউটারের আবির্ভাবের ফলে আজকাল প্রায়শই নতুন নতুন মৌলিক সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা আবার নিখুঁত সংখ্যার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ইউক্লিডের উল্লেখিত প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রত্যেকটি নিখুঁত সংখ্যা স্বভাবতই জোড় সংখ্যা। আদৌ কোন বিজোড় নিখুঁত সংখ্যা আছে কি-না, এটি একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন। R.P. Brent এবং G.L. Cohen ১৯৮৯ সালে প্রমাণ করেন যে, যদি কোন বিজোড় নিখুঁত সংখ্যা থাকে, তা অবশ্যই 10^{300}-এর

চেয়ে বড় হবে। 10^{300} সংখ্যাটি লিখতে 1-এর ডানে তিনশতটি শূন্য বসাতে হবে। এটি কত বড় একটি সংখ্যা, তা উপলব্ধি করাও দুরূহ।

অনেকেই ভাবতে পারেন, ইউক্লিডের মহাগ্রন্থে বুঝি শুধু জ্যামিতিই স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বীজগণিত এবং সংখ্যাতত্ত্বের অনেক কিছুই তাঁর মহাগ্রন্থে আছে। তবে বীজগণিত এবং সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা জ্যামিতির ভাষাতেই করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

The Thirteen Books of Euclid's Elements.

Translated from the Text of Heiberg with Introduction and Commentary by Sir Thomas L. Heath, K.C.B., K.C.V.O., F.R.S., Sc.D. Camb., Hon. D.Sc. Oxford, Honorary Fellow of Trinity College, Cambridge, Dover Publication (Three Volumes), New York 1956

(First published in 1908, Cambridge University Press).

বাংলাদেশী বিজ্ঞানী এবং তাঁদের আবিষ্কার

ডঃ ইসতিয়াক মইন সৈয়দ
অধ্যাপক
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জীবন ও বিজ্ঞান যেন একই সূত্রে গাঁথা। বিজ্ঞানের কল্যাণে আমাদের জীবন হয়েছে সুন্দর, সহজ আর গতিময়। বাংলাদেশী বিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্যা, ঔষধ, গণিত, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন এলাকায় তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। এই নিবন্ধটিতে ইতিহাস জুড়ে বিখ্যাত বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক এবং তাদের বিস্ময়কর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

জগদীশ চন্দ্র বসু

জন্মঃ ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮; ময়মনসিংহ, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারত

মৃত্যুঃ ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭, গিরিডি, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারত

জীবনী: জগদীশ চন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি অঞ্চলের ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে তাঁর পরিবারের প্রকৃত বাসস্থান ছিল। তার পিতা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ভগবান চন্দ্র বসু তখন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জগদীশ চন্দ্রের প্রথম স্কুল ছিল ময়মনসিংহ জিলা স্কুল। জগদীশ কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে পড়াশোনা করে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। ১৮৮০ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্যেই লন্ডনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান, কিন্তু অসুস্থতার কারণে বেশিদিন এই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। পরে তিনি কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে ট্রাইপস পাশ করেন। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি পাঠ সম্পন্ন করেন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জগদীশ ভারতে ফিরে আসেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ইউরোপীয় অধ্যাপকদের অর্ধেক বেতনেরও কম অর্থ লাভ করতেন। এর প্রতিবাদে তিনি তিন বছর অবৈতনিক ভাবেই অধ্যাপনা চালিয়ে যান। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার প্রথম আঠারো মাসে জগদীশ যে সকল গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেছিলেন তা লন্ডনের রয়েল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। এই গবেষণা পত্রগুলোর সূত্র ধরেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৯৬ সালের মে মাসে তাকে ডিএসসি ডিগ্রী প্রদান করে।

গবেষণাঃ অধ্যাপনার প্রথম আঠারো মাসের গবেষণার মধ্যে মূখ্য ছিল অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি এবং কোন তার ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তা প্রেরণে সফলতা পান। তিনি সর্বপ্রথম প্রায় ৫ মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ তৈরি করেন। এ ধরণের তরঙ্গকেই বলা হয়ে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা মাউক্রোওয়েভ। আধুনিক রাডার, টেলিভিশন এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই তরঙ্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূলত এর মাধ্যমেই বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান প্রদান ঘটে থাকে। তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনের সাদৃশ্য নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি দেখান যে উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন উদ্দীপনার (যেমন, ক্ষত, রাসায়নিক এজেন্ট) পরিবহণ বৈদ্যুতিক প্রকৃতির,-যা আগে রাসায়নিক প্রকৃতির বলে মনে করা হত। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন উদ্দীপনার উপর রাসায়নিক ইনহিবিটর্স এবং তাপমাত্রা প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ নাইটহুড, ১৯১৬; রয়েল সোসাইটির ফেলো, ১৯২০; ভিয়েনা একাডেমি অফ সাইন্স-এর সদস্য, ১৯২৮; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এর ১৪তম অধিবেশনের সভাপতি, ১৯২৭; ভারতীয় সাম্রাজ্যের অর্ডার অফ কম্প্যানিয়ন (সিআইই, ১৯০৩); ভারতের স্টার অব অর্ডার অফ কম্প্যানিয়ন (সিএসআই, ১৯১২) ইত্যাদি।

প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ঃ

জন্মঃ ২ আগষ্ট ১৮৬১, রাড়ুলী, খুলনা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি (বর্তমান বাংলাদেশ), ব্রিটিশ ভারত

মৃত্যুঃ ১৬ জুন ১৯৪৪, কলকাতা,ভারত

জীবনী: পি সি রায় বাংলাদেশের খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা ভূবনমোহিনী দেবী এবং পিতা হরিশ চন্দ্র রায়। হরিশচন্দ্র রায় স্থানীয় জমিদার ছিলেন। বনেদি পরিবারের সন্তান প্রফুল্ল চন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই সব বিষয়ে অত্যন্ত তুখোড় এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। তার পড়াশোনা শুরু হয় বাবার প্রতিষ্ঠিত এম ই স্কুলে। তিনি কলকাতায় অ্যালবার্ট স্কুল থেকে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে সেখান থেকে এফ এ পরীক্ষায় (ইন্টারমিডিয়েট বা এইচএসসি) দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এ ক্লাসে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সী থেকে গিলক্রিস্ট বৃত্তি নিয়ে তিনি স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি এসসি পাশ করেন। পরবর্তীকালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচ ডি ও ডি এসসি ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সী কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় ২৪ বছর তিনি এই কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন।

গবেষণাঃ নিজের বাসভবনে দেশীয় ভেষজ গাছ নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে তিনি তার গবেষণাকর্ম আরম্ভ করেন। তার এই গবেষণাস্থল থেকেই পরবর্তীকালে বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সৃষ্টি হয় যা ভারতবর্ষের শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারকিউরাস নাইট্রাইট ($HgNO_2$) আবিষ্কার করেন যা বিশ্বব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করে। এটি তার অন্যতম প্রধান আবিষ্কার। তিনি তার সমগ্র জীবনে মোট ১২টি যৌগিক লবণ এবং ৫টি থায়োএস্টার আবিষ্কার করেন।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ শিক্ষকতার জন্য তিনি ''আচার্য'' হিসেবে আখ্যায়িত, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববাদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে তৃতীয়বারের মত ইংল্যান্ড যান এবং সেখান থেকেই সি আই ই লাভ করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট: ডিগ্রী দেয়। এছাড়া ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে মহীশুর ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি ডক্টরেট পান। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত নাইট উপাধি লাভ করেন।

কাজি আজিজুল হক

জন্মঃ ১৮৭২; খুলনা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি (বর্তমান বাংলাদেশ), ব্রিটিশ ভারত

মৃত্যুঃ ১৯৩৫; উত্তর চম্পারান; বিহার; ব্রিটিশ ভারত

জীবনী: খান বাহাদুর কাজি আজিজুল হক ছিলেন ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশে কর্মরত একজন কর্মকর্তা। তিনি ব্রিটিশ ভারতের খুলনা জেলার ফুলতলার পয়োগ্রাম কসবায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হস্তছাপের মাধ্যমে অপরাধী সনাক্তকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের ছাত্র ছিলেন। চাকরিতে পদোন্নতি পেয়ে তিনি পুলিশের এসপি হয়েছিলেন।

গবেষণাঃ ১৮৯২ সালে তিনি কাজ শুরু করেন কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। তখন অ্যানথ্রোপমেট্রি (মানবদেহের আকৃতি) পদ্ধতিতে অপরাধীদের শনাক্ত করার কাজ চলত। গণিতের ছাত্র এবং সদ্য সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকরি পাওয়া আজিজুল হক অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি যে পদ্ধতি উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করলেন, তা-ই 'হেনরি সিস্টেম' বা 'হেনরি পদ্ধতি' নামে

পরিচিত হয়। ২০০১ সালে প্রকাশিত কলিন বিভান তাঁর ফিঙ্গার প্রিন্টস গ্রন্থে কাজি আজিজুল হকের গবেষণার মৌলিকত্ব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জানাচ্ছেন, অ্যানথ্রোপমেট্রিক পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আজিজুল হক ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হন। ফলে নিজেই হাতের ছাপ তথা ফিঙ্গারপ্রিন্টের শ্রেণীবিন্যাসকরণের একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি উদ্ভাবন করেন একটা গাণিতিক ফর্মুলা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা আঙুলের ছাপের ধরনের ওপর ভিত্তি করে ৩২টি থাক বানান। সেই থাকের ৩২টি সারিতে সৃষ্টি করেন ১০২৪টি খোপ। বিভান আরও জানাচ্ছেন, ১৮৯৭ সাল নাগাদ হক তাঁর কর্মস্থলে সাত হাজার ফিঙ্গারপ্রিন্টের বিশাল এক সংগ্রহ গড়ে তোলেন। তাঁর সহজ-সরল এই পদ্ধতি ফিঙ্গার প্রিন্টের সংখ্যা লাখ লাখ হলেও শ্রেণীবিন্যাস করার কাজ সহজ করে দেয়।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ কাজের পুরস্কার হিসেবে আজিজুল হককে দেওয়া হয়েছিল 'খান বাহাদুর' উপাধি, পাঁচ হাজার টাকা এবং ছোটখাটো একটা জায়গির। এছাড়া ব্রিটেনের 'দ্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট সোসাইটি' ফেন্সির উদ্যোগে চালু করেছে 'দ্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট সোসাইটি আজিজুল হক অ্যান্ড হেমচন্দ্র বোস প্রাইজ'। যাঁরা ফরেনসিক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবেন, এ পুরস্কার দেওয়া হবে তাঁদেরই।

মেঘনাদ সাহা

জন্মঃ ৬ অক্টোবর ১৮৯৩; ঢাকা, ব্রিটিশ ভারত

মৃত্যুঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ (৬২ বছর); দিল্লি, ভারত

জীবনীঃ মেঘনাদ সাহার জন্ম ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর ঢাকার কাছে শ্যাওড়াতলী গ্রামে। গরীব ঘরে জন্ম তার। অর্থাভাবে বহুপ্রতিকূলতার মাঝে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে তার স্কুল শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং পরে ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের সহপাঠী এবং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯২৩ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং তারপরে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

গবেষণাঃ তিনি পদার্থবিজ্ঞানে থার্মাল আয়নাইজেসন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিখ্যাত। তার আবিষ্কৃত সাহা আয়োনাইজেসন সমীকরণ নক্ষত্রের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মাবলী ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো ছিলেন। তার নামানুসারেই কলকাতায় সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিষ্ঠিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

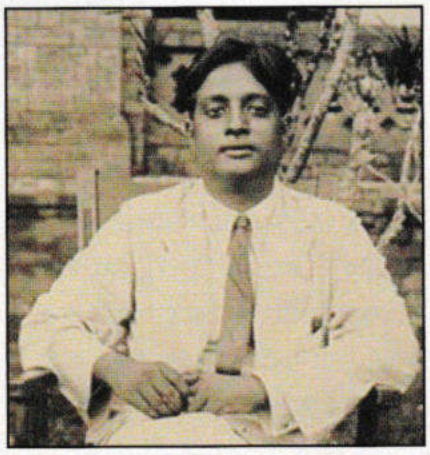

জন্মঃ ১ জানুয়ারি ১৮৯৪; কলকাতা

মৃত্যুঃ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ (৮০ বছর)

জীবনীঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে যৌথভাবে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান প্রদান করেন, যা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলে বিবেচিত হয়। ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী সত্যেন্দ্রনাথ কর্মজীবনে সম্পৃক্ত ছিলেন বৃহত্তর বাংলার তিন শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন কলকাতা, ঢাকা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করার পর ভর্তি হোন প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে আই.এস.সি. পাশ

করেন প্রথম হয়ে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতক এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে একই ফলাফলে মিশ্র গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসাবে যোগ দেন । ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে দুই বছরের ইউরোপ সফর থেকে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন এবং অধ্যাপক পদে উন্নীত হন ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন। বসু ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন এবং দেশবিভাগ আসন্ন হলে তিনি কলকাতায় ফিরে যান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি বিশ্বভারতীতে উপাচার্য হিসাবে যোগ দেন এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন।

গবেষণাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসু তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞান ও এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফির ওপর কাজ শুরু করেন। এসময়ে বসু প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তেজস্ক্রিয়তা নীতি ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই প্রতিপাদন করে একটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সদৃশ কণার সাহায্যে দশার সংখ্যা গণনার একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করেন। প্রবন্ধটি প্রকাশ করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বসু তা সরাসরি আলবার্ট আইনস্টাইনের নিকট প্রেরণ করেন, যিনি প্রবন্ধটির গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজেই তা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন এবং বসুর পক্ষে তা Zeitschrift für Physik সাময়িকীতে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আইনস্টাইন এই ধারণাটি গ্রহণ করে বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট এর গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক পদে মনোনীত করেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেশিকোত্তম এবং ভারত সরকার পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নামে সত্যেন বসু অধ্যাপক (Bose Professor) পদ রয়েছে। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা শহরে তাঁর নামে সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় মৌলিক বিজ্ঞান কেন্দ্র নামক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয় ইত্যাদি।

কাজী মোতাহার হোসেন

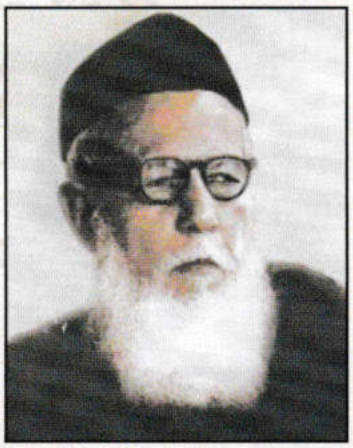

জন্মঃ ৩০ জুলাই ১৮৯৭; বাগমারা, ফরিদপুর জেলা (ব্রিটিশ ভারত)

মৃত্যুঃ ৯ অক্টোবর, ১৯৮১ (৮৪ বছর); ঢাকা (বাংলাদেশ)

জীবনীঃ কাজী মোতাহার হোসেনের পিতা কাজী গওহরউদ্দীন আহমদ ছিলেন সেটেলমেন্টের আমিন। মায়ের নাম তাসিরুন্নেসা। ১৯২১ সালে এম. এ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালীন সময়ে কলকাতার তালতলা নিবাসী মোহাম্মদ ফয়েজুর রহমানের কন্যা সাজেদা খাতুনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। তাঁদের সংসারে চার পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। তন্মধ্যে- সনজীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, মাহমুদা খাতুন, কাজী আনোয়ার হোসেন, কাজী মাহবুব হোসেন প্রমুখ রয়েছেন। ১৯১৫ সালে তিনি কুষ্টিয়া মুসলিম হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পরীক্ষা পাস করে তিনি ভর্তি হন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯১৭ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে ঢাকা কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ পরীক্ষায় বাংলা ও আসাম জোনে প্রথমস্থান অর্জন করে মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান নিয়ে এমএ পাশ করেন। উল্লেখ্য, সেবছর কেউ প্রথম শ্রেণি পান নি। ১৯৩৮ সালে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। যুগপৎভাবে, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে পি.এইচ.ডি করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজে ছাত্র থাকাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ডেমনেস্ট্রেটর হিসেবে চাকরি শুরু করেন এবং একই বিভাগে ১৯২৩ সালে একজন সহকারী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। কাজী মোতাহার হোসেনের নিজ উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানে এম.এ. কোর্স চালু হয় এবং তিনি এই নতুন বিভাগে যোগ দেন। তিনি ১৯৫১ সালে পরিসংখ্যানে একজন রিডার ও ১৯৫৪ সালে অধ্যাপক হন। ১৯৬৪ সালে স্থাপিত পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের তিনি প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে তিনি ১৯২৯ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানে একক চ্যাম্পিয়ন ছিলেন।

গবেষণাঃ তার গবেষণার বিষয় ছিল "ডিজাইন অফ এক্সপেরিমেন্টস"। তিনি "হোসেন চেইন রুল" নামক একটি নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেন। বস্তুত, তৎকালীন পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) তিনিই প্রথম স্বীকৃত পরিসংখ্যানবিদ ছিলেন।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৭৯ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অবদানের জন্য স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডি.এস.সি. ডিগ্রি দ্বারা সম্মানিত করে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে সম্মানিত করে। কাজী মোতাহার হোসেন ভবন নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স অ্যানেক্স ভবনের নামকরণ করা হয়।

মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদাঃ

জন্মঃ ১লা ডিসেম্বর, ১৯০০; মাড়গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ব্রিটিশ ভারত।

মৃত্যুঃ ৩ নভেম্বর, ১৯৭৭ (৭৬ বছর); ঢাকা, বাংলাদেশ।

জীবনীঃ মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা ছিলেন একজন বাংলাদেশী রসায়নবিদ, গ্রন্থকার এবং শিক্ষাবিদ। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে থেকে ১৯২৫ সালে রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এস.সি পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯২৯ সালে রসায়নে ডি.এসসি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৩১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগদানের মাধ্যমে নিজের কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি এ কলেজে বিভাগীয় প্রধান এবং ১৯৪৬ সালে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন।

দেশ বিভাগের পর ড. কুদরাত-এ-খুদা পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং জনশিক্ষা পরিচালকের দায়িত্ব নেন (১৯৪৭-১৯৪৯)। ১৯৫২-১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারসমূহের পরিচালক ছিলেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য যে শিক্ষাকমিশন গঠন করা হয় ড. কুদরাত-এ-খুদা তার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নাম অনুসারে পরবর্তীকালে শিক্ষাকমিশন রিপোর্টটির নাম রাখা হয় ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষাকমিশন রিপোর্ট।

গবেষণাঃ ড. কুদরাত-এ-খুদা স্টেরিও রসায়ন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরবর্তীতে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বনৌষধি, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, পাট, লবণ, কাঠকয়লা, মৃত্তিকা ও অনান্য খনিজ পদার্থ। বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের ১৮টি আবিষ্কারের পেটেন্ট রয়েছে, যার মধ্যে ৯টি পাটসংক্রান্ত। এর মধ্যে পাট ও পাটকাঠি থেকে রেয়ন, পাটকাঠি থেকে কাগজ এবং রস ও গুড় থেকে মল্ট ভিনেগার আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন বিখ্যাত গবেষণামূলক পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রায় ১০২টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ তিনি একুশে পদক, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (মরণোত্তর) সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

অমল কুমার রায়চৌধুরী

জন্মঃ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৩, রিশাল, পূর্ব বাংলা, ব্রিটিশ ভারত (বর্তমান বাংলাদেশ)

মৃত্যুঃ ১৮ জুলাই, ২০০৫ (৮১ বছর)

জীবনীঃ আপেক্ষিকতার বিশ্বতত্ত্বে, বিশেষ করে রায়চৌধুরী সমীকরণের জন্য তিনি বিখ্যাত। রায়চৌধুরী ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী একজন স্কুলশিক্ষক ছিলেন, তিনি ছিলেন গণিতের শিক্ষক। বাবাকে দেখে অণুপ্রাণিত হয়েই ছোটবেলা থেকেই অমল গণিত বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক এবং ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

গবেষণাঃ তার উদ্ভাবিত রায়চৌধুরী সমীকরণ থেকে চতুর্মাত্রিক জগৎ সময়ের সাথে সাথে কীভাবে বিবর্তিত হয় সেটার ব্যাখ্যা মেলে। এই সমীকরণ থেকে অমল রায় চৌধুরীই প্রথম ধারণা দেন যে সিংগুলারিটি এড়িয়ে যাওয়া আমাদের জন্য সম্ভব নয়। পরে ১৯৬০-৭০ এর দিকে স্টিফেন হকিং এবং রজার পেনরোজ, রায়চৌধুরী সমীকরণের উপর ভিত্তি করেই এ ব্যাপারটা গাণিতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

ফজলুর রহমান খান

জন্মঃ ৩ এপ্রিল ১৯২৯; শিবচর, মাদারীপুর, বাংলাদেশ

মৃত্যুঃ ২৭ শে মার্চ ১৯৮২; জেদ্দা, সৌদি আরব

জীবনীঃ তিনি ১৯৪৪ সালে আরমানিটোলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতার শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। ফাইনাল পরীক্ষা চলাকালে পঞ্চাশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তিনি ঢাকায় ফিরে এসে তৎকালীন আহসানউলাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে বাকি পরীক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫২ তে যুগপৎ সরকারী বৃত্তি ও ফুল ব্রাইট বৃত্তি নিয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। সেখানে ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় অ্যাট আরবানা শ্যাম্পেইন থেকে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং তত্ত্বীয় ও ফলিত মেকানিক্স-এ যুগ্ম এম এস করার পর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জনের পরপরই তিনি আহসানউলাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্তি লাভ করেন। ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৫৬ সালে দেশে ফিরে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পূর্ব পদে যোগদান করেন।

গবেষণাঃ শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার তার অনন্য কীর্তি। তিনি ১৯৭২ সনে 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ রেকর্ড'-এ ম্যান অব দি ইয়ার বিবেচিত হন এবং পাঁচবার স্থাপত্য শিল্পে সবচেয়ে বেশী অবদানকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত হবার গৌরব লাভ করেন। তিনি মুসলিম স্থাপত্য বিষয়ের উপর নানা ধরনের গবেষণা করেছেন। ডঃ খান টিউব ইন টিউব নামে স্থাপত্য শিল্পের এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন যার মাধ্যমে অতি উচ্চ (কমপক্ষে একশত তলা) ভবন স্বল্প খরচে নির্মাণ সম্ভব। গগনচুম্বী ভবনের উপর সাত খন্ডে প্রকাশিত একটি পুস্তকের তিনি সম্পাদনা করেন।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, লি হাই বিশ্ববিদ্যালয় ও সুইস ফেডারেল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগি ১৯৯৯ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (মরণোত্তর)। ১৯৯৮ সালে শিকাগো শহরের সিয়ার্স টাওয়ারের পাদদেশে অবস্থিত জ্যাকসন সড়ক পশ্চিম পার্শ্ব এবং ফ্রাঙ্কলিন সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বের সংযোগস্থলটিকে নামকরণ করা হয় "ফজলুর আর. খান ওয়ে" ইত্যাদি।

জামাল নজরুল ইসলাম:

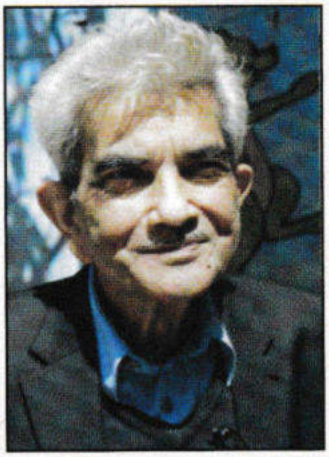

জন্মঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯; ঝিনাইদহ জেলা, বাংলাদেশ

মৃত্যুঃ মার্চ ১৬, ২০১৩ (৭৪ বছর); চট্টগ্রাম

জীবনীঃ জামাল নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি মহাবিশ্বের উদ্ভব ও পরিণতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে তিনি নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এখানে পড়ার সময়ই গণিতের প্রতি তার অন্যরকম ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। নবম শ্রেণীতে উঠার পর পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। সেখানে গিয়ে ভর্তি হন লরেন্স কলেজে। এই কলেজ থেকেই তিনি সিনিয়র কেমব্রিজ ও হায়ার সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়তে যান। সেখান থেকে বিএসসি অনার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায়োগিক গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান থেকে আবারও স্নাতক ডিগ্রি (১৯৫৯) অর্জন করেন। তারপর এখান থেকেই মাস্টার্স (১৯৬০) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রায়োগিক গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে এসসিডি (ডক্টর অফ সায়েন্স) ডিগ্রি অর্জন করেন।

গবেষণাঃ তার গবেষণার বিষয় ফলিত গণিত, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা, গণিত পদার্থবিদ্যা, মহাকর্ষ তত্ত্ব, সাধারণ আপেক্ষিকতা, গাণিতিক বিশ্বতত্ত্ব ও কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত। তিনি ৫০ টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ, বই এবং জনপ্রিয় নিবন্ধ লিখেছেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ দ্য আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। দ্রুত বইটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। পরের বছর কেমব্রিজ থেকেই প্রকাশিত হয় ক্লাসিক্যাল জেনারেল রিলেটিভিটি। তাঁর গবেষণা আইনস্টাইন-পরবর্তী মহাবিশ্ব গবেষণায় বিরাট অবদান রেখেছে। তিনি এই ধারায় গবেষণা অব্যাহত রেখে পরবর্তীকালে লেখেন ফার ফিউচার অব দ্য ইউনিভার্স বা মহাবিশ্বের দূরবর্তী ভবিষ্যৎ। সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ কখনো এক সরলরেখায় এলে পৃথিবীর ওপর তার প্রভাব পড়বে কি না, তা নিয়ে কাজ করেছেন তিনি।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী ১৯৮৫ সালে তাকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৯৪ সালে তিনি ন্যাশনাল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মেডেল পান। ১৯৯৮ সালে ইতালির আবদুস সালাম সেন্টার ফর থিওরিটিকাল ফিজিক্সে থার্ড ওয়ার্ল্ড একাডেমি অফ সায়েন্স অনুষ্ঠানে তাঁকে মেডাল লেকচার পদক দেয়া হয়। এছাড়া ২০০১ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।

আব্দুস সাত্তার খান

জন্মঃ ১৯৪১, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, বাংলাদেশ

মৃত্যুঃ ৩১ জানুয়ারি, ২০০৮ (৬৭ বছর) ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

জীবনীঃ আব্দুস সাত্তার খান বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত মহাকাশ গবেষক। কর্মজীবনে তিনি নাসা, ইউনাইটেড টেকনোলজিসের প্র্যাট এন্ড হুইটনি এবং অ্যালস্টমে (সুইজারল্যান্ড) কাজ করেছেন। তিনি রতনপুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়াশোনা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগ থেকে ১৯৬২ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৬৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি ১৯৬৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করতে যান এবং ১৯৬৮ সালে রসায়নের উপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি দেশে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ঐ বছরই তিনি ধাতব প্রকৌশল নিয়ে গবেষণা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন।

গবেষণাঃ তিনি নাসা ইউনাইটেড টেকনোলজিস এবং অ্যালস্টমে কাজ করার সময়ে ৪০টিরও বেশি সংকর ধাতু উদ্ভাবন করেছেন। এই সংকর ধাতুগুলো ইঞ্জিনকে আরো হালকা করেছে, যার ফলে উড়োজাহাজের পক্ষে আরো দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এবং ট্রেনকে আরো গতিশীল করেছে। তার উদ্ভাবিত সংকর ধাতুগুলো এফ-১৬ ও এফ-১৭ যুদ্ধবিমানের জ্বালানি সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি ৩১টি প্যাটেন্টের অধিকারী।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রির নির্বাচিত ফেলো; যুক্তরাষ্ট্রের সোসাইটি অব মেটালসের সদস্য; ১৯৮৬ সালে ইউনাইটেড টেকনোলজিস স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড; ১৯৯৪ সালে পান 'ইউনাইটেড টেকনোলজিস রিসার্চ সেন্টার অ্যাওয়ার্ড অব এক্সিলেন্স' পদক ইত্যাদি।

আবুল হুসসাম:

জন্ম: ১৯৫২ সাল; কুষ্টিয়া; বাংলাদেশ।

জীবনী: অধ্যাপক আবুল হুসসাম একজন বাংলাদেশী বিজ্ঞানী, তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা করে কম খরচে ভূ-গর্ভস্থ আর্সনিকযুক্ত পানি পরিশোধনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তিনি বর্তমানে জর্জ ম্যাসন ইউনিভার্সিটি, ফেয়ারফ্যাক্স, ভার্জিনিয়ার রসায়নের অধ্যাপক। আবুল হুসসাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর রসায়ন বিভাগ থেকে ১৯৭৫ সালে বিএসসি এবং ১৯৭৬ সালে এমএসসি সম্পন্ন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার উদ্দ্যেশে গমন করেন। ১৯৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনালিটিক্যাল রসায়নে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

গবেষণাঃ তিনি বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারতীয় ভূখণ্ডের ভূগর্ভস্থ পানিতে থাকা আর্সেনিক ও এর প্রতিকার নিয়ে গবেষণা করেন। হুসসাম আর্সেনিক নিয়ে তাঁর গবেষণা কর্ম শুরু করেন ১৯৯৩ সাল থেকে। নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে তিনি পানিতে থাকা আর্সেনিকের মাত্রা প্রায় নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করাতে সক্ষম যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্রটি মূলত একটি ফিল্টার বা ছাঁকনি বিশেষ, এই বিশুদ্ধকরণ যন্ত্রে বালি, কাঠ কয়লা, ক্ষুদ্র ইটের খোয়া ও কাস্ট আয়রন (ঢালাই লোহা) ব্যবহার করা হয়। ফিল্টার বা ছাঁকনিটি আর্সেনিক যুক্ত পানির প্রায় সমস্ত আর্সেনিক অবমুক্ত করার ক্ষমতা রাখে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও প্রখ্যাত জার্নালে অধ্যাপক হুসসামের প্রায় শতাধিক প্রকাশনা রয়েছে।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯; ন্যাশনাল একাডেমি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ পুরস্কার, স্বর্ণপদক, ২০০৭; গ্লোবাল হিরোস অফ দি এনভায়রনমেন্ট পুরস্কার, ২০০৭ ইত্যাদি।

আতাউল করিম

জন্মঃ ৪ মে, ১৯৫৩ (বয়স ৬৩); বড়লেখা উপজেলা, সিলেট, বাংলাদেশ।

জীবনী: বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের বড়লেখার মিশন হাউজে জন্মগ্রহণ করেন আতাউল করিম। বাবা মোহাম্মদ আবদুস শুকুর পেশায় ডাক্তার ছিলেন। তিনি ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বোর্ডে প্রথম শ্রেণীতে ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সিলেট এমসি কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে বি.এস.সি. (অনার্স) ডিগ্রী লাভের পর উচ্চ শিক্ষা লাভের

উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার অফ সায়েন্স, ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার অফ সায়েন্স এবং পিএইচডি করেন ইউনিভার্সিটি অব আলাবামা থেকে যথাক্রমে ১৯৭৮, ১৯৭৯ এবং ১৯৮১ সালে। পড়ালেখা শেষ করে তিনি আরকানস বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার নরফোকে অবস্থিত ওল্ড ডোমিনিয়ন ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট (গবেষণা) হিসেবে কর্মরত।

গবেষণাঃ তিনি ৬০ টিরও বেশি এমএস/পিএইচডি গবেষণা তত্বাবধান করেন। তিনি ১৯ টি বই, ৮টি বইয়ের অধ্যায় এবং ৩৬৫ টি গবেষণাপত্র রচনা করেন। তার নেতৃত্বে একটি টিম উড়ন্ত ট্রেন এর প্রোটোটাইপ নির্মাণ করেন। ট্রেনটি চৌম্বক উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে চলবে। ট্রেনটি নির্মাণে শুধুমাত্র ১,২০,০০০ থেকে ৩,০০,০০০ মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ এনসিআর স্টেকহোল্ডার অ্যাওয়ার্ড (১৯৮৯); নাসা টেক ব্রিফ অ্যাওয়ার্ড (১৯৯০); আউটস্ট্যান্ডিং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড (১৯৯৪); আউটস্ট্যান্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড (১৯৯৮) ইত্যাদি।

মাকসুদুল আলম

জন্মঃ ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৪; ফরিদপুর, বাংলাদেশ

মৃত্যুঃ ২০ ডিসেম্বর, ২০১৪; যুক্তরাষ্ট্র

জীবনী: ড. মাকসুদুল আলম ছিলেন একজন বাংলাদেশী জিনতত্ত্ববিদ। তার নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডাটাসফটের একদল উদ্যমী গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে পাটের জিন নকশা উন্মোচিত হয়। ২০১০ সালের ১৬ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে পাটের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কারের ঘোষণা দেন। তার পিতা দলিলউদ্দিন আহমেদ ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের (ইপিআর) একজন কর্মকর্তা এবং তার মা ছিলেন লিরিয়ান আহমেদ ছিলেন একজন সমাজকর্মী ও শিক্ষিকা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার পিতা শহীদ হন। গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে স্বাধীনতার পর মাকসুদুল আলম চলে যান রাশিয়ায়। সেখানে মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অণুপ্রাণবিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর (১৯৭৯) ও পিএইচডি (১৯৮২) সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেরিন বাই প্রডাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টারে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৯২ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ২০০১ সাল থেকে মৃত্যুরর আগে পর্যন্ত তিনি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে যান।

গবেষণাঃ ২০০০ সালে তিনি ও তাঁর সহকর্মী "রেন্ডি লারসেন" প্রাচীন জীবাণুতে মায়োগেণ্ডাবিনের মতো এক নতুন ধরনের প্রোটিন আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কারের সুবাদে মাকসুদের খ্যাতি ও দক্ষতা সবার নজরে আসে। তিনি হাওয়াইয়ান পেঁপের জিন নকশা উন্মোচন করেন। এ কাজ সম্পন্ন করার পর বিজ্ঞান সাময়িকী নেচারের প্রচ্ছদে স্থান পান তিনি। এরপর মালয়েশিয়ায় রাবারের জিন নকশা উন্মোচনের কাজেও তিনি সফল হন। পরে তিনি মনোনিবেশ করেন পাটের জিন নকশা উন্মোচনে।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ২০১৬ সালের স্বাধীনতা পদক প্রদান করে।

শাহ এম ফারুক

জন্মঃ ১৯৫৬, যশোর, বাংলাদেশ।

জীবনী: তিনি যশোর জিলা স্কুল, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, যশোর সরকারি এম এম কলেজ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ থেকে বিএসসি এবং এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ইউ কের রিডিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রি পান। ফারুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি পরে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আইসিডিডিআরবিতে যোগ দেন, এবং আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন।

গবেষণাঃ ড: শাহ এম ফারুক এবং তার গবেষণা দল কলেরা রোগের কারণ আবিষ্কার করেছেন। তিনি তার গবেষণায় দেখিয়েছেন বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া কিভাবে কলেরার মত ভয়ংকর রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ ২০০৫ সালের TWA বর্ষসেরা বিজ্ঞানী নির্বাচিত হন, TWAS ফেলো, বিজ্ঞান বিশ্ব একাডেমী এবং বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস এর ফেলো ইত্যাদি।

শুভ রায়

জন্মঃ ১০ নভেম্বর ১৯৬৯ (বয়স ৪৭), ফটিকছড়ি উপজেলা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

জীবনী: শুভ রায় একজন বাংলাদেশী-মার্কিন বিজ্ঞানী এবং কৃত্রিম কিডনির আবিষ্কারক। তার পৈতৃক নিবাস চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার রোসাংগিরিতে। পাঁচ বছর বয়সে ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরীর একটি বিদ্যালয়ে নার্সারিতে শুভ রায়কে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তার বাবা অশোক নাথ রায়ের পেশাগত কারণে ১৯৭৪ সালে তাদের উগান্ডায় চলে যেতে হয়। উগান্ডার জিনজা সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল থেকে সেকেন্ডারি পাস করেছেন শুভ রায়। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান শুভ। কম্পিউটার বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইওর মাউন্ট ইউনিয়ন কলেজ থেকে। তিনি ১৯৯৫ সালে কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটি থেকে তড়িৎ প্রকৌশল ও ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার্স এবং ২০০১ সালে তড়িৎ প্রকৌশল ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি ক্লীভল্যান্ড ক্লিনিকের বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রজেক্ট স্টাফ হিসেবে যোগ দেন। ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ক্লীভল্যান্ড স্টেট ইউনিভার্সিটির ফলিত বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের সহকারী অধ্যাপক এবং কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির তড়িৎ প্রকৌশল ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

গবেষণাঃ তিনি কৃত্রিম কিডনির সহ-আবিষ্কারক। এছাড়া তিনি তারবিহীন স্ট্রেস এবং চাপ পরিমাপক মাইক্রো সেন্সর আবিস্কার করেন যা মেরুদন্ডে অস্ত্রোপচারের সময় হাড়ের অবস্থা নিরীক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়। তিনি উচ্চ রিসোলিউশনের ছোট আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজিং প্রযুক্তির যন্ত্র আবিস্কার করেন যা ধমনীতে স্থাপন করা যায়।

পুরস্কার ও সম্মাননাঃ সিনিয়র ফিজিক্স প্রাইজ, মাউন্ট ইউনিয়ন কলেজ; এম.আই.টি.-র TR100 ইত্যাদি।

এম জাহিদ হাসান

জীবনী: এম জাহিদ হাসান একজন বাংলাদেশী পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। অ্যাডভোকেট রহমত আলী ও গৃহিণী নাদিরা বেগমের দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে জাহিদ সবার বড়। ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬ সালে এসএসসিতে সম্মিলিত মেধাতালিকায় দ্বিতীয় ও ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৮৮ সালে এইচএসসিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন জাহিদ। অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে পরে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেন। এই সময় তিনি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর আমন্ত্রণ পান। এরই মধ্যে প্রায় ২০ জন শিক্ষার্থী তার তত্ত্বাবধানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

গবেষণাঃ তার নেতৃত্বে একটি দল নতুন একটি বস্তু-দশা যার নাম দেওয়া হয়েছে 'টপলোজিক্যাল ইনসুলেটর' বা 'স্থানিক অন্তরক' আবিস্কার করেন। এছাড়া তিনি ভরহীন Quasi Particle, Weyl Fermion আবিষ্কার করেন। তার প্রকাশিত শতাধিক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের দুই- তৃতীয়াংশই ছাপা হয়েছে নেচার, ফিজিক্স টুডে, সায়েন্স, ফিজিক্যাল রিভিউর মতো বনেদি, অভিজাত ও বিখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকীতে।

বাংলাদেশের আরও অনেক বিখ্যাত এবং উদীয়মান বিজ্ঞানী থাকলেও, এই স্বল্প পরিসরে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হল না।

যুগে যুগে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা যেমন তাদের আবস্কার দ্বারা মানব কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন তেমনি ভবিষ্যতেও তারা কাজ করে যাবেন। আর আমরা আশা করি তাদের এই যাত্রায় বাংলাদেশী বিজ্ঞানীরা আরও বেশী করে অবদান রাখবেন।

সুত্র ঃ নিবন্ধের বিভিন্ন অংশ উইকিপেডিয়া এবং উইকিপেডিয়াতে উল্লেখিত তথ্যসূত্র থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত।

বিজ্ঞানীদের ছবিসমূহ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

প্রতিদিনের প্রসাধনী (Daily Cosmetics)

অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হাশেম
রসায়ন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা সকাল বেলাতেই গোসলের জন্য শরীর ধৌতকারী (Body Wash), সেভিং ক্রিম, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, মুখ-মন্ডল ধৌতকারী (Face Wash) যা কিনা সুন্দর গন্ধযুক্ত (Sweet Smelling), জীবাণুনাশক (Germ Killing), চামড়া-নরম কারক (Skin-Softening) এ ধরনের নানা দ্রব্য ব্যবহার করি। এরপর হাতে-পায়ে একটু লোশন, মুখে আদ্রতা নাশক (Moisturizer) আরও অন্যান্য কিছু ক্রিম শরীরে মেখে নেই, যা কিনা শরীরকে চুলকানী থেকে রক্ষা করে। দাঁত ব্রাশের জন্য বিভিন্ন ধরণের দাঁতের পেস্ট বা মাজন, মুখের দূর্গন্ধনাশক মাউথ ওয়াশ ব্যবহার করতেও ভুলিনা। শরীরটাকে সুগন্ধযুক্ত করতে বা অপরকে আকর্ষিত করতে আমরা কিন্তু নানা ধরনের সুগন্ধি দ্রব্য (Deodorant), ঠোঁটে একটু লিপিস্টিক, মুখমন্ডলে ফেস-পাউডার, অনেকে চোখের কালিমা দূর করতে আইলাস (Eye Lash), মাসকারা আরও কত কি ব্যবহার করে ফেলি আমরা উপরে যে বিবরণ দিলাম, এটাই কিন্তু নৈমিত্তিক ব্যপার; আর যে জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করি, আমাদের শরীরকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে তাই হল প্রসাধনী দ্রব্য (Cosmetics)। দিনের শুরুতেই আমরা কিন্তু প্রায় ১২ থেকে ১৫ টি দ্রব্য ব্যবহার করে ফেলি। এটাই আমাদের জীবন প্রক্রিয়া। আজ তা হলে চলুন আমরা এগুলো সম্পর্কে একটু জেনে নেই। এগুলো কি, কি তাদের উপাদান, আমাদের সৌন্দর্যবর্ধণকারীর কোন ক্ষতিকারক দিক আছে কিনা, দেশের অর্থনীতিতে এরা কোন অবদান রাখছে কিনা, ভবিষ্যৎ কি ইত্যাদি।

প্রসাধনীর সংজ্ঞা (Definition of Cosmetics)

প্রসাধনী বলতে কোন একক দ্রব্য বা মিশ্রিত দ্রব্যকে বুঝায় যা কিনা মানুষের বাহ্যিক অংগ-প্রত্যংগে (ত্বক বা চামড়া, চুল, নখ, ঠোট, চোখ ও লিংগের বহিস্থাংস ইত্যাদি) সংস্পর্শ অথবা দাঁত ও মুখ গহবরের প্রধানত: পরিষ্কারক হিসেবে ব্যবহার করে তাদের সৌন্দর্যবর্ধণ করে, ভাল গন্ধকারক করে দেহের বাহ্যিক আবরনের পরিবর্তন করে আকর্ষনীয় করে তোলে কিন্ত এতে শরীরের গঠন অন্তস্থ: শারিরিক কোন ক্রিয়া কলাপের পরিবর্তন না করে তাদেরকে ভাল অবস্থায় রাখে। (A Cosmetic product shall mean any substance or preparation intended to be placed in contact with the various external parts of the human body (epidermis, hair system, nails, Lips, eyes and external genital organs) or with the teeth and the mucous membranes of the oral cavity with a view exclusively or mainly to cleaning them, beautifying them, perfuming them, promoting attractiveness or changing, altering their appearance without affecting the body structure or functions, and/or correcting body odors and /or protecting them or keeping them in good condition).

শত শত বছর ধরে মানুষ প্রসাধন দ্রব্য চেহারার উজ্জলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে আসছে। জানা মতে মিশরীয়রা প্রথম প্রসাধন ব্যবহার করে। তখনকার দিনে চোখে রং দেয়া বা শরীরের চামড়ায় রং দেয়াই প্রধান প্রসাধন ছিল। কিন্তু আজকের আধুনিক যুগে ছেলে বা মেয়ে উভয়েই প্রসাধন ব্যবহারে খুব সজাগ। সবাই এখন অনেক বেশী সৌন্দর্য পিপাস্যু ও চেহারা নিয়ে উদ্বিগ্ন। মানুষ এখন সবসময় আকর্ষণীয়, সুন্দর ও তরুণ থাকতে চায়। প্রসাধন ব্যবহারে মানুষের মনের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। তাই প্রসাধন আজকের জীবনের নৈমিত্তিক ব্যপার। প্রসাধন দ্রব্যাদি তাই আমাদের জীবনের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করি। নিম্নে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রসাধনীকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হল-

১। পরিষ্কারক-ক্রিম(Cleanser) ২। মার্জনী-সাবান (Exfoliator) ৩। আদ্রতাকারক-শুষ্কতা রক্ষা কারী (Moisturizer) ৪। চোখের ক্রিম (Eye Cream) ৫। সংস্থাপণ ক্রিম (Foundation) ৬। ছদ্মবেশ/গুপ্তকরণ (Concealer) ৭। পাউডার (Powder) ৮। লালভ (Blush) ৯। চক্ষুপাতা রংকারক (Eye Shadow) ১০। চক্ষু রংকারক (Eye Liner) ১১। মাশকারা (Mascara) ১২। ঠোট রংকারক (Lipstick) ১৩। ঠোট গ্লেজার (Lip Gloss) ১৪। সুগন্ধি কারক (Perfume) ১৫। বয়স নির্ধারক রক্তাম্বু (Age Serum).

নানা ধরনের প্রসাধনী বাজারে সহজেই পাওয়া যায়। তারমধ্যে ক্রিম, লিপিস্টিক, সুগন্ধি, চক্ষু ঢাকনা, নখ পালিশ, চুলের রং ও স্প্রে ইত্যাদি। মুখ মন্ডলের পাউডার যা কিনা ফাউন্ডেশন ক্রিমের পরে ব্যবহার করে গালের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। বয়স কমানোর ক্রিম ও এখন তারুন্য ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করে। চামড়াকে সতেজ রাখার জন্য নানাধরনের ক্রিম, জেল ও কোলোন ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরাতো নিত্যই সাবান/ডিটারজেন্ট ব্যবহার করছি। নানাধরনের লোশন ব্যবহার করছি শরীরের চামড়াকে নরম, উজ্জ্বল রাখার জন্য- ভ্যাসলিন, লানোলিন এর মধ্যে উল্লেখ্য। চুল পরিষ্কার ও সতেজ রাখার জন্য নানা ধরনের শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার করি। চুলের স্টাইল ও রং করার জন্য নানারকম স্প্রে, রং ব্যবহার করি। শিল্পী/চিত্রশিল্পী/নৃত্যশিল্পী এরা সবাই চেহারা পরিবর্তনের জন্য নানা ধরনের ক্রিম ব্যবহার করে। সূর্যের আলো থেকে রক্ষার জন্য এখন সান-ক্রিন ব্যবহার হচ্ছে। দাঁতকে সুরক্ষা করা আমাদের খুবই প্রয়োজন; এজন্য নানা ধরনের দাঁতের পেস্ট বা মাজন ব্যবহার করি। এতসব প্রসাধনী দ্বারা আমাদের বাজার সয়লাব হয়ে আছে আর আমরা এগুলো ক্রয় করছি আমাদের প্রয়োজনে। ফলে প্রসাধন কেবলমাত্র আমাদের প্রয়োজনই মিটাচ্ছেনা এটা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের অবদান রাখছে।

পরিষ্কারক (Cleanser)

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা আমাদের জীবনের প্রধান কর্ম। অপরিচ্ছন্ন অংগ নানা ধরনের জীবানু বাহক। শরীর পরিচ্ছন্ন থাকলে আমাদের মন ভালো থাকে ও আমরা স্বাচ্ছন্দ অনুভব করি। দেহ বা অংগ পরিষ্কারের জন্য আমরা সাধারনত; সাবান, ক্রিম ও পানি ব্যবহার করি। সাবান ও পানি আমরা নিত্য ব্যবহার করি। সাধারণ সাবান-পানি দিয়ে অংগ-প্রতংগ পরিস্কার করলে অনেক সময় অস্বস্থি বোধ করি। চামড়া শুকিয়ে যায়, চুলকানি হয়। এ থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য আমরা নিরপেক্ষ (neutral) সাবান ও সামান্য গরম পানি ব্যবহার করতে পারি। অনেক ক্ষেত্রে সাধারন সাবানের সাথে পূর্বেই অল্প পরিমানে বোরিক এসিড বা স্টার্চ (Starch) মিশ্রিত পানিও ব্যবহার করতে পারি। সাবান ব্যবহার না করে আমরা অনেক সময় দৈনিক একবার ক্রিমও ব্যবহার করতে পারি। অনেকে একের অধিকবার ক্রিম ব্যবহার করে থাকে পরিচ্ছন্নতার জন্য। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। আসলেই কি ক্রিম চামড়ার ভিতরে প্রবেশ করে চামড়াকে মোলায়েম ও সতেজ রাখে? ক্রিম অনেক সময় চামড়াকে নরম না রেখে শক্ত কাটার মত শক্ত করে তুলে। চামড়ার নীচে চর্বিজাত পদার্থ থাকে, এটাই চামড়াকে নরম রাখে, তবে কোন সময় এই চর্বির পরিমান কমে গেলে চামড়া শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। ক্রিম এই তৈলাক্ততা দান করে চামড়াকে নরম রাখে। ক্রিম আমাদের চামড়াকে রৌদ্র ও ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে। ক্রিম নানাধরনের পদার্থ থেকে তৈরী হয়, তার মধ্যে ভেসলিন ও লানোলিন অন্যতম। এ ধরনের ক্রিম শুষ্ক চামড়াকে নরম রাখে। সাবান ও জেলাটিন দিয়েও ক্রিম তৈরী করা হলে তা তৈলাক্ত চামড়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। ভেসলিন, চর্বি ও তেল থেকে তৈরী ক্রিমগুলো অদ্রবনীয় ক্রিম আর গ্লিসারিন, জেলি ও ট্রাগাকান্থ (Tragacanth) গাম থেকে তৈরী ক্রিম হল দ্রবনীয় ক্রিম। ক্রিমের মধ্যে অল্প পরিমান জিংক অক্সাইড, ZnO যোগ করলে ক্রিমের রং কিছুটা সাদা হয়। যে সমস্ত ক্রিম লাগালে চামড়ার উজ্জ্বলতা বেড়ে যায় সে সমস্ত ক্রিমে স্টিয়ারিক এসিড, টিন অক্সাইড, গ্লিসারিন ও পানি থাকে। টিন খুবই বিষাক্ত, তাই এটা সংযোজন না করাই ভাল। প্রতিনিয়ত সাবান-পানির পরিবর্তে ক্রিম ব্যবহার করা ঠিক নয়। অনেক ক্রিমের মধ্যে মোম মিশ্রিত থাকে, যা কিনা ক্ষতিকারক। মোম চামড়ার উপরে শক্ত স্তরের সৃষ্টি করে লোম কূপের ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দেয় এবং চামড়ার স্তরকে পাতলা করে দিয়ে চামড়ার মধ্যে ভাজের সৃষ্টি করে। ক্রিম ব্যবহারের আর একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক দিক হল, এটা অনেক ক্ষেত্রে লোমের বৃদ্ধিকে তরান্বিত করে ও লোমের ঘনত্ব বা পরিমান বৃদ্ধি করে।

অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের মুখে বা গালে নতুন নতুন লোম গজাতে লক্ষ করা যায়। ক্রিম ব্যবহার করলে চুলকানি হতে পারে এবং অনেকক্ষেত্রে গালে ফুস্কুরি দেখা যায়।

অতিরিক্ত সাবান ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে। অনেকসময় বেশী ক্ষারীয় বা এসিডিয় সাবান ব্যবহার করলে হাতে-পায়ে বা শরীরে ফোস্কা পড়তে পারে। অনেক সাবান প্রস্তুতকারক সাবানে সামান্য পরিমানে পারদ (Hg) ব্যবহার করে থাকে যা চামড়ার রংকে ফর্সা করে। কিন্তু পারদ আমাদের জন্য খুবই বিষাক্ত। এ ধরনের সাবান ব্যবহার না করাই ভাল।

মেকআপ/বিন্যস্ত করা (Makeup)

কম বয়সী মেয়েরা তাদের চেহারার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য মেকআপ প্রসাধনী ব্যবহার করে আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। তের বছরের কম বয়সী মেয়েদের মেকআপ প্রসাধনী ব্যবহার করা ঠিক নয়। এতে তাদের দীর্ঘ মেয়াদে চামড়ার বেশ ক্ষতি হয়। মেকআপ সৌন্দর্য্যকে বৃদ্ধি করে কিন্তু এর অনেক ক্ষতিকারক দিক আছে। মেকআপ ক্রিমের মধ্যে ফাউন্ডেশন, সুগন্ধি, চুলের বন্ধন, চোখের রেখা, মাশকারা উল্লেখ্য। এদের ব্যবহারে মাথা ধরা, এলার্জি, চুলের ক্ষতি, চোখের সংক্রমন ও চোখের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

লোশন (Lotion)/ সান্সক্রিন (Sun Screen)

আমাদের চামড়াকে নরম ও সতেজ রাখার জন্য প্রতিনিয়ত লোশন ব্যবহার করি। লোশনে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে ক্ষতিকারক দ্রব্যগুলো হল সুগন্ধি, স্টিয়ারিক এসিড, অ্যালকাইলোমাইড, প্যারাবেন, পেট্রোলিয়াম ও থ্যালেট অন্যতম। এগুলো ব্যবহার করলে চামড়ার মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে এবং অবশেষে রক্তের মধ্যে মিশে যেতে পারে।

ফেস পাউডার (Face Powder)

ফেস পাউডারে সাধারনত: জিংক, লোহা ও ম্যাগনেশিয়া অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের সংঙ্গে মিশ্রিত থাকে। সাধারণভাবে এগুলো ক্ষতিকারক নয় তবে তৈলাক্ত চামড়ায় যদি ক্রিম ব্যবহারের পরে পাউডার ব্যবহার করা হয় তা হলে চামড়ার উপরে ফুসকরি উঠে। ফেস পাউডারে স্বাভাবিক ভাবে কিছু সুগন্ধি মিশানো যা থেকে আমাদের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

রোজ (Rouges)

রোজ সাধারনত: মেয়েরা গালের রংকে লালাভ করার জন্য ব্যবহার করে। রোজের মধ্যে ম্যাগনেশিয়া, লোহা, সিলিকা, ইউজিন (eosin), কারমাইন (Carmine) ও কিছু অ্যানিলিন রং মিশ্রিত থাকে। অ্যানিলিন রং অনেকক্ষেত্রে চামড়াতে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

লিপস্টিক (Lipsticks)

মেয়েদের ঠোঁট রাঙ্গানোর জন্য এটা একটা প্রধান প্রসাধনী। নানা রং এর লিপস্টিক আছে। লিপস্টিক এর মধ্যে মোম, সুবাসিত মলম (Pomade), কোকোয়া বাটার, কারমাইন আর অ্যানিলিন রং থাকে। লিপস্টিক অনেক সময় আমরা খেয়ে ফেলি; যথেষ্ট পরিমানে পেটে গেলে তা মারাত্মক ক্ষতিকারক হতে পারে।

শ্যাম্পু (Shampoo)

আমরা রুটিন মাফিক চুল পরিষ্কার করি, আর তার জন্য বিভিন্ন ব্রান্ডের শ্যাম্পু ব্যবহার করি। শ্যাম্পু ব্যবহারে চুলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় ও সুগন্ধিযুক্ত হয়। শ্যাম্পুর প্রধান উপাদান হল- সোডিয়াম লরাইল/লরেথ সালফেট, ডায়োক্সান, ডাই ইথানোলোমাইন (DEA) প্যারাবেন, প্রপিলিন গ্লাইকল ইত্যাদি। ২০০৮ সালে এক রিপোর্টে বলা হয় ৪০% শ্যাম্পু

উৎপাদনের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্যানসার উৎপাদক। বাজারে এখন অনেক গ্রীন শ্যাম্পু বিক্রি হয় যা কিনা ক্যান্সার উৎপাদক মুক্ত। যেমন আরগন তেল শ্যাম্পু, নানা ধরনের হারবাল শ্যাম্পু, কিছু বার (কঠিন) শ্যাম্পু।

ডিওডরান্ট (Deodorant)/ ঘাম-নিরোধক (Anti-Perspirants)

ডিওডরান্ট হল সবচেয়ে বেশী প্রচলিত সুগন্ধি প্রসাধনী। ডিওডরান্ট নানা ধরনের আছে: কোনটার তীব্র গন্ধ, অন্যটার গন্ধ মোলায়েম। এগুলো আমদের শরীরের গন্ধ থেকে পরিত্রান দেয়। আমরা যদি ঘেমে যাই তা হলে আমরা ঘাম-নিরোধক পাউডার ব্যবহার করি। ঘাম-নিরোধকগুলো ক্ষতিকারক অ্যালোমিনিয়াম যুক্ত থাকে। অ্যালোমিনিয়াম আমাদের দেহের জন্য খুবই ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত। ডিওডরান্টগুলো আমাদের দেহের জীবানুগুলোকে ধ্বংস করে। ডিওডরান্ট ও ঘাম-নিরোধক গুলোর প্রধান উপাদান হল- অভ্র (talc), ট্রাইক্লোজান (Triclosan), সিলিকা, থ্যালেট, প্যারাবেন ইত্যাদি। উপরোক্ত উপাদানগুলো চামড়ার অ্যালার্জি, ক্যানসার, অ্যলজাইমার (Alzheimer) ও কিডনীর সংক্রমনের জন্য দায়ী।

পাউডার (Powder)

আমরা গরমের দিনে প্রায় সবাই পাউডার ব্যবহার করে থাকি, বিশেষ করে শিশুদের এটা প্রধান প্রসাধনী। শরীর চুলকালে, ঘাম হলে, ন্যাপকিন ব্যবহারে চামড়া লাল হয়ে গেলে আমরা পাউডার ব্যবহার করে থাকি। পাউডার আমাদের উপকারী, কিন্তু এর কিছু ক্ষতিকারক দিকও আছে। পাউডার ব্যবহারে অনেক সময়- ফুসফুসের ক্ষতি হয়। আর উদ্বেগজনক দিক হল এটা মহিলাদের ডিম্বাশয়ের ক্যানসার (Ovarian Cancer) উৎপাদক। প্রাকৃতিক পাউডার হল চালের গুড়া, কর্নস্টার্চ, অ্যারারোট গুড়া, ক্যাউলিন কাদা, বেকিং সোডা ইত্যাদির মিশ্রন, যেখানে কোন রাসায়নিক উৎপাদক থাকে না।

দাঁতের পেস্ট বা মাজন (Toothpaste)

দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য আমরা রাতে ও সকালে এই দু'বার দাঁত ব্রাশ করি। আর তার জন্য দরকার দাঁতের পেস্ট বা মাজন। পেস্ট সাধারনত: চক পাউডার, ইটের গুড়া, ওয়েস্টার শেল, লবনের মিশ্রনে তৈরী করা হয়। এছাড়া এতে সোডিয়াম কার্বনেট, পার অক্সাইড (দাঁত সাদা করার জন্য), রঙ্গিন পদার্থ, পানির নরমকারক, এবং অনেক ক্ষেত্রে ফ্লোরাইডও মিশ্রিত থাকে। বেশী পরিমানে ফ্লোরাইড পেটে গেলে এর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শিশুদের পেস্টে কখনও ফ্লোরাইড দেয়া যাবে না, কারন শিশুরা অনেকক্ষেত্রেই দাঁত ব্রাশের সময় পেস্ট গিলে ফেলে।

এটা সত্য যে আমাদের অনেক নৈমিত্তিক প্রসাধনী দ্রব্য ও সৌন্দর্য্যবর্ধক উপাদানগুলো খুব ভাল নয়। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বলেন যে প্রসাধনী দ্রব্যে ব্যবহৃত ৮২,০০০ উপাদানের এক অষ্টমাংশ ঝুকিপূর্ণ শিল্প উপাদান। এর অর্থ হল প্রায় ১০,৫০০ শিল্প কেমিক্যাল প্রসাধনী দ্রব্যের প্রধান উপাদান যা কিনা বিষাক্ত, কিটনাশক, জনন ক্রিয়ার বিষাক্ত পদার্থ (reproductive toxins), endocrine disruptors, প্লাস্টিক উৎপাদক (Plasticizer) ও পৃষ্ঠ পরিষ্কারক (Surfactant)। এ ধরনের দ্রব্য আমরা শরীরে লাগাই যা চামড়ার মাধ্যমে আমাদের শরীরের অন্তর্নিহিত অংগ-প্রত্যংগ ও রক্তনালীতে প্রবেশ করে আমাদের দেহের ক্ষতি সাধন করে। নিম্নে কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্যের নাম উল্লেখ করা হল যা কিনা হরহামেশাই প্রায় সকল ধরনের প্রসাধনীতে ব্যবহার করা হয়। বহুচাক্রিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বণ (PAHs), যা প্রাকৃতিক ভাবে কয়লা, পেট্রোল ও গ্যাসোলিনের প্রধান উপাদান। শ্যাম্পু ও বিভিন্ন প্রসাধনীতে এটা ব্যবহার করা হয়। এর আধিক্য স্তন ক্যান্সার সৃষ্টি করে। BHA BHT(Butylated hydroxy avisol Butylated) হল এন্টি-অক্সিড্যান্ট; আর এর ব্যবহার আদ্রতাকারক (Moisturizer), মেকআপ ক্রিম ও লিপস্টিকের সংরক্ষক (Preservative) হিসেবে। এদের দ্বারা থাইরয়েড, কিডনী ও লিভার আক্রান্ত হয়। এদের আধিক্যতা প্রজনন ক্রিয়ায়ও ব্যঘাত ঘটাতে পারে। কসমেটিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য প্যারাবেন (esters of p- Hydroxy benzoic acid) ব্যবহৃত হয়। এটা খুবই সস্তা রাসায়নিক যৌগ। এর জীবানু নাশক ধর্মও আছে। প্যারাবেন হল হরমোন ধ্বংশকারী, স্তন ক্যান্সার সৃষ্টিকারী, টিউমার উৎপাদক, স্নায়ুতন্ত্র ধ্বংসকারক। ট্রাইক্লোজান (Trichlosan, Z-Hydroxy-2,4,4-

trichlorodiphenyl) এক ধরনের কীটনাশক বা জীবাণুনাশক: এটা জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করার সময় আমাদের দেহে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে জীবাণু প্রতিরক্ষা কোষ গড়ে উঠে তা হতে বাঁধাগ্রস্থ করে ফলে আমাদের নিজেস্ব প্রতিরক্ষা শক্তি কমে যায়। এটা আমাদের দেহের হরমোন নিয়ন্ত্রন ব্যবহারকে নষ্ট করে দেয়। এটা বিশেষ করে মহিলাদের সেক্স হরমোন (estrogen) এর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং পরবর্তি কার্যকারিতা হল স্তন ক্যান্সার গঠন ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দান। মায়েদের দুধে এটা সংরক্ষিত হয়। ট্রাইক্লোজান দাঁতের gingivitis প্রতিরোধ করে। তাই Colgate কোম্পানি তাদের দাঁতের পেস্টে এটা ব্যবহার করে। এটা মাত্রারিক্ত না হলে সবধরনের প্রসাধনীতে যেমন Body wash, Hand Soap, Makeup, Mouth wash, deodorant ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

সোডিয়াম লরাইল সালফেট (SLS) সাবান, শ্যাম্পু, দাঁতের পেস্টের সাধারন উপাদান। ৯০% প্রসাধন দ্রব্যে এটা ব্যবহার করা হয়। এটা সহজেই আমাদের ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেহের ক্ষতি করতে পারে। এটা ত্বককে বিনষ্ট করে এবং চুল পড়তে সহায়তা করে। এটা ত্বক ও চোখের জন্য জ্বালাতক। SLS neurotoxic endocrine distruptor এটা দেহের কোষের পরিবর্তন আনে, ফলে mutation ও ক্যান্সার উৎপাদক। এর গঠন নিম্নরুপ।

$(CH_3 (CH_2)_{10} CH_2 (OCH_2)_n OSO_3^- Na^+$ (n=3; সাধারন)।

ফরমালডেহাইড (HCHO): সকল সাবানেরই সাধারণ উপাদান। এটা মানুষের দেহে ক্যান্সার উৎপাদন করে, হাড়ের সংযোগ স্থলে ব্যথার সৃষ্টি করে, হৃৎপিন্ডের স্পন্দনে ব্যাঘাত করে ও ইমুউন তন্ত্রকে দূর্বল করে দেয়। এর প্রভাবে অ্যাজমার সৃষ্টি হয়, বমি বমি ভাব, শ্বাস কষ্ট হয়, চোখ জ্বলে ও মাথায় যন্ত্রনা হয়।

থ্যালেট (Plasticizer) প্রধানত: নেইল পালিশ, চুলের রঞ্জক প্রসাধনে ব্যবহৃত হয়। এর ব্যবহারে আংগুলের নখের উপরে পরত ভেঙ্গে যায় না ও চুলের স্টাইলের কোন ব্যঘাত ঘটে না। দুই ধরনের থ্যলেট ডাইবিউটাইল থ্যালেট (DBP) Plasticizer হিসেবে এবং ডাইমিথাইল থ্যালেট (DMP) চুলে নমনীয় আবরনী (Film) তৈরীতে সহায্য করে। উভয় উপাদানই আমাদের ক্ষতিকারক। এর আধিক্যে পুরুষের বীর্য (Sperm) উৎপাদন কমে যায় ও মহিলাদের ডিম্বকোষের-কার্যক্ষমতা কমে যায়। এটা হরমোনের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়, ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিকলাংগ শিশুর জন্ম হয়, অনেক সময় লিভার ও কিডনি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

DEA-MEA-TEA (Diethanolamine, Methanolamine, Triethanolamine): এগুলো ইমালশান তৈরীতে, সুগন্ধি কারক। এদের ব্যবহার প্রধানত: সাবান, ফাউন্ডেশন, চোখের পলককারক(eye Shadows)ও সানস্ক্রিন প্রসাধনে, এরা ক্যান্সার জাতক রং কিডনী ও লিভারকে নষ্ট করে দেয়। এটা Choline উৎপাদ যা কিনা শিশুদের মস্তিস্ক (Brain) উন্নয়নে সহায়তা করে, তাকে শোষন করে নিয়ে ব্রেন উন্নয়নকে বাধা গ্রস্থ করে। এরা সাবানের ফেনা তৈরীতে সাহায্য করে।

পেগ (PEG), পলিইথিলিন গ্লাইকল হল Surfactants, humectants ও Skin Conditioner। এগুলো পরিষ্কারক ও ইমালসিফাইর। PEGখুব বিষাক্ত ও চামড়ার ক্ষতিকারক। সব ধরনের ক্যান্সার উৎপাদক, ব্রেন ক্যান্সার, রক্ত ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার ইত্যাদির সৃষ্টিকারক। গঠন নিম্নরুপঃ

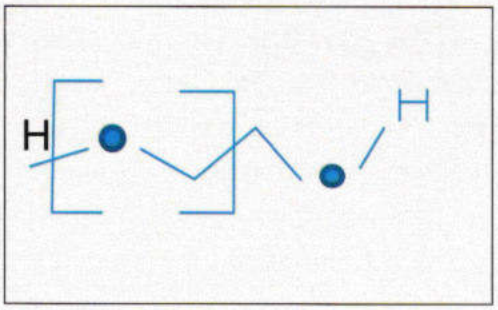

উপরে উল্লেখিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ছাড়াও প্রসাধন দ্রব্যে নিম্নলিখিত রাসায়নিক দ্রব্যাদিও ইচ্ছামাফিক প্রসাধন প্রস্তুত কারীগন ব্যবহার করে থাকে:

1. Octyl-methoxy Cinnamate

2. Para-Aminobenzoic acid (PABA)

3. 3- Benzylidene Camphor (3-Bc)

4. 3- (4-Methyl-benzylidene) Camphor (4-MBC)

5. 2- Ethylhexyl-4-Methoxy Cinnamate (OMC)

6. Homosalate (HMS)

7. 2- Ethylhexyl 4-dimethylamino benzoate (OD-PABA)

সাইলোক্জান (Siloxanes)- হল সিলিকন উৎপাদ রাসায়নিক উৎপাদ। এগুলো প্রসাধন দ্রব্যাদিকে নরম, আদ্র ও আরামদায়ক করে। এরা বিষাক্ত, হরমোন ক্রিয়া কলাপে ব্যাঘাত ঘটায় এবং প্রজননে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এরা জরায়ুতে টিউমার সৃষ্টি করে, স্তনে শোষিত হয় (Breast implants)।

ট্যাল্ক (Talc)- একটা নরম খনিজ আকরিক বা পাউডার। এর উপাদান আদ্র ম্যাগনেশিয়াম সিলিকেট। এটা সাদা, বাদামী ও সবুজ রং এর হতে পারে। এটা ফেস পাউডার বা সাধারন পাউডারে ব্যবহার করা হয়।

বিসমুথ অক্সিক্লোরাইড (Bismuth Oxychloride)- এটা একটা সংশ্লেষিত রাসায়নিক দ্রব্য। এর মধ্যে কিছু পরিমান ভারী ধাতু থাকে। মেকআপে এটা ব্যবহার করা হয়। নখ পালিশ ও সুগন্ধি হিসেবেও এটা ব্যবহার করা হয়। এটা ফুসফুসে গেলে বা গলাধঃকরন করলে বমি ভাব, মাথা ধরা বা ডাইরিয়া হতে পারে। এটা প্রজননে বাধা গ্রস্থ করে ও বীর্য উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

ভারী ধাতু (Heavy Metal)- প্রসাধনে নানা ধরনের ভারী ধাতু অপদ্রব হিসেবে আসতে পারে। ধাতুগুলোর মধ্যেlead, Iron, Cobalt, Nickel, Cadmium, Aluminum, Arsenic, Mercury, Chromium, Copper, Silver, Zinc অন্যতম। উপরে উল্লেখিত ধাতুগুলোর মধ্যে কয়েকটা আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু মাত্রতিরিক্ত পরিমান আমাদের ক্ষতি করে। ভারী ধাতু সম্পন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করলে আমাদের রক্তে উক্ত ধাতুর পরিমান বেড়ে যায়। Cr, As, Cd, Hg, Pb, Te আমাদের দেহের সালফারের সংগে বন্ধন করে এবং দেহের এনজাইমের কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্থ করে। ফলে আমাদের দেহের মেটাবলিক কাজ বাঁধাগ্রস্থ হয় এবং এতে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। এই বিষাক্ত ধাতুগুলো আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় ধাতুগুলোকে প্রতিস্থাপন করে। ফলে এনজাইমের কার্যপ্রনালী ৫% পর্যন্ত নেমে আসতে পারে। সেজন্য আমাদের রক্তনালী, সংযোগস্থান, হাড় ও মাংশপেশী দূর্বল হয়ে যায়। এ ধাতুগুলো আমাদের দেহে জমা হতে থাকে এবং সংক্রামক ব্যাধির পরিবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এগুলো DNA এর বৃদ্ধিতে বাঁধা দান করে; ফলে আমরা অসুস্থ হয়ে পরি।

ESDO (Environmental and Social Development Organization) একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ২০১৫ সালে প্রসাধনী দ্রব্যে ভারি ধাতুর বিষাক্ততা ও পরিমান র্নিণয়ে একটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তাতে দেখানো হয়েছে প্রায় ১৬টি ভারী ধাতু প্রসাধনী দ্রব্যে বিরাজমান, কোন কোনটির উপস্থিতি অনেক বেশী পরিমানে আছে। বিশ্লেষিত প্রসাধনীগুলি বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড, কানাডা, ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া, ইউনাইটেড আরব ইমিরেট ও পাকিস্তান হতে সংগৃহিত। প্রায় সব প্রসাধনীতে তিনটি ভারী ধাতু খুব বেশী পরিমানে আছে। টাইটেনিয়াম ধাতু ৮০% প্রসাধনীতে

বিরাজমান। এটা চামড়াকে সাদা করে। পারদ ধাতু প্রায় সব উজ্জলকারক প্রসাধনীর মধ্যে আছে। ধাতু প্রায় সব উজ্জ্বলকারক প্রসাধনীর মধ্যে আছে। সকল Fairness ক্রিমেই টাইটেনিয়াম আছে। গড় মাত্রার পরিমান টাইটেনিয়ামের ১৬৩০ppm । ক্যালশিয়াম ও লোহার পরিমান হারবাল ফেস প্যাকে বেশী এবং ২৫৬৪ ও ৪৫৫২৭২ পিপিএম। শিশুদের লোশনেও টাইটেনিয়াম পাওয়া গিয়েছে। বেবী লোশনে জিংকও পাওয়া গিয়েছে। আর্সেনিক, নিকেল ও জিংক সকল ফেস ওয়াসে আছে। এসব ভারী ধাতু খুবই বিষাক্ত। এদের প্রভাবে বমি বমি ভাব, মাথা ধরা, অসুস্থ বোধ করা, শ্বাস কষ্ট, কিডনী ও লিভারের ক্ষতি সাধন, হৃৎপিন্ডের রক্তনালীর উপর প্রভাব, ফুসফসের কার্যক্ষমতা হ্রাস, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, শিশুদের ব্রেন গঠনে বাঁধা, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।

স্থানীয় কসমেটিকস ও টয়লেট্রিস (Local Cosmetics and Toiletries)ঃ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বর্তমানে এর জনসংখ্যা ১৬ কোটির উপর; তার অর্ধেকই নারী। বাংলাদেশের জন্মলগ্নে জনসংখ্যা এর অর্ধেকেরও কম ছিল। মাথাপিছু আয়ও ছিল বর্তমানের চেয়ে অনেক কম। মানুষ তখন সাধারন জীবন-যাপন করত; বিলাসিতা কি তা খুব কম মানুষই জানত। কিন্তু সময়ের সাথে আমাদের জীবন-যাপনের ধারা পরিবর্তিত হয়েছে; আমাদের মাথাপিছু আয় অনেক বেড়ে গিয়েছে। বাংলাদেশীরা এখন দেশে-বিদেশে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে; নানা কিছু সম্বন্ধে জানছে, তাদের আগ্রহও বাড়াছে।

প্রসাধনী পন্য এমন এক পন্য যা পূর্বে সাধারন মানুষেরা জানত না বা জানার আগ্রহও ছিল না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় এখন আমরা খাদ্য-সামগ্রী বা পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও আরও অনেক দ্রব্যের উপর আমাদের আগ্রহ বাড়ছে। মানুষ সৌন্দর্য্য পিপাসু, কে না চায় সুন্দর হতে। অবশ্য সুন্দরের বিভিন্ন সংগা আছে। প্রসাধনী এমন এক জিনিষ যা ব্যবহার করলে আমরা নিজেদের বেশী সুন্দর বলি। আমাদের চাহিদার সংগে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশেও নানা ধরনের প্রসাধনী দ্রব্য তৈরীর কারখানা গড়ে উঠেছে। পূর্বে কেবলমাত্র বিদেশ থেকেই প্রসাধনী দ্রব্য আমদানী হত, যার মূল্য অনেক বেশী ছিল ও আমাদের অনেকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে ছিল। এই প্রসাধনী দ্রব্যগুলো সাধারনত: আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, চীন, মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশ হতে আমদানী হত। যে সমস্ত কসমেটিক দ্রব্য আমদানী হত তার মধ্যে জনসন ও জনসন, এল-ওরেল, রাভলন, ম্যাক্স ফ্যক্টর, এভন, ম্যাক, গারনিয়ার, এলিজাবেথ আরডেন, লালিক, বে বিউটিফুল, চানেল, কভারগার্ল, ডিয়র, নিভিয়া, পন্ডস কোম্পানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ২০০০ সাল পর্যন্ত আমাদের প্রসাধনী দ্রব্যের ৬০% বিদেশ থেকে আসত আর ৪০% দেশে উৎপাদিত হত। কিন্তু দেশে প্রসাধনী দ্রব্যের চাহিদা প্রায় প্রতি বছর ১০% বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশীয় কলকারখানা গুলোও তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে এবং কোয়ালিটি দ্রব্যও উৎপাদন করছে। ২০১৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের চাহিদার ৬০% এখন দেশেই উৎপাদন হচ্ছে। দেশীয় কলকারখানাগুলোতে প্রায় ০.৫ মিলিয়ন লোকবল খাটছে এবং আমাদের বার্ষিক উৎপাদনে এখন প্রায় ১৫০ বিলিয়ন টাকা।

আমাদের দেশে উৎপাদিত পন্য সামগ্রীগুলো হল নানা ধরনের গোসলের ও কাপড় কাচার সাবান, ডিটারজেন্ট, শ্যাম্পু, লোশন, কন্ডিশনার, ফেসওয়াস, ফেয়ারনেস ক্রিম, ফেস পাউডার, ট্যালকম পাউডার, দাতের পেস্ট, সেভিং ক্রিম, চুলের তেল, স্যানিটারী ন্যাপকিন, লিপজেল, হেয়ারজেল, হেয়ার বনুক, লিপিস্টিক, আইসাডো, নখপালিশ, মেকআপ ক্রিম, গোসলখানা পরিষ্কারক, থালা বাসন পরিষ্কারক ইত্যাদি। আর এগুলো তৈরী করছে আমাদেরই দেশে গড়ে উঠা প্রসাধনী কোম্পানী। যেমন ইউনিলিভার বাংলাদেশ, কোহিনূর, স্কয়ার, কেয়া, কাশেম গ্রুপ, কল্লোল গ্রুপ, মৌসুমি, ডেলটা গ্রুপ, অ্যারোমেটিক।

এই কোম্পানীগুলোর মধ্যে ইউনিলিভার ৪৫%, কোহিনূর ২০%, স্কয়ার ১৮% ও কেয়া ১৩% উৎপাদন করে। শীতকালে অবশ্য উপরের উৎপাদন সমূহের তারতম্য ঘটে।

ইউনিলিভার বাংলাদেশ লাক্স, ডাভ, লাইফবয় সাবান, ফেয়ার এন্ড লাভলি, পন্ডস ফেয়ারনেস ক্রিম, পেপসোডেন্ট ও ক্লোজআপ, দাতের পেস্ট, হুইল, রিন ও সার্ফ এক্সেল ডিটারজেন্ট, ভিম ডিস ওয়াসার, রেক্সোনা, সানসিল্ক, ক্লিয়ার শ্যাম্পু উৎপাদন করে। কোহিনূর কোম্পানি বাংলাদেশের একটি পুরানো কোম্পানী। এদের তৈরী তিব্বত সাবান, স্নো, মাথার তেল, লিপ-জেল, সান্ডেলিনা সর্বজনবিদিত। কোহিনূর কোম্পানীর এখন ৩৫টি পন্য বাজারজাত আছে। মেরিল, চাকা, সিলেক্ট, কোক, শক্তি ও সেনোরা হল বাংলাদেশের আর এক খ্যাতিমান কোম্পানী স্কয়ার পণ্য। মেরিল বেবী লোশন, লিপ-জেল, পেট্রোলিয়াম জেলি, মেরিল চ্যপ-স্টিক বাংলাদেশের ৭০% চাহিদা মিটিয়ে থাকে। মেরিল স্পালাশ ও সেনোরা ন্যাপকিন ৮০-৯০% চাহিদা মিটায়। বাংলাদেশ এখন অনেক প্রসাধনী পন্য বিদেশে রপ্তানী করে। বিদেশ থেকে যে সমস্ত প্রসাধনী পণ্য বাংলাদেশে আসে তার সবই যে সঠিক পথে আসে তা ঠিক নয় অনেক বিদেশি পণ্য বাংলাদেশে বিপথেও আসে। এর মধ্যে অনেক পন্যের মান খুব খারাপ, যা আমাদের দেহের জন্য ক্ষতিকারক।

বাংলাদেশে প্রসাধনী পণ্যের প্রসার হওয়ায় এর গুনগত মান পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৫ সালে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে Bangladesh Standard and Testing Institute প্রতিষ্ঠা করে। এই অর্গানাইজেসন বাংলাদেশে প্রস্তুত প্রসাধনী পণ্য গুলোর মান যাচাই করে সার্টিফিকেট প্রদান করে। বাজারজাত করানোর আগে BSTI সিল সংগ্রহ করতে হয় কোম্পানীগুলোর। সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা BSTI এর কর্তব্য। এর জন্য তারা মাঝে মধ্যে ভেজাল অভিযান পরিচালনা করে ভেজাল বা মান খারাপ পণ্যের খোজে। প্রসাধন পণ্য আমরা ব্যবহার করি আমদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এবং তা ভবিষ্যতেও করতে থাকব। কিন্তু সরকারের কাছে অনুরোধ থাকবে তারা যেন পণ্যের মান নিয়ন্ত্রন করে যাতে মানুষের কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। আমাদের মাঝে সচেনতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে আমরা ভাল প্রসাধনী ব্যবহার করি, খারাপ প্রসাধনী ব্যবহার করে আমরা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পরিবর্তে আমাদের নিজেদের জন্য সর্বনাশ না করি।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কার্যপরিধি

প্রকৌশলী সুকল্যাণ বাছাড়
কিউরেটর (একাডেমিক)
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর।

১৯৬৫ সালের ২৬ এপ্রিল তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের এক নির্বাহী আদেশে পৃথকভাবে ঢাকায় ও লাহোরে "জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর" নামক প্রতিষ্ঠানটির সূত্রপাতঘটে। মূলতঃ ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে দাপ্তরিক কাজ শুরু হয়। সে হিসেবে "জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর" - এর ৫০ বছর পূর্তিতে ২০১৬ সালের নভেম্বর থেকে সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০১৭ সালের ২৬ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতিক্রমে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজাদুঘর-এর সুবর্ণজয়ন্তীর কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য রচনাটিও এই উপলক্ষেই রচিত হয়েছে।

অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ১৯৮৭ সাল থেকে ঢাকার আগারগাঁও-এ পাঁচ একর জমির উপর নিজস্ব ক্যাম্পাসে এর যাত্রা শুরু করে। মহান জাতীয় সংসদের "জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন-২০১০" এর মাধ্যমে এটি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানাবিধ প্রদর্শনী বস্তুর মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে সকল শ্রেণির মানুষের জন্য বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজ করে থাকে। তবে মূল লক্ষ্য হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের কারিকুলাম শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে রসদযোগানো এবং তরুণ ও অপেশাদার উদ্ভাবনী সত্ত্বার বিকাশ ঘটানো।

ঢাকার আগারগাঁও-এ অবস্থিত জাতীয় বেতার ভবনের পশ্চিম পার্শ্বের কোল ঘেষে যে রাস্তাটি উত্তর দিকে চলে গিয়েছে তার প্রায় ৪০০ (চারশত) মিঃ ভিতরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত নিরিবিলি পরিবেশে জাদুঘরটি অবস্থিত। প্রবেশের মুখে দর্শকদের প্রথমে স্বাগত জানাবে বিশালাকৃতির প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ডাইনোসর, তবে জীবন্ত নয় ইট পাথরের তৈরি একটি ভাস্কর্য এটি।

জাদুঘরের কার্যক্রম মূলত তিনটিভাগে বিভক্ত, যথাঃ গ্যালারী প্রদর্শনী, শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রকাশনা। শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এখানে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর বিভিন্ন বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এই সব অনুষ্ঠানে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানামোদী শ্রোতার সমাবেশ ঘটে। দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞান শিক্ষকবৃন্দ অনুষ্ঠানসমূহে বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসাবে নির্ধারিত বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

জাদুঘরের প্রকাশনাসমূহের মধ্যে আছে ত্রৈমাসিক ''নবীন বিজ্ঞানী'' পত্রিকা, জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালার গ্রন্থ, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের বার্ষিক প্রতিবেদন, তরুণ ও অপেশাদার বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্প ''উদ্ভাবন'' ও বাৎসরিক বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর প্রকাশিত পোষ্টার, ফোল্ডার, লিফলেট ইত্যাদি।

জাদুঘরে বর্তমানে সাতটি গ্যালারী দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। যথা (১) ভৌত বিজ্ঞান গ্যালারী, (২) জীববিজ্ঞান গ্যালারী, (৩) মজার বিজ্ঞান গ্যালারী, (৪) ছোটদের বিজ্ঞান গ্যালারী, (৫) মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারী (৬) শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারী ও (৭) তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারী। পদার্থ বিজ্ঞানের নানা সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে ভৌত বিজ্ঞান গ্যালারীতে। রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষণীয় প্রদর্শনীবস্তু। নিউটনের ১ম গতিসূত্রে বলা হয়েছে বাহিরের কোন বল বস্তুর উপর প্রযুক্ত না হলে স্থিরবস্তু স্থির থাকবে আর গতিশীল বস্তু সমবেগে সরল পথে চলতে থাকবে, এর বাস্তব প্রয়োগ রয়েছে। একটি খেলনা গাড়ী দিয়ে এই ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিউটনের ৩য় সূত্র প্রমাণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একটি ফানেল ও চাকা।

উপরে থাকা ফানেলে পানি ঢাললে পানি যে দিকে বের হয় চাকাটি তার বিপরীত দিকে ঘুরে। এখানে আরও রয়েছে চৌম্বক বলরেখা যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ চূর্ণ ও বার ম্যাগনেট দিয়ে প্রদর্শন করা হয়েছে। চৌম্বক বলরেখাগুলো কখনও একটি অপরটিকে ছেদ করে না। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন হাতে কলমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা রয়েছে যেখানে ১২ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। মানুষের চোখ প্রতি সেকেন্ডে গড়ে ১০টি ছবি দেখতে পায়। প্রতি সেকেন্ডে যদি ১০ এর অধিক ছবি প্রদর্শিত হয় তাহলে ছবিগুলো একটানা রয়েছে বলে মনে হয়। চলচ্চিত্রের এই মূল বিষয়টা সিনেমাস্কোপ নামের প্রদর্শনীবস্তু দ্বারা দেখানো হচ্ছে। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ব্যবহৃত এক্সরে টিউব এবং বিজ্ঞানী ডঃ মোহাম্মদ কুদরাত-ই-খুদার ব্যবহৃত কতিপয় জিনিস এই গ্যালারীতে সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও শিক্ষণীয় অন্যান্য প্রদর্শনীবস্তুর মধ্যে রয়েছে আড় তরঙ্গ ও দীঘল তরঙ্গের প্রদর্শন, পেরিস্কোপ, দর্পনের খেলা, নিউটনের বর্ণচক্র, পিথাগোরাসের উপপাদ্য, কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রবিমুখী বল, ভরের ধাঁধাঁ, টরিসেলির পরীক্ষা, স্থিতি ও গতিজড়তা, মিনি হাইড্রোপাওয়ার প্ল্যান্ট, পাহাড়ী এলাকার কৃষিকাজ, ফারেনহাইট, সেলসিয়াস ও কেলভিন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। গ্যালারী-সহকারীর সহায়তায় দর্শকরা নিজ হাতে প্রদর্শনী বস্তুসমূহ পরিচালনা করার সুযোগ পান।

জীব বিজ্ঞান গ্যালারীতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মাছ, বিভিন্ন প্রজাতির স্টাফ করা পাখি, বিভিন্ন প্রাণীর কঙ্কাল, সমুদ্রে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবজন্তুর চিত্র। এখানে রয়েছে গর্ভাবস্থায় বিদ্যমান বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধাপের ভ্রূণ। ১৯৮৮ সালের প্রলয়ঙ্কারী বন্যার সময় বঙ্গোপসাগরে পাওয়া নীল তিমির কঙ্কাল এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। রয়েছে জীবাশ্মে পরিণত হওয়া প্রস্তরীভূত একটি গাছ, গাংগেয় ডলফিন নামের বিশেষ প্রজাতির একটি ডলফিন এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও এই গ্যালারীতে রয়েছে বিভিন্ন মডেল, যেমন ব্যাকটোরিয়ার সেল স্ট্রাকচার, অ্যামিবা, বনি ফিস, লিভার ফ্লুক, প্যারামেসিয়াম, হাইড্রা, ডিএনএ, আরএনএ, মাইটোসিস ও মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় সেল বিভাজন, মানব মস্তিষ্ক, কিডনি, হৃদপিন্ড, রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি, দাঁত, জরায়ু, পরিপাকতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র, এনডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে মুত্রথলির পাথর (প্রকৃত), পিত্তথলির পাথর (প্রকৃত) ও আক্রান্ত কিডনি (প্রকৃত)।

মজার মজার সব প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে মজার বিজ্ঞান গ্যালারীতে। ছিন্ন মস্তক নামে মজার প্রদর্শনীবস্তুটির ফাঁকা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালে মনে হবে যেন মাথাটি কাটা অবস্থায় প্রদর্শনীবস্তুর উপরে রাখা ফলের প্লেটে বা থালার উপরে বসানো আছে। এই রকম আরও কিছু মজার মজার প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে, যেমন রঙ্গীন ছায়া। ছায়া সাধারণত আমরা কাল দেখি, কিন্তু এই প্রদর্শনীবস্তুটিতে রঙীন ছায়া দেখা যায়। ভাসমান চাকতি প্রদর্শনীবস্তুটির সুইচ টিপে দিলে চাকাটি সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে হাওয়ায় ভাসতে থাকে। অলস পতন নামের একটি প্রদর্শনীবস্তুর ছিদ্র পথে এক এক করে সব কটি দন্ড ছিদ্র পথে নীচে ফেলে দিলে সব কটি দন্ড সাথে সাথে নীচে পড়লেও একটি দন্ড পড়তে বিলম্ব করে। দৃষ্টি বিভ্রম নামে প্রদর্শনীবস্তুটির ঘূর্ণায়মান রিংগুলোর দিকে তাকালে মনে হবে রিংগুলো একটির উপর আরেকটি ঘুরছে। মজার আয়না প্রদর্শনীবস্তুটি বিভিন্ন আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের চেহারা কোনটায় বামুন, কোনটায় লম্বা আবার কোনটায় সঙ্কুচিত দেখা যায়। ''আলো কি দেখা যায়?'' প্রদর্শনীবস্তুটিতে শূণ্যস্থানে আলো যে দেখা যায় না তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর একটি প্রদর্শনীবস্তুতে বায়ুতে শব্দের গতিবেগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এগুলো ছাড়াও এ গ্যালারীতে সিবেক সাইরেন, বহুরূপী ছবি, তরলের বর্ণময় আল্পনা, পোলারয়েড এ্যানিমেশন, উর্ধ্বমুখী বৈদ্যুতিক আর্ক, সুরেলা টিউব, কেওস, দুই কানে শোনা, ক্যুরী স্থিরাঙ্ক, অস্থির ববিন, ক্যালিডোস্কোপ, অ্যানামোরফসিস, বায়োস্কোপ নকশা, নিস্পন্দ ও সুস্পন্দ বিন্দু ইত্যাদি মজার মজার শিক্ষণীয় প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে। এগুলো দেখে শিশু কিশোররা আনন্দ পাওয়ার পাশাপাশি শিখতে পারবে অনেক কিছু।

ছোটদের বিজ্ঞান গ্যালারীতে রয়েছে ছোটদের উপযোগী বিবিধ প্রদর্শনীবস্তু। জাদুর ফাঁসের মধ্যে শিশুরা চড়ে কিভাবে ভিতর থেকে বাইরে চলে আসবে বা বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকবে তা বুঝতে পারবে না, সমব্যাথী দোলনে দুইটি শিশু এমনভাবে দোল খাবে যে একজনের দোল যখন তুংগে অপর জন তখন বিশ্রামে, দৃষ্টি-ভ্রমে রয়েছে নানা জাতীয় ছোট-বড় নির্ণয়ের সমস্যা, উড়ন্ত মানব শিশু দর্পণের সহায়তায় নিজে উড়ে যাওয়ার ছবি দেখবে, আছে লম্ফমান চূড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা সহ আরো অনেক মজার মজার প্রদর্শনী যা শিশুকে বিজ্ঞান ভাবনায় ফেলে দেবে।

মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারীতে রয়েছে কেমন করে চাঁদ বাড়ে কমে তার ব্যাখ্যা, মহাকাশ ভ্রমণের অস্বস্থিকর অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন ধরণের টেলিস্কোপের কার্যপ্রণালী, কেপলারের গ্রহবিধির অভিজ্ঞতা, কাল্পনিক বিমান চালনার অভিজ্ঞতা, স্পেস স্যূট, মহাকাশে চাষাবাদ, নিউটন ও আইনস্টাইনের মহাকর্ষনীতির উপর ম্যাজিক ভিশন, প্লাজমা পদার্থের স্বরূপ দর্শন, প্রবাহী পদার্থের ঘূর্ণি, লেসার শো সহ অনেক রকমারী আয়োজন।

শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারীতে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি যেমন সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করার যন্ত্র, চাকা ও অক্ষদন্ড, লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা, কপিকলের যান্ত্রিক সুবিধা, জীবন ভেলা, ডাইভিং সেট, বায়ুর স্থানীয় চাপ নির্ণয়ের যন্ত্র, পুরাতন গ্রামোফোন, পুরাতন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি। আরও রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার মডেল যেমন হার্ডিঞ্জ সেতুর মডেল, ইউরিয়া সার কারখানা, ঝুলন্ত সেতু, তেল শোধনাগার, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী, চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানা, স্পার্সো (SPARRSO), চিনিকল, কর্ণফুলী কাগজের কল ইত্যাদি। এখানে আরও রয়েছে ১৯৪১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত একটি বিমানের ইঞ্জিন ও বলাকা বিমানের আরেকটি ইঞ্জিন। বলাকা বিমানের ইঞ্জিনটি তৎকালীন সোভিয়েত সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার দিয়েছিলেন। এখানে আরও উপস্থাপিত হয়েছে ১৮৯৩ সালে নির্মিত একটি পুরাতন মুদ্রণ যন্ত্র, বিটিভিতে ব্যবহৃত ১ম ও ৩য় ক্যামেরা, লাইনো কম্পোজ মেশিন, নিউটনিয়ান টেলিস্কোপ ইত্যাদি। আরও অনেক যন্ত্রপাতি এই গ্যালারীতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারীতে উপস্থাপিত হয়েছে কম্পিউটারের ধারাবাহিক বিবর্তন। বাংলাদেশের প্রথম মেইনফ্রেইম কম্পিউটারটি সংরক্ষিত আছে যার মডেল আইবিএম ১৬২০, ২য় প্রজন্মের ডিজিটাল এই মেইনফ্রেইম কম্পিউটারটি ১৯৬৪ সালে আনা হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে সংগৃহীত ২য় প্রজন্মের আর একটি মেইনফ্রেইম কম্পিউটার যার মডেল আইবিএম ৩৭০। রয়েছে জার্মানীর AEG Telefunken Company এর তৈরি একটি এনালগ কম্পিউটার, এটি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে আনা হয়। আরও আছে ১৯৮৬ সালে বুয়েট কর্তৃক সংগৃহীত ৩য় প্রজন্মের সিস্টেম মেইনফ্রেইম কম্পিউটার যার মডেল আইবিএম ৪৩১১। এ গ্যালারীতে আরও রয়েছে আইবিএম ১৬২০ সিপিইউ, আইবিএম ০২৬ কার্ড পাঞ্চ মেশিন, আইবিএম ১৬২২ কার্ড রিড মেশিন, আইবিএম ১৩১১ ডিস্ক ষ্টোরেজ ড্রাইভ, আইবিএম ৩৩৪০ ডিস্ক স্টোরেজ, আইবিএম ৩৪১০ ম্যাগনেটিক টেপ ইউনিট, আইবিএম ৩৫০৫ কার্ড রিডার, আইবিএম ৩৫৪০ ডিস্কেট রিডার, আইবিএম ৩২৭৮ ক্যারেক্টার ডিসপ্লে কনসোল এন্ড কি বোর্ড, আইবিএম ৩৩৭০ এফবিএ হার্ড ডিস্ক, আইবিএম ৩৪৩০ টেপ ড্রাইভ, আইবিএম ৩২৬২ ৬৫০ এলপিএম লাইন প্রিন্টার, পৃথিবীর প্রথম মাইক্রোপ্রসেসরসহ বিভিন্ন ধরনের প্রসেসর ও হার্ডওয়্যারের প্রদর্শনীবক্স। সম্প্রতি সংযুক্ত হয়েছে ইন্টারেক্টিভ ভিডিও গেম।

এছাড়াও দুটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রদর্শনীবস্তু জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে। সেগুলো হল বিগত ৩১ জানুয়ারী, ২০০৬ সালে ঠাকুরগাঁও জেলায় সিংগপাড়া গ্রামে পতিত প্রায় ৪.২ কিলোগ্রাম ওজনের উল্কাপিন্ড যেটি ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ তারিখে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে সংরক্ষিত করা হয়, এবং জাপানের অসিমা দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রাপ্ত তিন খন্ড লাভা, যা স্পার্সোর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার সৌজন্যে জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

জাদুঘরের ভিতরে উপস্থাপিত প্রতিটি উপকরণ দর্শকদের জন্য আনন্দদায়ক। তাছাড়া টেলিস্কোপের সাহায্যে দর্শকদের আকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে জাদুঘরের ছাদে বাংলাদেশের একমাত্র মিনি অবজারভেটরী স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি শুক্র ও শনিবার সূর্যাস্তের পর এক ঘণ্টা করে আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে ১০ টাকা দর্শনার্থীর বিনিময়ে আগ্রহী যে কেউ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

দেশব্যাপী বিজ্ঞানচেতনা বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিবছর জেলা পর্যায়ে ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরজাতীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন করে থাকে। এ বছর থেকে তা উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর পরিচালিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ট্রাস্টের আওতায় বিভাগীয় পর্যায়ে বিশেষ বিজ্ঞানমেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিজ্ঞান ক্লাব নিবন্ধনের জন্য পালনীয় শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে এই জাদুঘর বিজ্ঞানক্লাবসমূহকে নিবন্ধন দিয়ে থাকে। বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে আর্থিক সহায়তাও প্রদান করে থাকে।

জাদুঘরে একটি আধুনিক ওয়ার্কশপ আছে। এর বিশেষ উদ্দেশ্য হলো প্রদর্শনীবস্তু তৈরি করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। যে ধরনের কাজ এখানে সম্পন্ন করা হয় তার মধ্যে রয়েছে মেশিনিং, ওয়েল্ডিং, কার্পেন্টারিং ইত্যাদি। এই ওয়ার্কশপের মাধ্যমে জাদুঘর তরুণ ও অপেশাদার উদ্ভাবক কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রকল্পসমূহকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ গাইডের তত্ত্বাবধানে তাঁদের প্রকল্পের মানোন্নয়ন ঘটানোর জন্য সহায়তা প্রদান করে থাকে।

জাদুঘরে একটি বিশেষ গ্রন্থাগার রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রায় ৬০০০ (ছয় হাজার) বই এর সংগ্রহে রয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে দেশী-বিদেশী সাময়িকী, ম্যাগাজিন ইত্যাদি। সর্বসাধারণের জন্য এই গ্রন্থাগার অফিস চলাকালীন সময়ে খোলা থাকে।

২০১১ সাল থেকে চালু হয়েছে ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান গ্যালারী তথা মিউজুবাস। এতে রয়েছে নিউটনের প্রথম সূত্রের প্রমাণ, বয়েলের সূত্রের প্রমাণ, লেঞ্জের সূত্রের প্রমাণ, পিথাগোরাসের উপপাদ্যের প্রমাণসহ ২৪ টি আকর্ষণীয় বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীবস্তুতে সমৃদ্ধ চলমান বিজ্ঞান জাদুঘর। এই মিউজুবাসটির বিচরণ সারা দেশ জুড়ে। তাছাড়া আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে আট ইঞ্চি ব্যাসের ক্যাসাগ্রেন ধরণের দূরবীক্ষণ যন্ত্র। যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিউজুবাসটির সুবিধা পেতে আবেদন করতে পারেন।

সম্প্রতি বিজ্ঞান জাদুঘরে বিনোদনমূলক আয়োজন হিসেবে সংযোজিত হয়েছে চতুর্মাত্রিক প্রেক্ষাগৃহ। প্রতিটি ছায়াছবির দৈর্ঘ্য গড়পড়তায় পাঁচ মিনিট; এতে বিশটি ভিন্ন স্বাদের ছবি থেকে দুটি করে ছবি প্রতি শোতে দেখানো হয়। কোনটি ভয়ের, কোনটি এডভেঞ্চারের, কোনটি অনুসন্ধানী, কোনটি ভ্রমণের, এমন করে সাজানো বিনোদনের আয়োজন। ন্যূনতম দর্শক সংখ্যা উপস্থিতি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময় বিরতি পর পর শো-র আয়োজন করা হয়। গ্যালারী চলাকালীন সময়ে ৪০ টাকা দর্শনার্থীর বিনিময়ে আগ্রহী যে কেউ চতুর্মাত্রিক ছায়াছবির বিনোদন উপভোগ করতে পারেন। চতুর্মাত্রিক প্রেক্ষাগৃহটির দুইটি ভার্সন রয়েছে। একটি স্থায়ী এবং অপরটি ভ্রাম্যমান যা মিউজুবাসের মত দেশের বিভিন্ন স্থানে এর বিনোদন সেবা প্রদান করে থাকে।

বিজ্ঞান জাদুঘরের গ্যালারীসমূহ সপ্তাহের রবি থেকে বুধবার প্রতিদিন সকাল ৯.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত, শুক্রবার দুপুর ২.৩০টা থেকে সন্ধ্যা ৭.০০টা পর্যন্ত, এবং শনিবার সকাল ৯.০০ টা থেকে বিকাল ৬.০০টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। জনপ্রতি ১০/- টাকা টিকেটের বিনিময়ে গ্যালারীসমূহ পরিদর্শন করা যায়। অবশ্য কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫০ এর অধিক হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন সাপেক্ষে গ্যালারী টিকেট ও চতুর্মাত্রিক ছায়াছবির প্রবেশ মূল্যের উপর ৫০% কমিশন প্রদান করা যেতে পারে। বিশ্ব রহস্যের দ্বার উন্মোচন করতে আপনার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী করবার জন্য বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্তভাবে কাম্য। ব্যক্তিগত পর্যায়ে, এককভাবে বা পরিবারের সদস্যসহ বা সবান্ধব বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন করুন। পরিশেষে বলতে হয়।

বিজ্ঞান মনস্ক হউন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা করুন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলুন।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রদর্শনীবস্তুসমূহ সাজানো হয়েছে
- বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন আবশ্যক
- কোন প্রতিষ্ঠান থেকে দলগতভাবে জাদুঘর পরিদর্শন করতে চাইলে জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পরিবহণ (বিশেষ করে ঢাকা শহরে) ও টিকিটে বিশেষ ছাড় এর ব্যবস্থা রয়েছে
- শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো

▶ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শনের সময়সূচি

- রবিবার থেকে বুধবার সকাল ৯:০০ থেকে বিকাল ৫:০০
  শনিবার সকাল ৯:০০ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০
  শুক্রবার দুপুর ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭:০০

বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

▶ নিম্নোক্ত বিশেষ দিবসসমূহে জাদুঘরের গ্যালারি খোলা থাকে

- মহান স্বাধীনতা দিবস, ২৬ মার্চ
- বাংলা নববর্ষ, ১লা বৈশাখ
- মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর
- জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ

জাদুঘরে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা রয়েছে

(শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যার পর ১ ঘন্টা, আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে)

এখানে স্বল্প দৈর্ঘ্য 4D movie প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

www.nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ফোনঃ ৯১১২০৮৪, ৮১৮১৩২৮